ভারতী মহাবিদ্যালয় গ্রন্থমালা

ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ সংখ্যা—৩

হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি

বৈষ্ণব ধর্ম

প্রথম খণ্ড

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায়,
বিদ্যার্ণব, রায় বাহাদুর, এম.এ. প্রণীত।

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম.এ.
লিখিত ভূমিকাযুক্ত।

প্রকাশক—
শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্. এ., বি.এল্.
সাধারণ সম্পাদক,
ভারতী মহাবিদ্যালয়
১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৯৪২

উৎসর্গ পত্র

যিনি সর্বপ্রকার ধর্ম ও জ্ঞানচর্চ্চা বিষয়ে আমার জীবন-পথে পরম সহায় ছিলেন, যাঁহার অনুপ্রেরণায় উৎসাহিত হইয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার মূল উৎস কোথায় এবং কি কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়া বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া ইহারা বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা অবধারণ জন্য দুরধিগম্য প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, আমার সুদীর্ঘকালব্যাপী সাধনা ও গবেষণার ফল **"বৈষ্ণব ধর্মের অভিব্যক্তি"**-বিষয়ক এই গ্রন্থ সেই ঋষিকল্প পণ্ডিতপ্রবর আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺প্রকাশচন্দ্র সিংহ রায়, বি. এ., ন্যায়-বাগীশ মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রাণের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ স্বরূপে উৎসর্গীকৃত হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় লিখিত 'হিন্দুধর্মের অভি-ব্যক্তি' নামক পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। সুরেশ বাবু একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। তিনি তাঁহার অবসর সময় শাস্ত্রালোচনায় অতিবাহিত করিতেছেন। তাঁহার 'ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব' ধারাবাহিকরূপে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পাঠক সমাজে এই গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া প্রচুর সমাদর লাভ করিয়াছে। সুতরাং গ্রন্থকার সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার গ্রন্থের জন্য কোনও পরিচায়ক লিপির প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। বিশেষতঃ তিনি যে সুগভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া শুধু যে অনাবশ্যক তাহা নহে, পরন্তু আমার ন্যায় প্রাকৃতজনের পক্ষে ধৃষ্টতাও বটে। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধাভাজন গ্রন্থকারের ইচ্ছা লঙ্ঘন করাও কর্তব্য নহে, ইহাই মনে করিয়া দুই একটি কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তাঁহার মূল্যবান্ গবেষণার ফল দুই খণ্ড পুস্তকে বলিতেছেন। প্রথম খণ্ডে বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাস—বাসুদেবতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয়—সরলভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম নেতাদিগের পরিচয় ও ধর্মমত নিবদ্ধ হইবে। বেদোক্ত ধর্মসম্বন্ধে গ্রন্থকারের অসাধারণ জ্ঞান থাকায়, বৈষ্ণবধর্মের ক্রমবর্দ্ধিণী ধারাটি তিনি যে ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই উপাদেয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। হিন্দুধর্মের প্রাচীন যুগে বিষ্ণুর প্রাধান্য ক্রমশঃ কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং পরে নারায়ণতত্ত্ব ও বাসুদেবতত্ত্ব ক্রমে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে পরিণতি

লাভ করিয়াছিল তাহা এই পুস্তকে বিশদভাবে দেখানো হইয়াছে। হিন্দু-ধর্মের ইতিহাস অন্য অনেকে লিখিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এ বিষয়ে অনেক আলোকপাত করিয়াছেন। উইল্‌সনের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে মূল্যবান্ পুস্তক, ম্যাক্‌স্‌মুলার প্রভৃতির গবেষণা আমাদিগকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে বৈদিক সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান পূর্ব যুগ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের কিরূপ পরিণতি হইয়াছে, গ্রন্থকার তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার অসামান্য নৈপুণ্যের সহিত বৈষ্ণব ধর্মের অভিব্যক্তির ধারা অনুসরণ করিয়াছেন। শৈব ও শাক্তধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও তিনি এইরূপ ভাবে আলোচনা করিবেন এইরূপ তাঁহার ইচ্ছা। বলা বাহুল্য, এই দুরূহ কার্যে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আত্মনিয়োগ করা গ্রন্থকারের একনিষ্ঠ সত্যানুসন্ধিৎসাই প্রমাণ করিতেছে। এই কার্যে তাঁহার সফলতা কামনা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই করিবেন সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশের অধিকাংশ হিন্দুই বৈষ্ণবধর্মাবলম্বী। হিন্দুধর্মের অন্যান্য শাখার ন্যায় বৈষ্ণবধর্মও শান্তির আদর্শ প্রচার করিয়াছে। 'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।' বস্তুতঃ সমস্ত সভ্যজাতির ধর্মই শান্তির জন্য লালায়িত। এসম্বন্ধে দ্বিমত নাই। কিন্তু এই শান্তির জন্য যে সাধনা আবশ্যক, তাহা বৈষ্ণবধর্ম যেরূপ একান্ত নিষ্ঠার সহিত শিক্ষা দিয়াছে, তাহা সর্বত্র সুলভ নহে। 'স্মর্তব্যো সততং বিষ্ণুরস্মর্ত্তব্যঃ ন জাতুবিৎ।' সকল সময়, সর্বাবস্থায় সর্বত্র ভগবান্‌কে স্মরণ করিবে, ইহাই বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান সাধনা। ভগবানের স্মরণ মানবের মনে তৈলধারার ন্যায় অনবচ্ছিন্ন থাকিবে, ইহাই এই সাধনার প্রথম উপদেশ। সকল কাজের মধ্যে তাঁহারই স্মৃতি সংসারা-র্ণবে ধ্রুবতারার মত অবিচলিত লক্ষ্য থাকিবে ইহাই অভিপ্রায়। নৃত্যকুশলা নর্ত্তকী যেমন অনেক প্রকার তাললয়ের বশীভূতা থাকিলেও মস্তকস্থ কুম্ভ পতিত হইতে দেয় না, সেইরূপভাবে সংসারে নিমগ্ন

থাকিয়াও ভগবদ্ ভজন করিতে হইবে। "সঙ্গীত নৃত্যকতিগণ বশং গতাপি মৌলিস্থ কুম্ভ পরিরক্ষণধী নটীব।"

বৈষ্ণব ধর্মের অভিব্যক্তি ধর্মেতিহাসের একটি কৌতূহলপূর্ণ অধ্যায়। বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ড হইতে বৈষ্ণবের ভক্তিবাদে কিরূপে রূপান্তর ঘটিল, ইহা পরম রহস্যময় ব্যাপার। অনেক পণ্ডিত ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া খ্রীস্টধর্মের শরণাপন্ন হইয়াছেন। ডক্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল এই মতবাদের যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। (Dr. Seal's Vaisnavism and Christianity দেখুন)। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে এই ভক্তিবাদ যে স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছে, বিশ্বের অন্য কোথায়ও তাহার তুলনা নাই। অবহিত হইয়া বিচার করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের যে দুইটি ধারা এদেশের ধর্ম সাহিত্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল, অন্যদেশে তাহার সুদূর সমতাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষই একমাত্র সেই দেশ যে দেশে ধর্মালোচনার উৎকর্ষ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক স্থানে বলিয়াছেন, "ঈশ্বর ভারতভূমি ধর্মের আকরস্থান করিয়াছেন; তাহার অগণ্য রত্নরাজি এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। যেমন উত্তর হিমালয় ভারতভূমির, যেমন দক্ষিণ সাগর ভারতভূমির, যেমন গঙ্গানদী ভারতভূমির, তেমনি, বেদ উপনিষৎ ভারতভূমির, তেমনি পুরাণও ভারতভূমির।"

ভারতের এই বৈশিষ্ট্য জানিবার মত, জানাইবার মত, গর্ব করিবার মত। যে দেশই সভ্যতা ও শিক্ষার গর্ব করুক না, আর কোনও দেশই এ-কথা বলিতে পারে নাই যে অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা অমরত্ব লাভ করা যায়। আর কোনও দেশই বলিতে পারে নাই যে, ভগবানকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' আর কোনও উপায় নাই।

জ্ঞানযোগের দ্বারা হিন্দুরা যে সত্য লাভ করিলেন শুধু দার্শনিকতত্ত্বে তাহার পরিশেষ হইল না। সার সত্যকে শুধু Substance, Pure

Being or Absolute বলিয়া হিন্দুরা নিরস্ত হন নাই। তত্ত্বজ্ঞানে যে সত্যের উপলব্ধি হইল, সাধনার দ্বারা জীবনে তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য হিন্দুরা চেষ্টিত হইলেন। হিন্দুধর্মের ইতিহাস প্রধানতঃ সেই সাধনারই ইতিহাস। কাজেই তাঁহারা ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া জানিতে পারাই চরম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

'যস্তং ন বেদ কিং ঋচা করিষ্যতি।'—শ্বেতাশ্বতর।

তাঁহাকে যে জানেনা, ঋগ্বেদ অর্থাৎ বেদাধ্যয়নে তাহার কি ফল হইবে?

ইহার পর হিন্দুদের চিন্তাধারা এক অলৌকিক রহস্যের সন্ধান পাইল। ভগবান্ শুধু জ্ঞানবেদ্যতত্ত্ব নহেন, তিনি রস বস্তু। তাঁহাকে আস্বাদন করিতে পারা যায়। ভগবানকে জানিলেই যে তাঁহাকে আস্বাদন করা যায়, তাহা নহে। প্রাকৃত বস্তুর রস গ্রহণের জন্য রসনা নামক একটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় আছে, আধ্যাত্মিক রসগ্রহণ বা আস্বাদনের জন্যও তেমনি একটি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তি আছে—ইহারই নাম ভক্তি। ভক্তি যে চিত্তের রস গ্রহণশীলতা (Emotion) ধর্ম হইতে জন্মলাভ করিয়াছে, ইহা অনেকে হয়ত স্বীকার করেন না। বিশুদ্ধ জ্ঞানবাদীরা বলিবেন, ভক্তি পরাবিদ্যারই একটি নাম। কিন্তু এ মত ঠিক বলিয়া মনে হয় না। ভক্তিধর্মের রত্ন পেটিকা স্বরূপ ভগবদ্গীতায় যখন বলা হইয়াছে যে 'ভক্ত্যাহং .একয়া গ্রাহ্যঃ,' অথবা 'ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া,' তখন ভক্তিকে তত্ত্ব জ্ঞানের স্বপর্যায়ভুক্ত করিবার চেষ্টা বৃথা মনে হয়। ভগবদ্গীতায় ভক্তির অর্থ স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভক্তির অর্থ সম্পূর্ণ শরণাগতি বা প্রপত্তি। ভগবানকে আশ্রয় করিতে হইবে সর্বতোভাবে —'প্রভুঃ সাক্ষীর্গতির্ভর্ত্তা নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।' অবশ্য জ্ঞান ও ভক্তি যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বা ভিন্নধর্মী, সে কথা বলা হইতেছে না। উভয়ই মানব মনের ধর্ম, এজন্য তাহাদের ধারা অনেক সময়ে এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে উহাদিগকে পৃথক করা কঠিন। বস্তুজগৎ হইতে উপমা সংগ্রহ করিলে বলা যায় যে ফুল ও ফলের সঙ্গে, পরাগ ও

পরিমলের সঙ্গে, শব্দ ও সঙ্গীতের সঙ্গে যেমন ঐক্য থাকিলেও প্রভেদ, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সম্বন্ধ কতকটা সেইরূপ বলিলে অসঙ্গত হয় না।

বৈষ্ণবের এই ভক্তিবাদে হিন্দুদের ধর্ম কিরূপে পরিণতি লাভ করিল, তাহা এই গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি শুধু এই কথা বলিতে চাই যে ক্রমবিবর্তনের ফলে ভক্তিবাদের আবির্ভাবে কালের ঘড়িতে উন্নতির কাঁটা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। শ্রীরামানুজাচার্য, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস, নামদেব, তুকারাম প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই ভক্তিবাদ কিরূপে সৌন্দর্য-মাধুর্য মণ্ডিত হইয়া ফুলফলে পরিশোভিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইবে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে 'ভারতী মহাবিদ্যালয়', যাহা ভারতে আর্য ধর্ম-কৃষ্টি ও শিক্ষার প্রচার করিতে এবং ভারতের সন্তানদের মধ্যে সর্বাঙ্গীন ও আদর্শ শিক্ষা বিস্তারকল্পে গঠিত হইয়াছে, এই প্রকার গ্রন্থকে তাহার ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করিয়া সমীচীন কার্যই করিয়াছে। দেশে এই শ্রেণীর পুস্তকের যথেষ্ট প্রচার হওয়া একান্ত আবশ্যক।

রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৯
বালিগঞ্জ প্লেস্
কলিকাতা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

বিজ্ঞপ্তি

ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি এবং ইহার গ্রন্থ প্রকাশ বিভাগ কি কি বিষয়ের ভার গ্রহণ করিয়াছে ইহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহারই কিছু এস্থলেও সাধারণের এবং পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পুনঃ প্রকাশিত করিতেছি।

আর্য ঋষিকুল-সেবিত পুণ্যভূমি বীর-প্রসবিণী ভারতে প্রাচীন যুগের গুরুকুল মহাবিদ্যালয়ের ও পরবর্তী যুগের নালন্দা-তক্ষশীলা-বিক্রমশীলা প্রমুখ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে কলিকাতা সন্নিকটস্থ পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে বিস্তীর্ণ ভূভাগে বর্তমান যুগোপযোগী সর্বাঙ্গীন শিক্ষার একটি আদর্শ আর্য-বিশ্ববিদ্যালয়রূপে ইহাকে পরিণত করাই ইহার কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য। এই বিরাট পরিকল্পনা লইয়া মাত্র এক বৎসর পূর্বে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধ বিগ্রহাদি নিবন্ধন আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক এই মহা সঙ্কট সময়েও এই উদ্দেশ্যের পথে ইহা কতকাংশে অগ্রসর হইয়াছে। ইতিমধ্যে কয়েকটী বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইহার কয়েকটী গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সম্প্রতি ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে (কলিকাতা হইতে মাত্র ৩ মাইল উত্তরে) ইহার গুরুকুল কেন্দ্র ও উপাসনা-মন্দির গত জন্মাষ্টমী দিবসে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

এই মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য আর্য-কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচার করা। তদুদ্দেশ্যে ইহার গ্রন্থপ্রকাশ বিভাগ বর্তমানে ছয়টী বিভিন্ন গ্রন্থমালা প্রকাশের কার্যারম্ভ করিয়াছে—(ক) ধর্ম গ্রন্থমালা (খ) দর্শন গ্রন্থমালা (গ) শিক্ষা গ্রন্থমালা (ঘ) জৈনশাস্ত্র গ্রন্থমালা (ঙ) আর্য সমাজতত্ত্ব গ্রন্থমালা (চ) ভারত ইতিহাস গ্রন্থমালা। যে সব ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত প্রভৃতি ভাষায় লিপিবদ্ধ আছে ঐগুলি মূলসমেত হিন্দী

বাংলা ও ইংরেজী ভাষাতে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ এই তিনটী কথ্যভাষার যে কোন ভাষায় বা গ্রন্থকারের ইচ্ছানুযায়ী অন্য কোন ভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে।

এক্ষণে বর্তমান গ্রন্থখানির সম্বন্ধে কয়েকটী কথার অবতারণা করিতেছি।

কিছুকাল পূর্বে পরলোকগত অনারেবল্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বারা গ্রন্থকারের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়। তিনি ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউট্ ও ভারতী মহাবিদ্যালয়ের কার্যকলাপে বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন ও ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হ'ন। তিনি বহুকাল যাবৎ শাস্ত্রাদি চর্চায় নিযুক্ত আছেন। তিনি তাঁহার লিখিত কয়েকটী গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আমাকে দেন। তন্মধ্যে একখানি গ্রন্থ "বৈদিক যুগে জাতিতত্ত্ব" ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্স্টিটিউটের 'জাতিতত্ত্ব গ্রন্থ মালা'র অন্তর্ভুক্ত হইয়া শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। কতকগুলি পাণ্ডুলিপি 'শ্রীভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। গ্রন্থকারের অন্য একখানি গ্রন্থের (ওঁঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব) পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ধর্মগ্রন্থমালার দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে অদ্য প্রকাশিত হইল

বর্তমান গ্রন্থখানিও এই ধর্ম গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইতেছে। ইহা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। দ্বিতীয় খণ্ডে বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন ধর্ম প্রচারকদিগের জীবনী ও অন্যান্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহা পৃথকাকারে এই গ্রন্থমালার চতুর্থ গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে এবং ইহার মুদ্রণ কার্য কতকটা অগ্রসর হইয়াছে। গ্রন্থকার রচিত শৈবধর্ম সম্বন্ধে অন্য একখানি গ্রন্থও আমাদের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হইতেছে। ইহা বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদের গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে ইংরেজী ও বাংলাভাষায় গবেষণামূলক অনেক গ্রন্থ

প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু গ্রন্থকার বর্তমান গ্রন্থে কিভাবে বৈদিক সাহিত্য হইতে হিন্দুধর্মের ক্রমাভিব্যক্তি হইয়াছে এবং বৈষ্ণব ধর্মের মূলতত্ত্বের সন্ধান বৈদিক ও পৌরাণিকাদি সাহিত্যে কি পরিমাণে আছে তাহা যেরূপ সুনিপুণভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অতি অল্প-সংখ্যক গ্রন্থেই পাওয়া যায়। সেজন্য গ্রন্থকারের আজীবন সাধনালব্ধ এই প্রকার তত্ত্ব ও তথ্যমূলক গ্রন্থ যে সাধারণ পাঠক ও গবেষকদিগের নিকট উপস্থাপিত করা একান্ত প্রয়োজন তাহা বলা বাহুল্য। যাঁহারা মূল শাস্ত্রাদি পাঠের সুযোগ পান নাই তাঁহারা ইহার মধ্যে শাস্ত্রনিহিত অনেক তথ্যের সন্ধান পাইবেন। এজাতীয় গ্রন্থ যে বাংলা ভাষাকেও সমৃদ্ধ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আর গ্রন্থকার তাঁহার এই গ্রন্থকে আমাদের ধর্ম গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করায় তাঁহার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

যাহাতে এই প্রকার গ্রন্থের বহুল প্রচার হয় সেজন্য আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গের ও পাঠাগার গুলির সহানুভূতি কামনা করি। ইতি—

কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা (রাসপূর্ণিমা)
বাং ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯
ইং ২২শে নভেম্বর, ১৯৪২
ভারতী মহাবিদ্যালয়-কার্যালয়
১, গৌরলাহা স্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীসতীশচন্দ্র শীল
(সাধারণ সম্পাদক)

মুখবন্ধ

পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের প্রধান তিন দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর, তাঁহারা যথাক্রমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। বিষ্ণু কোন কোন স্থানে নারায়ণ, কোন স্থানে বাসুদেব নামেও কথিত হইয়াছেন। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের যখন অভ্যুদয় ঘটে তখন পুনর্বার ধর্ম্ম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি নানারূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। প্রয়োজন অনুসারে এই সকল অবতার কখন আংশিক অবতার কখন বা পূর্ণ অবতার। পূর্ণ অবতারের দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "আমি জন্মরহিত, অব্যয়, ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান পূর্বক আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি"। যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু ও তাঁহার অবতারসকলের বিগ্রহে তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠান করেন। বিষ্ণুর এই সকল বিগ্রহ ও অবতার-গুলির যাঁহারা উপাসক তাঁহারা বৈষ্ণব। বিষ্ণুনামের পশ্চাতে প্রাচীন বৈদিক আর্য্যদিগের জীবনপথের এক অপরিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের নানাস্থানে তেত্রিশ জন দেবতার উল্লেখ আছে, যথা (১।৩৪।১১, ১।৪৫।২) বিষ্ণু তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ৩৩জন জন দেবতার মধ্যে ৩১ জন গণদেবতা, অবশিষ্ট দুই জন যে কে তাহা স্থির নির্ণয় করা সুকঠিন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ মতে (৩য় অ. ৯ ব্রহ্মণ) 'তাঁহারা ইন্দ্র ও প্রজাপতি'। কেহ কেহ দ্যাবা পৃথিবীকে এই দুই দেবতা বলেন। দ্যাবা পৃথিবী খুব প্রাচীন দেবতাও বটেন। এবং যতদূর জানা যায় মানবজাতীর প্রথম ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠানের ইহারা-দেবতা। বার জন আদিত্য, এগার জন রুদ্র এবং আটজন বসু—ইহারা গণদেবতা। বিষ্ণু আদিত্যদিগের মধ্যে অন্যতম। তিনি সর্বকনিষ্ঠ আদিত্যও বটেন। ঋগ্বেদের প্রাচীন মন্ত্রগুলিতে ছয় জন আদিত্যের নামোল্লেখ দেখা যায়। তাঁহারা মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ। নবম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের ৩য় মন্ত্রে বলা হইয়াছে, সূর্য্যের অধিষ্ঠান স্বরূপ যে সাত দিক আছে তাহাতে সাতজন সূর্য্যদেব (আদিত্য) আছেন। তাঁহাদের নামোল্লেখ নাই। আদিত্যগণ

অদিতির পুত্র। দশম মণ্ডলের ৭২ সূক্তের অষ্টম মন্ত্রে বলা হইয়াছে অদিতির আট পুত্র (আট আদিত্য) জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে সাতটী লইয়া তিনি দেবলোকে গেলেন, মার্ত্তণ্ড নামক অষ্টম পুত্রকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। এখানেও এই সাতজন আদিত্যের নামোল্লেখ নাই।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আটজন আদিত্যের নাম আছে; তাঁহারা ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্ ও ইন্দ্র। এখানে উপরে উল্লিখিত ঋগ্বেদের ছয় জন আদিত্যের মধ্যে দক্ষের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে; ধাতা, বিবস্বান্ ও ইন্দ্র এই তিন নূতন নাম যোজিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৬।৩।৮) দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে। তাঁহারা তথায় দ্বাদশ মাস বা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য। "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশমাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" দ্বাদশ মাসে এক বৎসর, প্রতি মাসেই আদিত্য জীবের পরমায়ুকে আদান (গ্রহণ) করিয়া চলিয়া যায়, এই অর্থে সম্বৎসরের দ্বাদশ মাসকে দ্বাদশ আদিত্য বলা হইয়াছে। ইহারা প্রাণিগণের আয়ু ক্ষয়ের কারণ। বৈদিক সাহিত্যে আদিত্যগুলির মধ্যে বিষ্ণুর নাম নাই। মহাভারত পুরাণাদিতে দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিষ্ণুর নাম রহিয়াছে:—যথা, মহাভারত আদিপর্ব ১২১ অধ্যায়ে—

> ধাতার্য্যমাশ্চ মিত্রশ্চ বরুণোংশো ভগস্তথা।
> ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষাচ ত্বষ্টাচ সবিতাতথা॥
> পর্জ্জণ্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।

ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, বিবস্বান্, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, বিষ্ণু। পর্জন্য আদিত্যের মধ্যে গণ্য নহে। ঋগ্বেদে পর্জন্য সোমের পিতা, মেঘের দেবতা ও বৃষ্টির প্রেরক এরূপ বলা হইয়াছে। এখানে বিষ্ণুর নামোল্লেখ করা হইয়াছে সকলের পরে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে আটজন আদিত্যের নাম রহিয়াছে, তন্মধ্যে সর্বশেষ আদিত্য ইন্দ্র। দ্বাদশ আদিত্যের অপর চারিজন আদিত্য পরবর্ত্তীকালের কল্পনা, এবং তন্মধ্যে বিষ্ণু সর্ব কনিষ্ঠ আদিত্য। ঋগ্বেদের দেবতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব প্রধান তিনি ইন্দ্র, তিনি প্রধানতঃ যুদ্ধের দেবতা। তাঁহার উদ্দেশ্যে অন্যূন ২৫০ সূক্ত রচিত হইয়াছে। তৎপর অগ্নির স্থান। অগ্নির উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত সংখ্যাও প্রায় দুইশত, তদনন্তর সোম ও অশ্বিনীদ্বয়। তাঁহাদের

উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত সংখ্যাও শতাধিক। এই সকলের তুলনায় বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত সূক্ত সংখ্যা গণনার মধ্যেই আইসে না। সমগ্র ঋগ্বেদের মধ্যে মাত্র ৩টী সূক্তের সব কয়টি মন্ত্র বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। ইহারা প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ ও ১৫৬ সূক্ত এবং সপ্তম মণ্ডলের ১০০ সূক্ত। এতদ্ভিন্ন কোন কোন সূক্তে অপরাপর দেবতাদের সঙ্গে বিষ্ণুর স্তুতি মন্ত্র রহিয়াছে। ইহারা প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৬-২১ ঋক, সপ্তম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ১, ২, ৩, ৭ম ঋক, অষ্টম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের দশম ঋক এবং দশম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তের ৪, ৫ ঋক। কিন্তু মন্ত্র সংখ্যা কম হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটিই বিষ্ণুর অপরিসীম মহীমা ও পরাক্রম ঘোষণা করে।

ঋগ্বেদের বরুণ ঋতের দেবতা। পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে পরম মনোগ্রাহী ভাষায় অনেক ঋষি কর্তৃক অনেক মন্ত্র রচিত হইয়াছে। ইহার দশম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তের পঞ্চম মন্ত্রে ঋষি (বসুকর্ণ) বরুণের প্রতি স্তুতির সঙ্গে বিষ্ণুকে "মহীয়ান্" (বিষ্ণুর্মহিমা) বলিয়া তাহাকে পাপ হইতে ত্রাণ ও তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত গৃহদানের জন্য বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। অষ্টম মণ্ডলের ৭৭ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ইহার দশম ঋকে ঋষি বলিতেছেন, "ইন্দ্রের যে সমস্ত জল আছে, বিষ্ণু তাহা প্রদান করেন।"

সপ্তম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তে ঋষি বশিষ্ঠ বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—"যাহারা জন্মিয়াছে, যাহারা জন্মিবে কাহারও তোমার মহিমার অন্ত দেখিবার শক্তি নাই।" ঐ সূক্তের অপর মন্ত্রে ঋষি বলিতেছেন :—

"হে বিষ্ণো! তোমার শরীরকে পরিমিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া যখন বর্দ্ধমান কর, কেহই তোমার মহিমা অনুব্যাপ্ত করিতে পারে না ("তে মহিত্বমন্বশ্নুবংতি") বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত প্রায় সকল মন্ত্রই তাঁহার অপরিসীম শক্তি ও মহিমার সহিত তাঁহার কল্যাণময় প্রশান্ত মূর্ত্তির পরিচয় দেয়। কোন কোন মন্ত্রে ইন্দ্র ও বিষ্ণু এক সঙ্গে উভয়ের স্তুতি প্রসঙ্গে রচিত হইয়াছে, যথা, "হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা সূর্য, অগ্নি ও উষাকে উৎপাদন করিয়া যজমানের জন্য বিস্তীর্ণ লোক নির্মাণ করিয়াছ ৭-৯৯-৪।" প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সূক্তে ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয় দেবতাকে দুর্দ্ধর্ষ ও মহীয়ান্ বলা হইয়াছে। ঐ মণ্ডলের ২২ সূক্তের ১৯ ঋকে বিষ্ণুকে ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা বলা হইয়াছে।

(ইংদ্রস্য যুজ্যঃ সখা)। এই সকল হইতে দেখা যায় বিষ্ণু পরাক্রমে ইন্দ্র হইতে কোন অংশে ন্যূন নহেন। ঋষি বশিষ্ঠ বিষ্ণুকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "আমরা পৃথিবী অন্তরীক্ষ উভয় লোক জানি, কিন্তু দেব! তুমিই কেবল ইহাদের পরলোক অর্থাৎ উপরের লোক যাহা তাহা জান।"

"উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্ব পরমস্য বিৎসে॥"

এই প্রকার আর একটি মন্ত্র আছে যথা, প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তের ২০ মন্ত্র, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যংতি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততং"।

(বিষ্ণুর পরমপদ বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বদা দৃষ্টি করেন, কিরূপ দৃষ্টি করেন? আকাশে সর্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে)। অষ্টম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১০ম মন্ত্রে ঋষি বৈবস্বত মনু দেবগণের সহিত বিষ্ণুপদের সুখ প্রার্থনা করিতেছেন। বিষ্ণুর পরম পদ কি, ছান্দোগ্য উপনিষদের মধু ব্রাহ্মণে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রহিয়াছে১। ইহা সূর্যের উদয়াস্ত বিবর্জিত ব্রহ্মলোক। সূর্যের উদয়াস্ত না থাকায় সেখানে কালের গণনা হয় না. কালের গণনা হইতে মৃত্যু। ইহা মৃত্যুর অধিকারের বাহির অমরলোক—

এখানে দেখা যায় বিষ্ণু পরাক্রমে ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়েই আদিত্য, কিন্তু এই উভয় আদিত্যই ভারতীয় আর্যদিগের দেবতা। ইরাণীয়দিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বে মিত্র বরুণের প্রাধান্য ছিল। ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলের অধিকাংশ সূক্ত বৈদিক যুগের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কালের রচনা।

ইহার ২৭ সূক্তে দেবতা আদিত্যগণের নাম দেওয়া হইয়াছে—তাঁহারা মিত্র, অর্যমা, ভগ, বহুব্যাপী বরুণ, দক্ষ ও অংশ। বরুণ বহুব্যাপী (প্রধান)। ইন্দ্র ও বিষ্ণুর তখনও কল্পনা হয় নাই। কোন কোন মন্ত্র হইতে ইরাণীয় দিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালের ঘটনার ইঙ্গিত রহিয়াছে এরূপ বুঝা যায়, যেমন ঐ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অর্যমা, মিত্র ও বরুণের নিকট পথকে কণ্টকরহিত ও সুগম করিবার জন্য প্রার্থনা রহিয়াছে। অপর মন্ত্রে বলা হইয়াছে ইঁহারা দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত, সরলস্বভাব, ও সকলের পূজার্হ। তাহার পর দেখা যায়

১ 'ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব' নামক মদীয় গ্রন্থে তাহার বর্ণনা আছে। ৮১ পৃষ্ঠা।

ক্রমে ইন্দ্রের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে, অর্যমা ও মিত্রের প্রভাব হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু বরুণ তখনও প্রধান দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

মিত্র ইরাণীয়দিগের শ্রেষ্ঠ দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, কিন্তু ভারতীয় আর্যদিগের নিকট হইতে তিনি ক্রমশঃ অপসৃত হইতে থাকিলেন। এইক্ষণ বরুণের একাধিপত্য। তাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রগুলি একাধারে তাঁহার অপরিসীম শক্তিমত্তার পরিচায়ক ও পবিত্র ভাবব্যঞ্জক। তিনি জগতের নায়ক (২-২৮-৩)। এই সূক্তের পরবর্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

"জগতের ধারক বরুণ জল সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মহিমায় নদীসকল অবিরাম গতিতে প্রবাহিত হইতেছে"

পঞ্চম মন্ত্র—

"হে বরুণ! পাপ আমাকে রজ্জুর ন্যায় বাঁধিয়াছে, তাহা মোচন কর।"

ষষ্ঠ মন্ত্রে বরুণকে সম্রাট ও সত্যবান্ রূপে আহ্বান করিয়া বলা হইয়াছে "বৎস হইতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপ মোচন কর। তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহই তিষ্ঠিতে পারে না"। বরুণ সর্বলোকের শাসক (৩০-১২৩-৬)। ক্রমে ইন্দ্র বরুণকেও অতিক্রম করিয়া চলিলেন, তখন এই দুই দেবতার মধ্যে কে বড় সে সম্বন্ধে ঋষিদের অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবশেষে তাঁহারা ইন্দ্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতার আসন দিলেন বটে, কিন্তু বরুণকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এইসময় হইতে বহির্জগতের অধিপতি হইলেন ইন্দ্র (৮-১৬-১), আধ্যাত্মিক রাজ্যে বরুণের প্রাধান্য স্থির থাকিল। ইন্দ্র সম্রাট, বরুণ স্বরাট্ (৭-৮২-২)। অতঃপর ইন্দ্র ও বরুণের একসঙ্গে স্তুতি (৮-৫৯ সূক্ত)। আধ্যাত্মিক রাজ্যে বরুণের প্রভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি যজ্ঞরক্ষক (১-১০৫-১৫), আশ্রিতবৎসল, পাপের মোচন কর্ত্তা। অবশেষে তিনি প্রায় ঈশ্বরের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন দেখা যায় (৫-৮৫-৫, ৬, ৭, ৮)। তাঁহার সর্বেশ্বরত্ব অথর্ববেদে আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। ইন্দ্র যুদ্ধের দেবতা, সংগ্রামে তিনি অপরাজেয়। আর্যগণ যখন পঞ্জাবের সমতল-ভূমিতে উপনীত হইলেন তখন তথায় অনার্য দাস ও অন্যান্য কোন কোন পরাক্রমশালী জাতির বসতি ছিল। তাহাদের অধিকাংশ লোক ব্যাপকভাবে কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছিল এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রাম ও নগরীতে বাস করিতেছিল। নূতন আগন্তুকদিগকে

তাহারা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়িয়া দেয় নাই। অহর্নিশি সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহাদিগের উপনিবেশ স্থাপন ও গোধন রক্ষা করিতে হইত—তাঁহাদের তখন যাযাবর জীবন। দীর্ঘকাল এভাবে যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাঁহারা স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও কৃষিকার্য দ্বারা শস্যোৎপাদনে সমর্থ হন। ঋগ্বেদ হইতে দেখা যায়, সে সময় পঞ্জাবে এক সুদীর্ঘ কালব্যাপী অনাবৃষ্টির যুগ চলিতেছিল। আকাশে মেঘ দেখা যায় কিন্তু বৃষ্টি নাই। ইহা বৃত্র নামক অসুরের কার্য এই বিশ্বাস, এবং সেজন্য বৃত্রকে বিনাশ করতঃ জলরাশিকে মুক্ত করা প্রয়োজন। একমাত্র ইন্দ্রই তাহা করিতে সমর্থ, এইজন্য বিশেষভাবে ইন্দ্রের আরাধনা প্রয়োজন। ইন্দ্র দেবতা কে? ইহা এক গভীর প্রশ্ন। দেখা যায় ইরাণীয়রাও তাঁহাকে বৃত্রহান্ নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় আর্যগণ যখন তাঁহাকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করিতে থাকেন তখন হইতে তাঁহারা তাহাকে প্রবল শত্রু দস্যু আখ্যা প্রদান করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন ভারতীয় আর্যশাখা ইন্দ্রের অনুকম্পায় জয় লাভে সমর্থ হইয়াছিল। সে সময় হইতে ইন্দ্র সংগ্রামে তাহাদের প্রধান নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি যুদ্ধে আর্যদিগের সেনাপতি এবং দেবতা। সুদীর্ঘ কাল ব্যাপী যে অনাবৃষ্টির যুগ চলিযাছিল, তাহার মূলে ছিল বৃত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য এবং অনার্যদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করিবার জন্য ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে সোমাভিষেক প্রয়োজন হইত। ক্রমে তিনি সর্বপ্রকার অভীষ্ট ফলপ্রদ সর্বেশ্বর দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অনাবৃষ্টির যুগ যখন চলিয়া গেল, অনার্যগণের সঙ্গে কালে যখন সংঘর্ষের অবসান হইল, আর্যগণ পঞ্জাবের সীমানা আক্রমণ করতঃ পূর্বদিকে গঙ্গার উপকূল প্রদেশ পর্যন্ত উপনিবেশ বিস্তার করিলেন, তখন এরূপভাবে ইন্দ্রের আনুগত্যের প্রয়োজন আর থাকিল না। এযাবৎ আত্মরক্ষার জন্য নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের অবকাশই ছিল না। দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও নিরাপদ জীবনযাত্রা নির্বাহের সুযোগ যখন ঘটিল, গাঙ্গেয় উপকূল ও মধ্য হিমালয় কূর্মাচল প্রদেশের অপূর্ব সৌন্দর্য ভাণ্ডার পূর্ণ মহিমায় তাঁহাদের কল্পনাপ্রিয় চিত্তকে অভিভূত করিল। প্রকৃতির এই অফুরন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত মঙ্গলময় মূর্তির মধ্যে তাঁহারা বিষ্ণু দেবতার

সন্ধান পাইলেন। দেশে শান্তি বিরাজ করিতেছে, আত্মরক্ষার জন্য দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনার বিশেষ প্রয়োজন থাকিতেছে না, এইজন্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত স্তোত্রসংখ্যা এত কম। কিন্তু তাহাতে বিষ্ণুর মহিমার কোনরূপ হ্রাস প্রকাশ করে না। বরং ইন্দ্রের প্রাধান্য ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে, এবং ঋগ্বেদীয় যুগের শেষভাগে প্রজাপতি নামক এক নূতন দেবতা মস্তকোত্তোলন করিতেছেন দেখা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ গবেষণা সহকারে বৈদিক সাহিত্য সকলের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মনে করেন ঋগ্বেদের প্রথম ও দশম মণ্ডলে ধৃত মন্ত্রগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা। দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তগুলি অতি প্রাচীন রচনা। ইহাদের অনেক স্থানে আর্যদিগের এদেশে আগমনের পূর্ববর্তী অনেক ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়। দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তের ঋষি হিরণ্যগর্ভ হব্য সামগ্রীহস্তে বলিতেছেন "কোন্ দেবতাকে (১) হব্যদ্বারা পূজা করিব?" (কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম) ঋষি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া যতটা পারিয়াছেন তাহার মীমাংসা করিলেন, প্রজাপতি সেই দেবতা, "তিনি জীবাত্মা দিয়াছেন, বল দিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকল দেবতা মান্য করে। এই সমুন্নত আকাশ ও এই পৃথিবীকে তিনি নিজ নিজ স্থানে দৃঢ়রূপে স্থাপন করিয়াছেন—তিনি নিজ মহিমা দ্বারা যাবতীয় দর্শনেন্দ্রিয় যুক্ত গতিশক্তি সম্পন্ন জীবগণের রাজা, দ্বিপদ চতুষ্পদদিগের প্রভু"। তাঁহাকে হব্য প্রদানের অভিলাষী হইয়া বলিলেন "হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত অপর কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে নিজের আয়ত্বাধীন করিতে সমর্থ হয় নাই"।

ইহা হইতে দেখা যায় প্রজাপতি দেবতার শক্তি ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিতেছে। ঋগ্বেদের আর একটি প্রাচীন দেবতা রুদ্র। তাঁহার শক্তি অমঙ্গলপ্রদ। তাঁহার ক্রোধ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য তাঁহার নিকট যত সব প্রার্থনা। বিষ্ণুর রূপ মঙ্গলময় আর এই দেবতার রূপ অমঙ্গলপ্রদ, ইহার পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু শক্তি উভয়েরই অপ্রতিহত। ক্রমে অন্যান্য দেবতা এমন কি ঋগ্বেদের প্রধান দেবতা যে ইন্দ্র তিনি পর্যন্ত দৃষ্টি-

(১) উত্তরকালে উপনিষদ্ যুগে এই "ক" প্রজাপতির এক নামরূপে গৃহীত হইয়াছে।

পথের বাহির হইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রজাপতি, বিষ্ণু ও রুদ্রের শক্তি অপ্রতিহত থাকিল।

ঋগ্বেদের যুগে এই সকল দেবতাই কোন না কোন নৈসর্গিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিত। তাহা অতিক্রম করিয়া এই সকল দেবতার সত্তা তখনও স্পষ্টরূপে অনুভূতির বিষয় হয় নাই। তাঁহারা abstract ideas মাত্র। পরবর্তীকালে যজুর্বেদের সময় দেখা যায় প্রজাপতি বিষ্ণু ও রুদ্র সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় গ্রাহ্য সীমা অতিক্রম করিয়া স্থূল দেহবিশিষ্টের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে। তাঁহাদের উপর মানবীয় বৃত্তি ও ইন্দ্রিয়সকল আরোপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা নরীভূত (anthropomorphosed) হইতেছেন।"আমরা প্রজাপতির প্রজা "প্রজাপতে প্রজা অভূম" (৯।২১)।

গর্ভে প্রজাপতি বিচরণ করেন; অজায়মান থাকিয়াও নানা আকারে জন্মগ্রহণ করেন।

"প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভেঽন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।"

(৩১।১৯)

এই বেদের শত রুদ্রীয়তে রুদ্র প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপে মঙ্গলময় একটা দিক যে আছে তাহাও বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক স্থানে তাঁহাকে এক অরণ্যচারী ব্যাধরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে—

"যামিষুং গিরিশন্ত হস্তে বিভর্ষ্য স্তবে।
শিবাং গিরিত্র তাং কুরু মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ॥"

হে পর্বতোপরি বিচরণশীল শিকারী! তোমার হাতে যে বাণ তুমি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত, গিরিত্র আমাদের জন্য তুমি তাহা মঙ্গলপ্রদ কর। মানুষ কিম্বা অপর কোন জঙ্গম প্রাণীকে তুমি হিংসা করিও না"।

মঙ্গলময়রূপে যখন প্রকাশিত হন, তখন তিনি শিব, ত্র্যম্বক, শম্ভু, ভব, সর্ব, গিরীশ। অনূঢ়া বালিকারা স্বামী লাভের জন্য তাঁহার পূজা করে।

"ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনম্" (৩।৬০)

"আমরা সুগন্ধি পুষ্পসহকারে পতিলাভের জন্য ত্র্যম্বকের আরাধনা করি"। বর্তমানকালেও কুমারীরা যে শিবপূজা করে তাহারও এই উদ্দেশ্য।

এই বেদে বিষ্ণুরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে দেখা যায়। একস্থানে (৮।১) তাঁহাকে 'উরুগ' বলা হইয়াছে। প্রতি পদক্ষেপে তিনি বিস্তীর্ণ দেশ অতিক্রম করেন। এই বেদে প্রজাপতি, বিষ্ণু ও রুদ্র তিনজন স্বতন্ত্র দেবতা বটেন তথাপি বৈদিক যুগের অপরাপর দেবতাদিগের ন্যায় তাঁহাদেরও নৈসর্গিক শক্তিনিচয়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ। নৈসর্গিক শক্তি-নিরপেক্ষ তাঁহাদের কোন স্বতন্ত্র সত্বার অনুভূতি ঋষিদের অন্তরে তখনও পরিস্ফুট হয় নাই। ইঁহারা যে একই মহাশক্তির বিভিন্ন দিক (aspect) বৈদিক যুগের কোন কোন ঋষির অন্তরে তাহার ক্ষীণ ছায়াপাত হইলেও তাহারা পৃথক পৃথক্ ভাবে খণ্ডশঃ আকারে অবস্থিতি করিতেছে, এই ছিল বৈদিক ঋষিদিগের ধারণা। উপনিষদ যুগের ঋষিরা সমগ্রভাবে এই সত্বাকে গ্রহণ, এবং ইঁহাকে খণ্ডশঃ আকারে অবস্থিত শক্তিগুলির নিয়ামক এক পরম শক্তিরূপে জানিতে পারিয়া ইঁহাকে ব্রহ্ম, আত্মা, অক্ষর, পুরুষ ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। যজুর্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় শ্রুতির তৃতীয় বল্লীর প্রথম অনুবাকে বরুণপুত্র ভৃগুকে বলিতেছেন,—

"যাঁহা হইতে ভূত গ্রামসকল উৎপন্ন হইয়াছে, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে জীবন ধারণ করে, অন্তে যাঁহাতে প্রতিগমন করে ও প্রবিষ্ট হয়, তিনি জিজ্ঞাসিতব্য, অর্থাৎ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বরূপের তিন দিকের (aspect) বর্ণনা—ইহারা ঈশ্বরের সৃজন, পালনী ও সৃষ্টির লয় বিধান শক্তিকে জ্ঞাপন করে। পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরের এই তিন দিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তির রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে (১০ম ৯০ সূ) প্রথম নারায়ণের নাম পাওয়া যায়। তথায় তিনি ঋষি সূক্তের দেবতা পুরুষ। নারায়ণ বিষ্ণু হইতে পৃথক। ঐ মণ্ডলের ৮২ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে অজপুরুষের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে "তাঁহার নাভিদেশে যে সৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছিল, সমস্ত বিশ্বভুবন তাঁহাতে অবস্থিত আছে, আপ্‌সকল ইহাই আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে দেবতাগণ পরস্পরকে দেখিতেছেন"। পূর্ব মন্ত্রে আপ্‌কে জল বলা হইয়াছে। মনুসংহিতায় (১।১০) আপ্‌কে নার বলা হইয়াছে। মহাভারত বনপর্বে ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে এক প্রলয়ের বর্ণনা আছে। এক ক্ষুদ্র ন্যগ্রোধ শাখা অবলম্বনে এক বালককে ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া মার্কণ্ড

মুনি তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিলেন পূর্বে আমি জলরাশিকে **নারা** নাম দিয়াছিলাম। সেই জল আমার অয়ন (অর্থাৎ বিশ্রাম স্থান) ছিল, এইজন্য আমি **'নারায়ণ'**। পুরুষ সূক্তের ঋষি নারায়ণ ও দেবতা পুরুষ এই উভয় নাম যোগ করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুষনারায়ণের এক আখ্যা আছে। তিনি পঞ্চরাত্র যজ্ঞ করিয়া জাগতিক বস্তু সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকমতে বিষ্ণু ও নারায়ণ উভয় একই দেবতার দুই পৃথক্ নাম। তিনি যজ্ঞ-পালক, যজ্ঞেশ্বর। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে নারায়ণের ভজনার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে তিনি সহস্রশীর্ষযুক্ত, বিশ্বদর্শী, বিশ্বাত্মক, বিশ্বের কারণ।

মহাভারতের শান্তিপর্বে (৩৩৫-৫২অ) নারায়ণ সম্বন্ধে কতকগুলি আখ্যানের বর্ণনা আছে, তিনি বিশ্বাত্মা। এক আখ্যানমতে স্বায়ম্ভুব মনুর কালে এই বিশ্বাত্মা ধর্মের পুত্র হইয়া নর, নারায়ণ, হরি, কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হন এবং ইহাদিগের মধ্যে নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ইত্যবসরে নারদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের নির্দেশ ক্রমে তথা হইতে আদ্যামূর্তি নারায়ণের দর্শনাভিলাষে শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। নারায়ণ নারদের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্চরাত্রসম্মত চতুর্ব্যূহাত্মক ঐকান্তিক ধর্মতত্ত্ব তাঁহার নিকট বর্ণনা করেন, এবং বলেন সপ্তম মনুর যুগে (বর্ত্তমানে এই যুগ চলিতেছে) এই গুহ্যাতিগুহ্য ধর্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। ভূভারহরণের জন্য তিনি নানা অবতারের বেশে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরিশেষে মথুরাতে কংস ও অন্যান্য দানবদিগকে বিনাশ করিয়া দ্বারকাতে নিজের বসতি স্থাপন করিবেন এবং তথায় আপন ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্রের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ব্যূহ মূর্তির কার্যসকল সম্পাদনান্তে সাত্বতগণসহ দ্বারকাপুরী ধ্বংস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। নারায়ণ সৃষ্টি সম্বন্ধে নারদকে উপদেশ দিতে গিয়া বলেন বাসুদেবই পরমাত্মা। সকল আত্মার আশ্রয় ও সৃষ্টির মূলাধার।

নারদ শ্বেতদ্বীপে নারায়ণকে স্তুতি প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "পঞ্চরাত্র বেদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে"। এসম্বন্ধে মহাভারতে আরও আখ্যান আছে। ইহাদের একটি আখ্যানে বলা হইয়াছে পঞ্চরাত্র সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম হরি-গীতাতে (ভগবদ্গীতা) পূর্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা ব্রহ্মবিদ্যার

প্রস্থানত্রয়ের সাধন প্রস্থান। এই সাধনের উদ্দেশ্য কি এবং কি কি প্রণালী অবলম্বন দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতে পারে তাহা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ ইহাতে বৈদিক ও পৌরাণিক সাধনার যোগসূত্র বিন্যস্ত রহিয়াছে। বর্তমান গ্রন্থে এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। বর্তমানে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত বৈষ্ণবধর্ম সকলের পঞ্চরাত্রসম্মত ঐকান্তিক ধর্মই মূল। নারদের শ্বেতদ্বীপ গমনের পূর্ব হইতেই এই ধর্ম বর্তমান ছিল। কিন্তু ইহার উদ্ভব হইয়াছে গীতা রচনার পর। ইহা বহু দেবতার পরিবর্তে অব্যভিচারিভক্তি সহকারে এক দেবতার উপাসনামূলক ধর্ম। তিনি বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেব, কৃষ্ণ। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় সর্বপ্রথম নারায়ণের অনুমোদিত এই ধর্ম প্রচারিত হয়। তদনন্তর বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রলয়ান্তে পুনর্বার অপর মনুর আবির্ভাবে কালে ইহা প্রকাশিত হয় ও কাল সহকারে লুপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক মনুর অধিকার কালে এই ধর্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া বর্তমান সপ্তম মনুর যুগে পুনর্বার প্রকাশিত হয়। সত্য যুগে রাজা উপরিচর বসু সূর্যমুখে নিঃসৃত এই অহিংসামূলক পঞ্চরাত্র বিধানমতে পৃথিবীজাত ব্রীহি ইত্যাদি উপকরণরূপে গ্রহণ করিয়া নারায়ণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইহা বর্তমান মনুর সময়ের এই ধর্মানুযায়ী সর্বপ্রথম ক্রিয়ানুষ্ঠান।

বৌদ্ধশাস্ত্র নির্দেশ হইতে দেখা যায়, খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে বাসুদেব বলদেবের উপাসক এক সম্প্রদায় ছিল—কালে ইহা বাসুদেব সঙ্কর্ষণের উপাসনামূলক ধর্মের নাম গ্রহণ করে। খ্রীঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে এই ধর্মের উপাসকরা নিজেদের "ভাগবত" বলিত। ইহাই পরিশেষে নারদ পঞ্চরাত্রসম্মত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্বিধ ব্যূহসমন্বিত ঐকান্তিক বৈষ্ণব ধর্ম নাম গ্রহণ করে।

বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয় কালে যখন অপরাপর সকল ধর্মেরই নিষ্প্রভাবস্থা, দেখা যায় সে সময় এই ঐকান্তিক ধর্ম যমুনার উপকূল প্রদেশ হইতে তথাকার অধিবাসী কোন বৈষ্ণবাচার্য কর্তৃক দাক্ষিণাত্য প্রদেশে দ্রবিড় জাতির মধ্যে তামিল ভাষায় প্রচারিত হয়। দ্রবিড়রা পরম আগ্রহের সহিত এই ধর্ম গ্রহণ করে। দীর্ঘকাল তাহাদের মধ্যে ইহা নিবদ্ধ থাকে। তাহাদের মধ্যে অনেক সাধু, ভক্ত, ও কবি জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহারা এই ধর্মের বার্তা প্রথম ঐ অঞ্চলে বহন করেন তাঁহারা পরমভাগবত ছিলেন।

তামিল ভাষায় তাহাদিগকে আল্‌বার বলে। দ্রবিড় জাতির নিকট তাঁহাদের অপরিসীম সম্মান। অনেক মন্দিরে দেবমূর্তির পার্শ্বে তাঁহাদের মূর্তিও স্থাপিত রহিয়াছে।

যমুনার তীরবর্তী স্থানে এই ধর্মের উদ্ভব হইয়া, দাক্ষিণাত্যে কর্ণাট অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করিয়া এবং দীর্ঘকাল দ্রবিড় জাতির মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া পুনর্বার কিরূপে আর্যসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহার এক পরম রহস্যময় ইতিহাস রহিয়াছে। এক মন্দিরে আল্‌বার শতকোপার রচিত প্রবন্ধ (স্তোত্র) তামিল ভাষায় তাল লয় সহকারে গীত হইতেছিল; ঘটনাক্রমে সে সময় আচার্য নাথমুনি তথায় উপস্থিত হন। তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, পরমজ্ঞানী ও যোগসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। প্রবন্ধগুলি বাসুদেব কৃষ্ণের স্তুতিমূলক ছিল। নাথমুনি ইহাদের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের স্ফুরণ দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি শতকোপার রচিত অনেক প্রবন্ধ সংগ্রহ করেন। এই সকল সঙ্গীতের আধ্যাত্মিক ভাবগুলির যে সারতত্ত্ব তাহা বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদশাখার মূল। নাথমুনি এই সকল সঙ্গীতের সার সংগ্রহ করেন। ইহাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্তী আচার্য যামুন মুনি বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদের সমর্থনে যে সকল গ্রন্থ রচনা করেন, রামানুজ ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীভাষ্যে তাহার বিস্তৃতরূপে আলোচনা দ্বারা জীব ও ব্রহ্ম পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। রামানুজের জন্ম হয় ১০১৭ খৃঃ অঃ চৈত্রমাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্ম-সূত্রে পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত, তাহার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা হইতে রামানুজের ন্যায় আরও কয়েকটি মতের সৃষ্টি হইয়াছে যথা, ভেদাভেদবাদ—ইহার স্থাপয়িতা নিম্বার্কাচার্য; দ্বৈতবাদ—স্থাপয়িতা মধ্বাচার্য; শুদ্ধা-দ্বৈতবাদ—স্থাপয়িতা বল্লভাচার্য। ইঁহাদের মধ্যে এক মধ্বাচার্যের স্থাপিত দ্বৈতবাদ ভিন্ন অপর সকল মতই পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল। ইঁহারা এই সকল মতকে ব্রহ্মসূত্রের স্থির দার্শনিক ভিত্তির উপর স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন মাত্র।

শ্রীশ্রীরামানুজ হইতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম শাখার উদ্ভব হইয়াছে, ইহা সাধারণ মত। ইহা শ্রীসম্প্রদায় নামে পরিচিত।

কালের গণনায় ইহার পর শ্রীশ্রীমধ্বাচার্য প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদ সম্প্রদায়;

ইহার পর অপর নাম ব্রহ্ম সম্প্রদায়। ইহার পর শ্রীনিম্বার্কাচার্য প্রবর্তিত সনকাদি চতুঃসন সম্প্রদায়, ইহার অপর নাম ঋষি সম্প্রদায়। নিম্বার্কাচার্যের জন্ম সময় সম্বন্ধে মতভেদ রহিয়াছে। তিনি মধ্বাচার্য ও বল্লভাচার্যের মধ্যবর্তী কোন সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে তিনি একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। বৃন্দাবনধামে এই সম্প্রদায়ের এক প্রসিদ্ধ মঠ আছে। সেখানকার শেষ মহন্ত শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজী বাঙ্গালী ছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বেও তিনি একজন প্রতিভাশালী মহাপণ্ডিতরূপে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের নিম্বার্কস্বামী প্রণীত ভাষ্যের ব্যাখ্যায় তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আছে, নিম্বার্ক এমন কি শঙ্করাচার্যেরও বহু পূর্ববর্তী কালে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রচিত ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতাদ্বৈতবাদমূলক ভাষ্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যে সকল যুক্তি রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নাই। নিম্বার্কের ভাষ্যে আমরা প্রথম বৃষভানু কন্যার উল্লেখ ও তাঁহার বিশেষ প্রাধান্যের বর্ণনা দেখিতে পাই। শ্রী ও ব্রহ্ম সম্প্রদায়ে কৃষ্ণ ও রাধার কোন উল্লেখ নাই। নারদ পঞ্চরাত্রের সহিত যোজিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ জ্ঞানামৃতসারে বৃষভানুসুতা রাধার মহিমার বিশেষ প্রচার করা হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া আমরা শ্রীনিম্বার্কাচার্য স্বামী যে মধ্বাচার্যের পর প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই মত গ্রহণ করিয়াছি। ইহার সমর্থনে অপর যুক্তিও আছে।

বল্লভাচার্য প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে রুদ্র সম্প্রদায় বলা হয়। গ্রন্থে এই চারি সম্প্রদায়ের (শ্রী, ব্রহ্ম, সনক, রুদ্র) ধর্ম মতের দার্শনিক তত্ত্ব কি, তাহার আলোচনা রহিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে রামানুজ প্রবর্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের প্রাধান্য। গুরুপরম্পরাক্রমে অনেক বিখ্যাত আচার্য গ্রন্থাদি রচনা দ্বারা সাহিত্য হিসাবেও এই সম্প্রদায়কে শ্রীসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে। শ্রীসম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা নারায়ণ ও শ্রী, ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, নিম্বার্ক ও বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ ও রাধা।

রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুর নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হইলেও রামানন্দ মধ্য-ভারতে এই সকল দেবতার পরিবর্তে রাম সীতার উপাসনা প্রবর্তন করেন।

প্রাচীন বেদপন্থী ধর্মে শ্রুতিপাঠ এমন কি ইহার শ্রবণ করিতে পর্যন্ত স্ত্রীলোক ও শূদ্রদিগের অধিকার নাই—

ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩৮ সূত্র :—

"শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ"

"শূদ্রের (বেদ) শ্রবণ, অধ্যয়ন ও অর্থপরিজ্ঞানে নিষেধ আছে। শঙ্করাচার্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন স্মৃতিতে নির্দেশ আছে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে সীসা ও লাক্ষা দ্বারা তাহার কর্ণ পূর্ণ করিয়া রাখিবে, শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে, সে যদি বেদ অধ্যয়ন করে, তবে তাঁহার শরীর ছেদন করিবে। "শ্রবণ প্রতিষেধঃ স্তাবদথাস্য বেদ-মুপশৃণ্বত স্ত্রপূজ তুভ্যাং শ্রোত্রে প্রতিপূরণমিতি।......ভবতি চোচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো-ধারণে শরীর ভেদ ইতি।" বৈষ্ণবধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকল্পে শূদ্রকে নিজেদের সম্প্রদায় মধ্যে আশ্রয় প্রদান করে। রামানুজ সম্প্রদায় এ বিষয়ে অগ্রণী ছিল, কিন্তু রামানন্দ এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম ঘোষণা করেন তাহা ধর্মজগতের ইতিহাসে এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। দুর্বোধ্য সংস্কৃতের পরিবর্তে দেশের প্রচলিত ভাষায় তিনি নিজের মত প্রচার করেন এবং স্বয়ং উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোক হইতে শিষ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার মতাবলম্বীদের সকলেরই সর্ববিষয়ে সমান অধিকার। শিষ্যদিগের মধ্যে একজন (কবির) জাতিতে জোলাহা, একজন (রবিদাস) চামার, একজন (দাদূ) মুসলমান, একজন (সেনা) নাপিত, একজন স্ত্রীলোকও ছিল। তিনি ১৩ জন শিষ্যকে দীক্ষাপ্রদান করেন, স্ত্রীলোক শিষ্যা ভিন্ন আর সকলকে লইয়া ধর্মপ্রচারে বাহির হন। মধ্যভারতে, বিশেষভাবে রাজপুতানায় তিনি প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করেন। দেখা যায় তথায় কবির ও রবিদাসের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মারোয়ারের রাঠোর রাজ-বংশের এক প্রধান শাখা মেড়তা রাজ্যের অধিপতি তাঁহার অনুরক্ত ছিলেন। মহারাজা রাও সাহেবের পৌত্রী মীরাবাই কোন কোন ভজনে রবিদাসকে নিজের গুরু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মেবারের সিসোদীয় বংশীয় মহারাণা সংগ্রামসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বংশমর্যাদায় সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে মেবার ও মাড়োয়ারের সিসোদীয়া ও রাঠোর বংশ

আর সকলের উপরে। মীরা ইহার এক বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও অপর রাজপরিবারের যুবরাজের মহিষী ছিলেন। বংশ মর্যাদা ও রাজপরিবারের যত সব বিধি নিষেধ সমস্ত তুচ্ছ করিয়া তিনি তাঁহার মতাবলম্বী সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ মীরার জীবনকাহিনী ও ধর্মানুরাগ বড়ই বিস্ময়কর। রামানন্দ প্রবর্তিত সংস্কার, সমাজে যে কি প্রবল বিপর্যয় আনয়ন করিয়াছিল, মীরার জীবন তাহার দৃষ্টান্ত। কোন কোন আখ্যায়িকামতে চিতোরের রাণী ঝলী রবিদাসের মন্ত্র-শিষ্যা ছিলেন। গ্রন্থে সে সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রাম সীতার উপাসক দিগের মধ্যে মীরাবাইএর পরবর্তী কবি তুলসী দাস একজন প্রধান। দেখা যায় রামানন্দের বাণী, যাহা সকল শ্রেণীর লোকের জন্য ধর্মের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, তাহা সুদূর মহারাষ্ট্র দেশেও পঁহুছিয়া ছিল। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রভাব ছিল। এই সম্প্রদায়ে কেবল ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীর দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার। যাহারা অন্ত্যজ জাতি তাহাদের মাধ্ব সম্প্রদায়ের গুরুদেব প্রদত্ত ধর্মোপদেশ শ্রবণের পর্যন্ত অধিকার নাই। রামানন্দ যে মত প্রচার করেন তাহার প্রভাবে তথায় নামদেব ও তুকারাম নামক দুইজন শূদ্র বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয়। মাধ্ব সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের ন্যায় তাঁহাদের আরাধ্য দেবতা বিষ্ণু, কিন্তু তিনি বিঠোবা নামে পূজিত হন। তুকারাম একজন পরমভক্ত সহজ কবি ছিলেন। বিঠোবার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁহার স্তুতিগুলিকে অভঙ্গ বলে। কোন কোন অভঙ্গে তিনি বিঠোবাকে পাণ্ডুরাঙ্গ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মাধ্ব সম্প্রদায়ে যেমন বিষ্ণুর সহিত লক্ষ্মী আরাধ্যা, তুকারামের বিঠোবা দেবতার সঙ্গে তদ্রূপ রুক্মিণী পূজিতা হন। গ্রন্থে এই সকল ভক্তের প্রবর্তিত মত ও তাঁহাদের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলি সংযোজিত হইয়াছে।

চতুঃসম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্মের শেষসম্প্রদায় বল্লভাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৪৭৮ খ্রী° অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য রচনা করিয়া তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার বহু পূর্বে বিষ্ণু স্বামী কর্তৃক এই মত প্রবর্তিত হয়। বল্লভাচার্যের পিতা বিষ্ণু স্বামী প্রবর্তিত মতের বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ত্রৈলঙ্গদেশবাসী হইলেও তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় গোকুলে অতিবাহিত হয়। তাঁহার

মতে বৃন্দাবনের গোপাল কৃষ্ণের, এবং ব্রজগোপী ভাবে রাধার প্রাধান্য। তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের সমসাময়িক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে একাধিকবার সাক্ষাৎ হইয়া ছিল। উত্তরকালে চৈতন্যের অনুরক্ত ভক্তগণ যখন বৃন্দাবনে বসতি স্থাপন করেন, বল্লভাচার্যের পুত্র বিঠ্‌ঠলেশও তাঁহাদের সঙ্গে তথায় সময় সময় অবস্থিতি করিয়াছেন।

পরিশেষে মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব প্রচারিত ধর্মের যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের কোন ভাষ্য রচনা করিয়া তাহার উপর স্বীয় মত স্থাপন করেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে চতুঃসম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করা হয় না।

চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রী°অঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার তিনশত বৎসরেরও পূর্বে (১১৫৯ খ্রী° অব্দে) জয়দেব গীতগোবিন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। তদনন্তর চৈতন্যের আবির্ভাবের অনধিক এক শতাব্দীর মধ্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা অবলম্বন করিয়া রাগানুগমার্গের মধুর সাধনার উচ্চ আদর্শ তাঁহাদের রচিত পদাবলীর মধ্য দিয়া প্রচার করেন। এস্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কবিদের বর্ণিত এই আদর্শ মীরাবাইএর জীবনে মূর্ত হইয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। চৈতন্যদেব চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। স্বরূপ দামোদর কীর্তন করিয়া তাঁহাকে এই সব শুনাইতেন।

চৈতন্যের অনুরক্ত ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পরম অনুরাগী সর্বত্যাগী ভক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের রচয়িতা। তাহাতে বলা হইয়াছে যে চৈতন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভক্তদের মধ্যে অনেকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকিলেও কেহই তাঁহার তিরোধানের পর ব্রহ্মসূত্রের কোনভাষ্য রচনার প্রয়াস পান নাই। ভক্তপ্রধান শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন ভ্রাতৃযুগল চৈতন্যের নিকট ধর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব শাস্ত্র রচনা করেন। দাক্ষিণাত্যবাসী শ্রীগোপাল ভট্ট এই শাস্ত্রগুলিকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের অনুমোদন ক্রমে 'ভক্তিতত্ত্ব বিচার' শাস্ত্র লেখেন। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল ভক্তি শাস্ত্র। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন, এই ধর্মের

দার্শনিক তত্ত্বের দিক দিয়া তিনটি প্রধান বিষয়। শ্রীল রূপ—শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র আকৌমার সন্ন্যাসী শ্রীমজ্জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট রচিত মূলভক্তি শাস্ত্রের বিশদ আলোচনা ও বিচারক্রমে ষট্ সন্দর্ভ রচনা করেন। ইনি প্রথম চারিগ্রন্থ—"তত্ত্ব", "ভগবৎ", "পরমাত্ম ও "কৃষ্ণ" এই সন্দর্ভ চতুষ্টয়ে সম্বন্ধতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সম্বন্ধ বস্তু। এই সম্বন্ধ তত্ত্ব পূর্ণ-সনাতন-পরমানন্দ-লক্ষণ পরমতত্ত্ব। সম্বন্ধ পর্য্যায়ে এই পরম তত্ত্বের ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্ এই তিন প্রকারে আবির্ভাব হয় এবং ইহাদের মধ্যে ভগবদ্‌ভাবের আবির্ভাবই যে শ্রেষ্ঠ আবির্ভাব তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্ব কিরূপে এই সম্বন্ধতত্ত্বে পর্যবসিত হয়, ভক্তি সন্দর্ভে তাহার বিশদ বর্ণনা আছে।

গ্রন্থে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্বের যথাসম্ভব বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। শ্রীমজ্জীব গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত ধর্মমতের এই সকল নানাদিক হইতে বিশ্লেষণ ক্রমে সর্ব সংবাদিনী গ্রন্থে ইহাকে "অচিন্ত্য ভেদাভেদ" আখ্যা দিয়েছেন।

মহাপ্রভুর তিরোধানের পর তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত অনেক গোস্বামিপাদ বৃন্দাবনে স্থায়ীভাবে বাস করিতে থাকেন। তাহা হইতে তথায় বৈষ্ণব সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়। এই সঙ্ঘ কর্তৃক তথায় যে বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠে তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ইহার মূলে ছিল শ্রীলজীব গোস্বামীর কঠোর বৈরাগ্য, সর্বতোমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি নানাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ইহার সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। তাঁহার অবিরাম লেখনী হইতে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্বমূলক বৈষ্ণবদর্শন সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহার একনিষ্ঠ গৌরাঙ্গানুরক্তির ফল। তিনি কেবল গ্রন্থ রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। স্বয়ং শিষ্যদিগের সাহায্যে ইহাদিগের শত শত পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া গৌড় ও উড়িষ্যা প্রদেশে প্রচার করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ মতে চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা যদি নাও হয় তথাপি তিনি যে এই গ্রন্থের উপর গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার

নিকট শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম ভগবান ছিলেন, শ্রীরাধিকার মধ্যে তিনি রাগানুগা ভক্তির চরম আদর্শ দেখিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভগবৎ প্রীতির যে রসমাধুর্যের অনুভূতি, রাধার মধ্য দিয়া তাহারই প্রকাশ (১)। শ্রীমদ্বোপদেব 'মুক্তাফলে' শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ভগবৎ প্রীতির পূর্ণ বিকাশ এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"রসত্বমস্যাঃ শ্রীমচ্চৈতন্য দেবেন পূর্ণতামাপাদয়ৎ তেন চ শ্রীমদ্ ভাগবত প্রপূর্তিরুদৈৎ"।

প্রীতির রসত্ব শ্রীমচ্চৈতন্যদেব দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং তাঁহা দ্বারাই শ্রীমদ্ ভাগবতের পূর্ণতা প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ চৈতন্যের মধ্যে একাধারে রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের অবতরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া যে সকল গীতিকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রেমাস্পদ কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত রাধিকার প্রণয়লীলার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা মানবের সর্বপ্রকার সম্পর্কের মধ্যে রাগানুগা ভক্তি মার্গের তত্বগুলিকে অপূর্ব নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বহু সংখ্যক পদকর্তার গীতিকাব্য রচনা বাংলা ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, বংশীবদন, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস প্রধান। ইঁহাদের পদাবলীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীজাতির অন্তর্নিহিত ভাবধারা গঙ্গার স্রোত প্রবাহের ন্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, বাঙ্গালীর জীবনকে এমন সরস ও মধুর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা হইতে বাঙ্গালীর মধ্যে ভাব প্রবণতার এত প্রাবল্য। ভাবপ্রবণতা

(১) এখানে ডাঃ আর. জি. ভাণ্ডারকারের মন্তব্য দেখুন :—

Chaitanya promulgated the worship of the grown up Krishna, ever associated with Radha who was idealised into an image of pure love. The increasing ardency in the love and devotion of God saught for realistic expression, and the conception of Radha deepened and acquired an exclusive prominence and importance.—'Vaishnavism'.

অনেক সময় যে বিচারশক্তির সম্যক্ দৃষ্টির ব্যাঘাৎ ঘটায় তাহা অস্বীকার করা যায় না।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকট ভাগবত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র। কোন কোন স্থানে ইহাকে ভাগবত পুরাণ, আবার কোন কোন স্থানে ইহাকে সাত্বত সংহিতা বলা হইয়াছে। এই তিন দিক হইতেই এই গ্রন্থের সমালোচনা রহিয়াছে।

ভাগবত মতে জীব ও ব্রহ্মমধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি? শ্রীজীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিমতে ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ—বলদেব বিদ্যাভূষণ ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যে ভাগবত হইতে অনেক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ অস্বীকার না করিলেও দ্বৈতবাদের প্রতি তাঁহার অধিক ঝোঁক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাগবতের কোন কোন স্থানে এমন সব উক্তি রহিয়াছে যাহা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের পোষক। মূলগ্রন্থে ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন লীলা, বিশেষভাবে রাসলীলার তাৎপর্য কি, রাধাতত্ত্ব কি, গ্রন্থে তাহা অবধারণের প্রয়াস রহিয়াছে।

ভাগবত গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার প্রাধান্য। এখানে তিনি গোপাল কৃষ্ণ, সখাবা গোচারণের সঙ্গী। তাঁহার গোচারণ জীবন আভীর জাতির মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। আভীররা তখনও যাযাবর জীবন অতিক্রম করিয়া স্থায়ীভাবে একস্থানে বসতি ও কৃষিকার্যদ্বারা জীবিকা নির্বাহে অভ্যস্ত হয় নাই। বৈদিক যুগে আর্যদিগের যাযাবর জীবনের অনেক ব্যাপরের সঙ্গে বৃন্দাবন জীবনের অপূর্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার কয়েকটি উদাহরণ গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

বৈদিক সাহিত্যে রাগানুগা ভক্তি সাধনের কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা যদি আর্য সাধন ধারার কোন অঙ্গ না হয় তবে কিরূপে বৈষ্ণব ধর্মে ইহা এরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপ মন্তব্য গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে সুফি মতের সংক্ষেপ আলোচনা এবং তাহা হইতে তুলনামূলক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য বৈষ্ণব শাস্ত্রের পরম উপাসক পণ্ডিত ও ইহার রসতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সাধক অধ্যাপক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ. মহোদয় গ্রন্থ-পরিচয় লিখিয়া দিয়া আমাকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থখানিকে ভারতী মহাবিদ্যালয়ের ধর্মগ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত করায় ইহার কর্তৃপক্ষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমা, ১৩৪৯ — শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ রায়
পি. ২৫ লেক রোড, কলিকাতা

হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি

প্রথম খণ্ড

বৈষ্ণব ধর্ম

বিষয় সূচী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পৃঃ ১৪৮—১৮৪। গীতা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় যে ভাষা প্রচলিত ছিল, গীতার ভাষা তাহা হইতে স্বতন্ত্র। সংস্কৃত ভাষা রচনার চারিযুগ, ইহার মধ্যে প্রথম তিনযুগ বৈদিক ভাষা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ভাষার ২য় যুগ; গীতার ভাষা চতুর্থ যুগের ভাষা। ১৬০—১৬১ পৃঃ আর্যগণের দুই প্রধান শাখার এদেশে আগমন, তাহারা মনু ও নহুষের শাখা। ১৬৪ পৃঃ—১৬৮ পৃঃ মনুশাখা বিশেষভাবে যজ্ঞের পৃষ্ঠ পোষক। দুই শাখার মধ্যে বিরোধ, তাহার ফলে যুদ্ধ, তাহাতে নাহুষ শাখার তুর্বসু ও যাদবদিগের পরাজয়, তাহাদের দেশ হইতে বহিস্কৃত হওয়া, এবং পরিশেষে তাহাদের অন্যতম শাখা পুরুবংশীয়গণ কর্তৃক দেশে পুনরানয়ন। ১৬৮—১৭০ যজ্ঞমাহাত্ম্য—ঘোর ঋষির শিষ্য কৃষ্ণের প্রতি উপদেশ, সমগ্র মানব জীবনটাই যজ্ঞ। ইহার তাৎপর্য কি? ১৭০ পৃঃ—১৮১ পৃঃ—যজ্ঞের অপব্যবহার—ইহা হইতে আরণ্যকের যুগ প্রবর্তন অক্ষরতত্ত্ব, অক্ষর পুরুষ জীব ও জগতের অতীত এক অখণ্ড পরম বস্তু; সর্বগতত্ব, সর্বস্বিযামিত্ব ও সর্বাতীতত্ব এই তিন অবস্থা লইয়া তিনি অক্ষর পুরুষ। ১৮১—১৮৪ পৃঃ—গীতা ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ্—ইহা অক্ষরতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার সাধন শাস্ত্র।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা ১৮৫—২১৪। অধ্যায় সারসংগ্রহ। গীতার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়—১৮৫, চতুর্থ অধ্যায়—১৮৬, পঞ্চম অধ্যায়—১৮৭, ষষ্ঠ অধ্যায়—১৮৮, সপ্তম অধ্যায়—১৮৯, অষ্টম অধ্যায়—১৯০, নবম অধ্যায়—১৯১, দশম অধ্যায়—১৯৫, একাদশ অধ্যায়—১৯৫, দ্বাদশ অধ্যায়—১৯৬, ত্রয়োদশ অধ্যায়—১৯৮, চতুর্দ্দশ অধ্যায়—১৯৯, পঞ্চদশ অধ্যায়—২০০, ষোড়শ অধ্যায়—২০১, সপ্তদশ অধ্যায়—২০২, ব্রহ্মের ত্রিবিধ নির্দ্দেশজ্ঞাপক শ্রুতির বিভিন্ন মন্ত্র—২০৩, অষ্টাদশ অধ্যায়—২০৭, গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়ে বিভিন্ন মত—২১১।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা ২১৫—২২৫। গীতা। কর্ম্মতত্ত্ব—২১৬, কর্ম্মের পঞ্চবিধ হেতু—২১৮, কর্ম্মকুশলতা কি?—২১৯, উহা অর্জ্জনের উপায়—২২০, গুণকর্ম্মবিভাগ—২২৩, শরণাগতির বীজ যাহা ঋগ্বেদে আছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

২২৫—২৩৬ পৃঃ—আচার্যের উপদেশ সহকারে শাস্ত্রের নির্দেশ, কর্মতত্ত্ব অবগত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ২২৪—২২৭ পৃঃ—দৈবী ও আসুরী প্রকৃতি—ইহাদের লক্ষণ, আসুরীয় পরীক্ষার ও দৈবীর বৃদ্ধি সাধনের উপায় নিরূপণ ও তাহার পরীক্ষা ২২৮—২৩৬ পৃঃ

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পৃঃ ২৩৭—২৫১। অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শনএবং সংসারে পুনরাগমন

নিবৃত্তি সাধনার চরম লক্ষ্য। সেজন্য ধ্যানযোগের প্রয়োজন, চঞ্চল মনকে নিগ্রহ না করা পর্যন্ত তাহা সম্ভবপর হয় না—মনের চাঞ্চল্যের কারণ নির্ণয়, তাহা নিরোধের উপায়রূপ যোগসাধনার বর্ণনা—২৩৭ হইতে ২৪৭ পৃঃ, সাধনার উচ্চতম স্তর লাভের পরও পতনের ভয়, তাহার কারণ। ২৪৮--২৪৯পৃঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইতে পরাভক্তি সঞ্জাত হয়, পরোক্ষাবস্থায় সাধনায় যাহা নৈষ্কর্ম্য, জ্ঞান ও ভক্তি অপরোক্ষ ব্রহ্ম দর্শনের পর তাহা পরম নৈষ্কর্ম্য পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি হয়। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এই তিনের মিলনভূমি ২৪৯— ২৫১।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পৃঃ ২৫২ —২৭৬। গীতাশাস্ত্রে "মদ্গতচিত্ত", "মন্মনা", "শ্রদ্ধাবান্", "মদ্ভক্ত" ও "মদ্যাজি" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে, মদ্গতচিত্ত ও মন্মনা দ্বারা ঈশ্বর ভাবযুক্ত জ্ঞান, "শ্রদ্ধাবান্" "মদ্ভক্ত" দ্বারা ভক্তি এবং 'মদ্যাজি' দ্বারা কর্ম সূচনা করে। ইহারা ৩টি পন্থা—তাহার মূলতত্ত্ব কি? ২৫২—২৬৪ পৃঃ বাসুদেবতত্ত্ব ২৬৫ —২৬৬ পৃঃ অর্জুনকে বিকল্প প্রদর্শন বর্ণনান্তে ব্রহ্মের অন্তর্যামিত্ব ও ভগত্ত্ব এই উভয় তত্ত্বের সমাবেশনান্তে ১১ অঃ ৫৫ শ্লোকে গীতার সারোপদেশ বর্ণনা—২৬৭ পৃঃ হইতে ২৬৮ পৃঃ, সাধনার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি, সেজন্য চারিটি পন্থার নির্দেশ—২৬৯ পৃঃ হইতে ২৭৫ পৃঃ, বেদোক্ত ধর্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ গীতা শাস্ত্রে উভয় লক্ষণযুক্ত ধর্মের উপদেশ। ২৭৫ পৃঃ হইতে ২৭৬ পৃঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পৃঃ ২৭৭—২৯৮। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অপব্যবহার হইতে নৈতিক জীবনের অবনতি। ইহার প্রতিক্রিয়া হইতে প্রথম আরণ্যক ও উপনিষদ্ গ্রন্থগুলির সৃষ্টি। গীতার মধ্যেও এই প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশেষ ভাবে এই প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ অবৈদিক ধর্মগুলির উদ্ভব, যথা—বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম। ইহারা নীতিপ্রধান ধর্ম। গীতাতে যজ্ঞগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দুর্নীতির তীব্র প্রতিবাদ। যজ্ঞে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হইতে অহিংসামূলক বৈষ্ণব ধর্মের প্রথম সৃষ্টি। বৌদ্ধ ধর্মের দীর্ঘকাল অতুল প্রভাব, কুমারিল ভট্ট হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান। কিন্তু অহিংস ধর্মে অনুপ্রাণিত চিন্তাশীল মনীষীদিগের অন্তরে ইহা শান্তি আনয়ন করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের পারমার্থিক তত্ত্বমূলক নিরীশ্বরবাদের প্রতিকূলে বেদের জ্ঞান কাণ্ডের দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে অবলম্বন করতঃ বৈদিক ধর্মকে পুনর্জীবিত করিতে প্রয়াস—শঙ্করের দার্শনিক মত। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে মোক্ষ মূলর।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৯	বিকাসের	বিকাশের
১০	১১	অস্মাভিরেকং	অস্মাভিরেব
ঐ	১২	অভিপ্রায়ন্তি	অভিপ্রাপয়ন্তি
ঐ	১৫	গোপয়িতা	গোপায়িতা
ঐ	১৫	প্রবেশয়ন্তি	প্রবেশয়তি
১২	৬	তনুং	তনূং
ঐ	১৫	সম্রে	সম্রে
১২	২১	বিমসে	বিমমে
১৩	১২	নিদন্তে	নিধত্তে
ঐ	১৩	পৃথিব্যাঃ	পৃথিব্যাম্
১৫	২৪	ঋত্তিক্	ঋত্বিক্
১৩	৭	১৩০০	১৫০০
৪০	২৬	পুলস্ত	পুলস্ত্য
৫২	২০	দুর্গেয়	দুর্জ্জের
৫৪	৩	উপচর	উপরিচর
৭৫	৪	সুখ	মুখ
ঐ	২৫	পাত্রেন	পাত্রেণ
ঐ	ঐ	সত্যাপহিতং	সত্যস্যাপিহিতং
		রশ্মিন্	রশ্মীন্
৭৮	২৩	বার্ত্তিকা	বার্ত্তিক
ঐ	২৫	আভ্যন্তরিন্	আভ্যন্তরীণ
৮০	১০	ম্যাক্‌গনেল	ম্যাকডোনেল
ঐ	১৩	আপস্তম্ভ	আপস্তম্ব
৮১	২১	নির্ণিত	নির্ণীত
৮২	১১	নিঘন্থ	নির্গ্রন্থ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪	১১	বুণ্‌	বুন্‌
৮৯	১	বহ্ণি	বহ্নি
৯৪	১০	নৃনাং	নৃণাং
ঐ	১১	২৯ অঃ	১০ স্ক ২৯ অঃ
৯৫	২২	নভ	নভঃ
৯৭	১২	পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছিন্ন
১০০	৯	রেক্ষা	রেখা
১০৭	৬	তোষণি	তোষণী
ঐ	১১	নিবৃত্তি	নিবৃত্তিঃ
১০৯	১১	বিষয়ভূত	বিষয়ীভূত
১১৫	৪	মহত্বাৎ	মহত্ত্বাৎ
		বৃহত্তাচ	বৃহত্ত্বাচ্চ
১১৭	২৫	যদপাশ	যদপাঙ্গ
১২৯	১	অবভৃত	অবভৃথ
১৩১	১৫	সাবকাশ	অবকাশ
১৩৫	১	নিঃসৃত	নিঃশরণ
ঐ	২৪	বিপুলা	বিদুলা
১৪০	৯	উদ্‌গাথা	উদ্‌গাতা
		অধ্ব্যর্যু	অধ্বর্যু
১৪১	২	তৎ	delete
ঐ	১৭	শাস্ত্র	শস্ত্র
১৪৩	৪	সঞ্জীবিত	সঞ্জীবিত
ঐ	২৫	অচ্যুত	অচ্যুত
১৪৪	৫	অবভৃত	অবভৃথ
ঐ	১৯	জ্যোতিষ্পশ্যংতি	জ্যোতিষ্পশ্যং তি
ঐ	২২	তমস্পরি	তমসস্পরি
		জ্যোতিষ্পশ্যংত	জ্যোতিষ্পশ্যংত
		জ্যোতিরুত্তমম	জ্যোতিরুত্তম

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৬	৫	অচ্যুতং	অচ্যুতং
১৫৫	১	মধ্যবর্ত্তীতায়	মধ্যবর্ত্তিতায়
১৫৬	২০	বুণ	বুন্
১৫৬	৫	বার্ত্তিকা	বার্ত্তিক
১৫৭	১	ভাগবত	ভগবত
১৬০	৭	মাণ্ডুক্য	মাণ্ডূক্য
ঐ	১৫	বার্ত্তিকা	বার্ত্তিক
ঐ	১৫	বার্ত্তিকার	বার্ত্তিকের
১৬১	৭	বার্ত্তিকার	বার্ত্তিকের
১৬৪	৭	নারায়ণী	নারায়ণীয়
১৬৯	১৭	প্রাচীন পন্থীগণ	প্রাচীন পন্থিগণ
১৭১	৪	বলিতেছেন	বলিয়াছিলেন
১৮২	৩	মনিষী	মনীষী
১৮৩	২৩	নিশ্বসিত	নিঃশ্বসিত
ঐ	২৪	ইতিহাস	ইতিহাসঃ
ঐ	২৫	নাস্তস্যোবেতানি	ন্যাস্তস্যৈবেতানি
১৮৬	১২	বর্ত্তানুবর্ত্তন্তে	বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে
১৮৭	১১	তদ্ তদ্	তত্তৎ
১৯২	৭	মহাস্তং	মহান্তং
ঐ	৮	সঙ্কীর্ণীত	সঙ্কর্ণীত
১৯৬	২৩	আয়ত্বাধীন	আয়ত্তাধীন
ঐ	২৬	বিশ্বতস্পাৎ	বিশ্বতস্পাৎ
ঐ	২৭	এক	একঃ
১৯৯	২৩	দদাম্যহং	দধাম্যহং
২০০	১৮	বিষয়াশক্তি	বিষয়াসক্তি
ঐ	২২	অনাশক্তি	অনাসক্তি
২০৩	২০	ওঙ্কারমেব	ওঙ্কার এব
ঐ	২৪	যদোঙ্কার	যদোঙ্কারঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৪	৪	ওমিদীদং	ওমিতীদং
২০৬	১৮	ভূবনে	ভুবনে
ঐ	২১	মন্ত্রেন	মন্ত্রেণ
ঐ	২৩	মিলাঃ	খিলাঃ
ঐ	২৪	স্ম্যর্ণসংশয়	স্ম্যর্নসংশয়ঃ
ঐ	২৫	কিমনৈর্বহুভির্ম্মন্ত্রেঃ	কিমন্যৈবহুভির্ম্মন্ত্রেঃ
২১৩	৩	কল্যান	কল্যাণ
ঐ	৬	সগ্রহ	সংগ্রহ
ঐ	৮	প্রয়োজনিয়তা	প্রয়োজনীয়তা
২১৫	১২	স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভূ
২২৪	১০	এই দেহী	বায়ুর ব্যাপার সর্বান্তরাত্মা যিনি বুদ্ধির দ্রষ্টা
২২৬	১	প্রণিপাৎ	প্রণিপাত
২২৭	৭	প্রবচনে	প্রবচনেন
২২৮	২৭	গর্ব করা	গর্ব না করা
২৩১	৭	ভ্রুণ	ভ্রূণ
২৩৪	৯	নিরোপিত	নিরূপিত
২৩৬	৪	হস্তি	হস্তী
২৩৯	৮	৪০	২০
২৪৩	২০	ঋগি	ঋষি
২৪৬	২০	নৈষ্কর্ম্ম	নৈষ্কর্ম্ম্য
২৬২	১৬	ভাবক	ভাসক
২৭২	৫	আকাঙ্খ	আকাঙ্ক্ষা

হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি

প্রথম খণ্ড

বৈষ্ণব ধর্ম্ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণতত্ত্ব।

হিন্দুধর্ম্মের প্রধান তিন দেবতার অন্যতম দেবতা বিষ্ণুর উপাসকগণ বৈষ্ণব নামে কথিত হন। তাঁহাদের মতে স্বর্গের পক্ষী গরুড় বিষ্ণুর বাহন। বৈষ্ণবধর্ম্মে শরণাগতি বা শরণাপত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রের মধ্যে এই উভয় তত্ত্বেরই মূলের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সুক্তটি নানাকারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সূক্তে মন্ত্রসংখ্যা ৫২। এই কয়টি মন্ত্রের মধ্যে যে ভাবে সেই প্রাচীন যুগে আর্য্য ঋষিদিগের সর্বতোমুখী প্রতিভা ও জ্ঞানবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। সূক্তের আর একটি বৈশিষ্ট্য মন্ত্রগুলি এমন ভাবে রচিত যে, ইহারা প্রত্যেকটিই এক একটি রহস্যময় হেঁয়ালিবিশেষ (riddle), অধিকাংশ মন্ত্র একাধিক অর্থ বহন করে। নিরুক্তে আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক

যৌগিক যাজ্ঞিক, মান্ত্রিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি অবস্থা ভেদে একই মন্ত্রের বিভিন্ন অর্থের উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সূক্তের প্রথম ঋকৃটির উল্লেখ করা যাইতেছে—

অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতা মধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ।
তৃতীয়ো ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠো অস্যাত্রাপশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রম্‌॥

মন্ত্রের ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কৃত সহজ সরল অনুবাদ ঃ—

"সকলের সেবনীয় জগৎপালক হোতার মধ্যমভ্রাতা সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। উহার তৃতীয়ভ্রাতা আহুতি ধারণ করেন, ভ্রাতৃগণের মধ্যে সপ্তপুত্র বিশ্‌পতিকে (আদিত্যকে) দেখিলাম।"

কথাগুলি সব হেঁয়ালিময়। মন্ত্রের দেবতা আদিত্য। এই আদিত্য দেবতা স্বয়ং ও হেঁয়ালিবিশেষ। ইহা কখন সূর্য্যের স্থূলপিণ্ডকে নির্দ্দেশ করে, কখন এই পিণ্ডের উদ্ভাসক জ্যোতির্ম্ময় শক্তির উদ্দেশ্যে প্রযোজ্য হয়, কখন ও বা এতদুভয়ের অতীত এক অতীন্দ্রিয় নিগূঢ় বাচ্যশক্তিকে নির্দ্দেশ করে। এস্থলে এই মন্ত্রটির মধ্যে আদিত্যের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইরূপের সন্ধান রহিয়াছে।

আধিভৌতিক অর্থ ঃ—

সকলের সেবনীয় জগৎপালক আদিত্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত মধ্যমভ্রাতা অর্থাৎ বায়ু, তৃতীয়ভ্রাতা অর্থাৎ অগ্নি, ও তাহাদিগের মধ্যে সপ্তপুত্র বিশিষ্ট বিশ্‌পতিকে অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের পালনকর্ত্তাকে দেখিলাম"—

ইহা দ্বারা বাহ্যপ্রকৃতির নিয়ামক আদিত্যের জ্যোতির্ম্ময় স্থূলপিণ্ডকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক অর্থে মন্ত্রের সায়নকৃত ব্যাখ্যা ঃ—

বামস্য, বিশ্বস্যোদ্‌গরিতুঃ স্রষ্টুরিত্যর্থঃ, পলিতস্য পালয়িতুঃ হোতুরাদাতুঃ স্বস্মিন্‌ সংহর্ত্তুঃ।

মধ্যমভ্রাতা পরমেশ্বরস্য ভ্রাতা তদংশভূত সূত্রাত্মা, তৃতীয়ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠঃ ঘৃতমিত্যুদকম্ তেন তৎকার্য্যশরীরম্।

সপ্তপুত্রাঃ সপ্তলোকাঃ পুত্রাযস্য তাদৃশং স্বমায়য়াসৃষ্ট সর্বলোক-মিত্যর্থঃ। এখানে বাম শব্দ দ্বারা যিনি নিমিত্ত ও উপাদান-কারণস্বরূপ হইয়া এই দৃশ্য প্রপঞ্চকে উদ্‌গীরণ অর্থাৎ প্রকাশ করেন তাঁহাকে বুঝাইতেছে। পলিত শব্দ দ্বারা তাঁহার পালনী-শক্তি বুঝাইতেছে। হোতা দ্বারা তাঁহার সংহার শক্তিকে নির্দ্দেশ করে।

মধ্যমভ্রাতা অস্ত্যশ্নঃ ও তৃতীয়ভ্রাতা ঘৃতপৃষ্ঠ এই দুই বিশেষণ দ্বারা সেই সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়কর্ত্তার কার্য্যে ভ্রাতার ন্যায় সহায়ক সর্বব্যাপী সূত্রাত্মা অর্থাৎ বায়ুবৎ সূক্ষ্ম শরীরধারী হিরণ্যগর্ভাবস্থাকে বুঝায়; যাহা ব্যাষ্টিরূপে "অশ্ন" বা ভোক্তা এবং সমষ্টি অর্থাৎ বিরাট দেহরূপে ঘৃতপৃষ্ঠ অর্থাৎ দর্শন স্পর্শনাদির বিষয় পাঞ্চভৌতিক স্থূলদেহরূপে প্রকাশিত রহিয়াছেন। সপ্তপুত্র ভূরাদি সপ্তলোক।

মন্ত্রের আধ্যাত্মিক অর্থ :—

যাঁহা হইতে জগতের সৃষ্টি, যিনি ইহাকে ধারণ করেন, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে পুনরায় এই জগৎ সংহৃত হয়, সেই পরমেশ্বরের অংশ সূত্রাত্মা, যাহা ব্যষ্টিরূপে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়াতীতভাবে সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং যাহার মায়া হইতে এই স্থূল বিরাটদেহরূপ জগৎপ্রপঞ্চের প্রকাশ, তাহাদিগের মধ্যে সেই মায়াধীশ পরমেশ্বরকে আমি দেখিলাম।

এই সূক্তে জগৎসৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক সূক্ষ্মতত্ত্ব রহিয়াছে। ঋষি জ্ঞানদৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্য সম্বন্ধে যে সকল মর্ম্ম অবগত হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা হইতে তাহার যে অপূর্ব সমর্থন পাওয়া যাইতেছে, "ওঙ্কার ও গায়ত্রী তত্ত্ব" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট ছন্দতত্ত্বে তাহার বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শনে সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে গিয়া যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার অন্যতম যুক্তি এই যে, বেদে ইহার সমর্থন নাই—

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই সূক্তের ৩৬ ঋকে সাংখ্যতত্ত্বাবলিরও ইঙ্গিত রহিয়াছে। মন্ত্রের বঙ্গানুবাদ—

"(আদিত্যের) সপ্তরশ্মি অর্দ্ধবৎসর গর্ভধারণ করিয়া এবং ভুবনে রেতঃস্বরূপ হইয়া বিষ্ণুর কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহারা বিপশ্চিৎ ও পরিভূ অর্থাৎ সর্বদর্শী ও সর্বব্যাপী, এবং প্রজ্ঞাদ্বারা মনে মনে সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।"

এখানে অর্দ্ধবৎসর গর্ভধারণ করার অর্থ বৃষ্টি উৎপাদনশীল বাষ্পরাশিকে সূর্য্যরশ্মিতে অর্দ্ধবৎসর কাল ধারণ করিয়া রাখা।

ভুবনের রেতঃস্বরূপ হওয়ার তাৎপর্য্য বৃষ্টি প্রদান দ্বারা জগতের সারভূত হওয়া। বিষ্ণু আদিত্যের অপর নাম।

ইহা মন্ত্রের আধিভৌতিক অর্থ। ইহারা যে সাংখ্যতত্ত্বাবলিকেও নির্দ্দেশ করে সায়নাচার্য্য তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন (১)। তবে

(১) মূল ঋক্

"সপ্তার্দ্ধগর্ভা ভুবনস্য রেতো বিষ্ণোস্তিষ্ঠংতি প্রদিশা বিধর্ম্মণি।

তে ধীতিভির্মনসা তে বিপশ্চিতঃ পরিভুবঃ পরি ভবন্তি বিশ্বতঃ॥

মন্ত্রের প্রথম পদের সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা :—

সপ্তার্দ্ধগর্ভা—সপ্তমহদহঙ্কারৌ পঞ্চতন্মাত্রানীতি মিলিত্বা সপ্তসংখ্যকানি তত্ত্বানি অর্দ্ধগর্ভাঃ অবিকৃতিরূপাঃ বিকারাশ্রয়ায়াঃ মূলপ্রকৃতেঃ প্রকৃতি বিকৃতেরুদাসীনস্যাত্মনশ্চোৎপন্নত্বাদর্দ্ধাংশেন প্রপঞ্চাকারেণ পরিণামর্দ্ধগর্ভাঃ। মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্রা (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এই সাতটি অবিকারীতত্ত্ব সপ্তার্দ্ধগর্ভা। এইগুলিই ষোড়শ বিকার অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত ও মনঃ এই সকলের সহযোগে এই জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

এই সূক্তের আর একটি মন্ত্রে প্রকৃতিতে পুরুষের অধ্যাসের কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা অষ্টম ঋক্। মন্ত্রের অনুবাদ,—মাতা অর্থাৎ

এ কথাও বলা প্রয়োজন ইহাতে সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদের সমর্থন হয় না।

সূক্তের রচয়িতা ঋষি দীর্ঘতমা যে ঋগ্বেদীয় যুগের শেষ অর্দ্ধের প্রথমভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয়।

আর্য্যগণ এদেশে আগমনের পর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত দেশের আদিম অধিবাসী অনার্য্যদিগের সংস্পর্শ হইতে আপনাদের সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা প্রথমাবস্থায় এই সকল প্রাচীন অধিবাসীদিগকে মনুষ্য বলিয়াই গণ্য করিতেন না, এবং সুবিধা পাইলে তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ করিতেন না, এমন কি তাহাদিগের মধ্যে কেহ কোনরূপে অনার্য্যদিগের সংস্পর্শে আসিলে তাহার প্রতিও কোনরূপ ক্ষমা ছিল না। ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে আর্য্যদিগের এরূপ আচরণের বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কালসহকারে

পৃথিবী বৃষ্টির জন্য পিতাকে কর্ম্মদ্বারা ভজনা করেন। পিতা কিন্তু ইহার পূর্বেই মনে মনে উঁহার সহিত সংগত হইয়াছেন। মাতা গর্ভধারণেচ্ছায় গর্ভরসে নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং বিবিধ শস্য উৎপাদন জন্য পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন।

ইহাতে পুরুষের প্রকৃতির সান্নিধ্য এবং প্রকৃতিতে তাহার অধ্যাস যাহা হইতে প্রকৃতির সাম্যাবস্থার ব্যতিক্রম ঘটে এবং যাহার ফলে এই জগৎপ্রপঞ্চের উদ্ভব, মন্ত্র মধ্যে এই তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

সাংখ্য দর্শনের ১ম অঃ ৬১ সূ—

"সত্ত্বরজস্তমসাংসাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারোঽহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি"।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। প্রকৃতির পরিণাম মহান্ মহতের পরিণাম অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্রা মন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উপজাত হয়, পঞ্চ তন্মাত্রা হইতে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয়।

পরস্পরের মধ্যে আত্মবিরোধবশতঃ তাহাদিগকে এমন এক অবস্থার সম্মুখীন্ হইতে হইয়াছিল যে, আর্য্যগণ কোন বিশিষ্ট অনার্য্যদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিতে বাধ্য হন। (১)

ইহার পর হইতে প্রাচীন অধিবাসী ও আর্য্যদিগের মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে থাকে। ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাব দূর হইয়া সখ্যভাব স্থাপিত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহাদির অবসান হইয়া দেশময় শান্তি স্থাপিত হয়। এইরূপ আবেষ্টনের মধ্যে ঋষি দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয়, কারণ তাঁহার সময় আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে যে অবাধ সংস্রব চলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহারই ঔরষে উশিজ নামক এক অনার্য্য রমণীর গর্ভে কক্ষীবানের জন্ম হয়। এবং দেখা যায় কক্ষীবান্ কোনরূপ দ্বিধা ব্যতিরেকে আর্য্যদিগের গণ্ডীর মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা অনার্য্য বলিয়া কেহ তাঁহাকে কোনরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখে নাই, পক্ষান্তরে অসাধারণ প্রতিভা ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানবলে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ঋষির আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদের নানা স্থানে তাঁহার মহিমার বর্ণনা আছে, এমন কি দেখা যায় তাঁহার পরবর্ত্তী কালের বামদেব নামক কোন ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, তিনি যেন কক্ষীবান্ সদৃশ হইতে পারেন।

দেখা যায় দেশের এই শান্তিপূর্ণ অবস্থার আবেষ্টনের মধ্যে বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু ক্রমশঃ অধিকতর প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। যাযাবর জীবনে আর্য্যদিগকে নিয়ত আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক নানারূপ শঙ্কটাপন্ন অবস্থার মধ্যে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে হইত। সে সময় তাহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা ছিলেন রুদ্র। তাঁহার নিকট প্রার্থনা "মা মা হিংসীঃ"

(১) এ সম্বন্ধে ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব গ্রন্থের ২নং পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য

রুদ্রের প্রসন্নতা লাভের জন্য আকুল প্রার্থনা যেমন "রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্"। তদনন্তর যখন তাঁহারা সপ্তসিন্ধু প্রদেশে (পাঞ্জাবে) স্থায়ী বসতি স্থাপনপূর্বক কৃষি-কার্য্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন বৃষ্টির জন্য অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ প্রয়োজন হইল, তিনি হইলেন ইন্দ্র। ক্রমে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়া অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহেও তিনি আর্য্যদিগের প্রধান সহায় হইলেন। অনার্য্যগণ সহজে আর্য্যদিগের নিকট বশ্যতা স্বীকার করে নাই। ঋগ্বেদ হইতে দেখা যায়, পরস্পরের সহিত এই সকল দ্বন্দ্ব দীর্ঘকাল চলিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের আধিপত্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফলতঃ ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তুতিবন্দনামূলক সূক্ত সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহাদের অধিকাংশের বিষয় শত্রুনিপাতসাধনে তাঁহার সাহায্য-প্রার্থনামূলক। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্বপ্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আর্য্যগণ যখন জীবনে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ প্রতিষ্ঠানভূমিতে অবস্থিতি লাভ করিলেন, তখন আধ্যাত্মিক জীবনের জটিল প্রশ্নগুলি তাঁহাদের মনে উদিত হইতে লাগিল। ঋষি দীর্ঘতমার রচিত মন্ত্রগুলির মধ্যে আমরা এইরূপ অনেক প্রশ্ন ও ইহাদিগের সমাধান দেখিতে পাই।

সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে বলা হইয়াছে,—

"প্রথম জায়মানকে কে দেখিয়াছে? যখন অস্থিরহিতা অস্থিযুক্তকে ধারণ করিল, ভূমি হইতে প্রাণ ও শোণিতের সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মা কোথা হইতে? কে বিদ্বানের নিকট এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে যায়?

পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলা হইয়াছে—"আমি পাক্ অর্থাৎ অপক্কবুদ্ধি, মনে কিছু বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সকল সন্দেহপদ দেবতাগণের নিকটও নিগূঢ় (দেবানামেনা নিহিতা পদানি)।

৬ষ্ঠ মন্ত্র—

"আমি অজ্ঞান কিছু না জানিয়া মেধাবিগণের নিকট জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি সেই এক, যিনি জন্মরহিতরূপে স্থিতিকরেন। (অজস্যরূপে কিমপিস্বিদেকম্)।

এই তিনটি মন্ত্রে যথাক্রমে "প্রথম জায়মান" "দেবানামেনা নিহিতা পদানি" (দেবতাগণের নিকটও নিগূঢ়) এবং "অজস্যরূপে" (জন্মরহিতরূপে) এই তিনটি শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহারা সকলেই এক আদিত্যের স্তুতি বন্দনায় প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু এক আদিত্যের চিন্তন হইতে ঋষির অন্তরে যে জগৎস্রষ্টা এক দেবতার চিন্তন উদিত হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

চতুর্থ মন্ত্রে অস্থিরহিতা শব্দ প্রয়োগ দ্বারা অব্যক্তা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। তাহার অস্থিযুক্তকে ধারণ করিবার মর্ম্ম,—প্রকৃতি হইতে জগতের উদ্ভব। ইহাতে সাংখ্যতত্ত্বাবলির ইঙ্গিত থাকিলেও আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ঋষি বলিতেছেন, সৃষ্টি ব্যাপাররূপ জটিল সমস্যার সমাধান এত সহজে হয় না। তাঁহার এই মত দৃঢ় করিবার জন্য পরবর্ত্তী মন্ত্রে বলিতেছেন, দেবতারাও ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত নহেন, "দেবানামেনা নিহিতা পদানি—এনা এনানি পদানি সন্দেহাস্পদানি তত্ত্বানি দেবানাং নিহিতা-দেবানামপি গূঢ়ানীত্যর্থ ইতি—সায়নঃ।

৬ষ্ঠ মন্ত্রের "সেই এক যিনি জন্মরহিতরূপে নিবাস করেন," ইহা দ্বারা ঋষি সৃষ্টির মূলে যে এক শক্তির সন্ধান পাইয়াছেন, তাহা বুঝা যাইতেছে। এই তত্ত্বটিকে আরো পরিষ্কার ভাষায় তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এই সূক্তেরই ৪৬ মন্ত্রে—

ইংদ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদংত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

যিনি এই আদিত্য তিনি এক, মেধাবিগণ ইঁহাকে ইন্দ্র মিত্র বরুণ অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইঁনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল। ইঁনি এক হইলেও ইঁহাকে বিপ্রগণ বহু বলিয়া বর্ণনা করেন। ইঁহাকে অগ্নি যম ও মাতরিশ্বা বলেন।

এখানে আমরা দেখিতেছি আদিত্যের চিন্তন হইতে ঋষি এক পরমেশ্বরের সন্ধান পাইয়াছেন। বিভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও তিনি মূলে যে এক দেবতা, ঋষির মনে তাহার পরিষ্কার উপলব্ধি হইয়াছে।

এই সূক্তের ২০ ও ২১ ঋক্‌ও বিশেষ অনুধাবনার বিষয়—

মন্ত্র দুইটী—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
যত্র সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভিস্বরংতি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ স মা ধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ॥

প্রথম মন্ত্রটি মণ্ডুক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত হইয়াছে। উভয় উপনিষদেই "দ্বা সুপর্ণা" দুইটি শোভন পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মন্ত্রের অর্থ,—দুইটী শোভন পক্ষবিশিষ্ট পক্ষী সর্বদা সংযুক্ত, সমপ্রাণ এবং একই বৃক্ষে বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে একটী স্বাদু পিপ্পল ফল ভোজন করে, অপরটি খায় না, শুধু দেখে—

পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণেও এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আছে। তথায় সুপর্ণদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া গৃহীত হয় নাই।

এই ঋকের পূর্ববর্ত্তী ঋক্ চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল বিষয়ক। তাহার পূর্ববর্ত্তী ঋক্‌টী সূর্য্য ও অগ্নি বিষয়ক। বস্তুতঃ এই মন্ত্রের পূর্ব বা পরবর্ত্তী কোন মন্ত্রেই জীবাত্মা পরমাত্মার উল্লেখ দেখা যায় না। সে যাহাই হউক উপনিষদগুলিতে ইহাদিগকে জীবাত্মা পরমাত্মা-

রূপেই গ্রহণ করা হইয়াছে এবং ইহার উপর বিশেষভাবে বৈষ্ণব দর্শনগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী মন্ত্রটি এক বিশেষ রহস্যপূর্ণ। সায়নাচার্য্য ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ—

যে (আদিত্যমণ্ডলে) সুন্দর গতি ((রশ্মিসকল) কর্ত্তব্যবোধে অমৃতের অংশ গ্রহণ করিয়া অনবরত গমন করে, তথায় যিনি ধীরভাবে সমস্ত ভুবনের রক্ষা করেন, আমি অপক্কবুদ্ধি হইলেও তথায় তিনি আমাকে স্থাপন করিলেন।

সায়নের ব্যাখ্যা ঃ—যত্র আদিত্যমণ্ডলে সুপর্ণা শোভনগমনা রশ্ময়ঃ অমৃতস্যোদকস্য ভাগং ভজনীয়মংশং আদায় অনিমেষং অনবরতং বিদথা বেদনেন জ্ঞানেন অস্মাভিরেবা কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা অভিস্বরন্তি অভিপ্রায়ন্তি। যশ্চ বিশ্বস্য ভূতজাতস্য ইনঃ স্বামী তথা তস্যৈব গোপাঃ গোপায়িতা রক্ষিতা অয়ং আদিত্যঃ স পরমেশ্বরঃ ধীরো ধীমান্ প্রাপ্যানুগ্রহ বুদ্ধিযুক্তঃ সন্ মা মাং পাকং অপক্কপ্রজ্ঞং অত্রাস্মিন্ স্বকীয়মণ্ডলে আবিবেশ প্রবেশয়তি।

ঋষি নিজকে অপক্কপ্রজ্ঞ বলিতেছেন, তথাপি আদিত্য অর্থাৎ পরমেশ্বর তাঁহাকে স্বীয় মণ্ডলে স্থান দিয়াছেন, তাঁহার নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ভগবদ্-জ্ঞান যে ঈশ্বরানুগ্রহ-সাপেক্ষ এবং তিনি যে অকিঞ্চননাথ তাহা প্রকাশ পাইতেছে। অধ্যাত্মরাজ্যে নানা দেবতার মধ্য দিয়া এক দেবতার সন্ধানলাভ, এবং তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার অনুগ্রহ যে বিশেষ প্রয়োজন মন্ত্রগুলিতে তাহা ব্যক্ত করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি মন্ত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭১ সূক্তের চতুর্থ ঋক্। সূক্তের দেবতা বৃহস্পতি, ঋষি জ্ঞান।

মন্ত্রটির অর্থ ঃ—

“কেহ কেহ কথা দেখিয়াও দেখে না কথা শুনিয়াও শুনে না।

যেমন সুন্দর পরিচ্ছদবিভূষিতা প্রেমোৎফুল্লা রমণী আপন স্বামীর নিকট নিজকে প্রকাশিত করেন, (১) তদ্রূপ বাগ্‌দেবী কাহারও কাহারও নিকট প্রকাশিতা হন। এই মন্ত্রটিকে অনুসরণ করিয়া কঠশ্রুতি বলিতেছেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥

এখানে বলা হইল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ তাঁহার কৃপা সাপেক্ষ, সুধু শাস্ত্রালোচনা ও জ্ঞান বিচার হইতে তাহা হয় না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনার্থীর পক্ষে শাস্ত্রালোচনা জ্ঞানবিজ্ঞান ধ্যানধারণাদিমূলক পুরুষকারও যে প্রয়োজন এই শ্রুতি তাহাও জ্ঞাপন করিতেছেন, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এই উক্তি দ্বারা; তথাপি সকলের উপরে ভগবৎ কৃপা। বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে শরণাগত্যভাব বেদের এই মন্ত্রগুলিতে তাহা পরিস্ফুট রহিয়াছে।

(১) উত ত্বঃ পশ্যন্ন দদর্শ বাচমুত ত্বঃ শৃণ্বন্ন শৃণোত্যেনাম্‌।
উতো ত্বস্মৈ তন্বংবি সস্রে জায়েব পত্য উশতী সুবাসাঃ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণ-তত্ত্ব।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪ সূক্ত ঋষি দীর্ঘতমার রচনা। সূক্তের দেবতা বিষ্ণু, কিন্তু ইহাও আদিত্যের অপর নাম। (১)

সূক্তের প্রথম মন্ত্র—

"আমি বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন, তিনি উপরিস্থ জগৎ স্তম্ভিত করিয়াছেন [ধারণ করিয়া স্থির রাখিয়াছেন,] তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন (২)।

এই বিষ্ণু কর্ত্তৃক তিনবার পদক্ষেপের উল্লেখ অপর এক ঋষি (মেধাতিথি) রচিত প্রথম মণ্ডলের ২২ সূক্তেও রহিয়াছে। বস্তুতঃ সমগ্র ঋগ্বেদে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত সূত্র সংখ্যা মাত্র কয়েকটি। ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে রচিত সংখ্যা ২৫০এর উপর। সংখ্যা হিসাবে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত সূক্তসংখ্যা গণনার মধ্যেই আসে না। ইহারাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা প্রথম মণ্ডলের অন্তর্গত। কিন্তু তাহা হইলেও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে রচিত স্তুতিমন্ত্রগুলি তাঁহার অপ্রতিহত বীর্য্যবত্তা জ্ঞাপন করে।

(১) ঋগ্বেদে কোন কোন স্থানে মাত্র ছয়জন আদিত্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ২-২৭-১, ইহারা মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ, অংশ। ৪-৫৫-১০ ঋকেও ছয়জন আদিত্য, তাঁহারা সবিতা, ভগ, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ইন্দ্র। ১০-১১-২ ঋকে আদিত্যের সংখ্যা সাত, এখানে ইন্দ্রকে সপ্তম আদিত্য বলা হইয়াছে। ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া বৎসরের দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ রাশির অধিপতি দ্বাদশ আদিত্য হইয়াছিল।

(২) বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্র বোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণ স্ত্রেধোরুগায়॥

এই সূক্তের ষোড়শ ও সপ্তদশ মন্ত্র—

“বিষ্ণু সপ্ত কিরণ বিস্তার করতঃ যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন”—

“বিষ্ণু এই জগৎ পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত পদক্ষেপে জগত আবৃত হইয়াছিল” (৩)।

যাস্ক বিষ্ণুর এই তিনবার পদক্ষেপের অর্থ করিয়াছেন,—

যাহা কিছু নিয়ে এই জগৎ সমস্তই বিষ্ণু পরিক্রম করিয়াছেন, সর্বত্র তিনি ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহার তিনবার পদক্ষেপ দ্বারা তিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ তিন লোক অতিক্রম করিয়াছেন বুঝায়।

“যদিদং কিঞ্চিৎ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রিধা নিধত্তে পদং ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি।”

দুর্গাচার্য্যকৃত টীকা—

বিষ্ণুরাদিত্যঃ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি—অর্থ পার্থিবোঽগ্নিঃ ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিদস্তি তৎ বিক্রমতে, তদধিষ্ঠিতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনেঽন্তরিক্ষে। গয়শিরস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণনাব আচার্য্যো মন্যতে।

যাস্ক বিষ্ণু অর্থ আদিত্য করিয়াছেন। এই বিষ্ণু পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং আকাশে সূর্য্যরূপে সমুদয় ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। নিঘণ্টকার ঔর্ণনাভ বলেন, সূর্য্যের

(৩) অতো দেবা অবংতু নো, যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে,
পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১৬
ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং
সমূলহমস্ত পাংসুরে ॥ ১৭

উদয় গিরিতে আরোহণ, মধ্যআকাশে স্থিতি এবং অস্তাচলে অস্তগমন—এই বিষ্ণুর তিন পাদবিক্ষেপ। "বিষ্ণুর ধূলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হইয়াছিল", এই উক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণ দ্বারা মণ্ডিত রহিয়াছে বুঝায়।

ঋগ্বেদীয় যুগে আর্যদিগের জীবনধারাতে তিনটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। প্রথম যাযাবর অবস্থা, তদনন্তর সপ্তসিন্ধু প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন, এবং কৃষিকার্য্যের প্রসারণ। এই সময় তাঁহাদিগকে অনার্য্য প্রাচীন অধিবাসীদিগের সঙ্গে সর্বদা নানারূপ সংঘর্ষের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে হইত; তৃতীয় অবস্থায় সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে। দেশে তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রভুত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী অনার্য্য অধিবাসীরা হয় দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, না হয় সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, অধিকাংশই তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য্যগণ্ডীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে। প্রথম দুই অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে নিয়ত ব্যস্ত থাকিতে হইত, কিন্তু দেশে শান্তি-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এই কল্পনা-প্রিয় জাতি আধ্যাত্মিক নানাবিষয় চিন্তনের অবসর প্রাপ্ত হইলেন। প্রথমাবস্থায় প্রকৃতির নানারূপ বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী ও কার্য্য-কলাপের প্রত্যেক ব্যাপারের মূলে এক একজন পৃথক দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহারা এরূপ মনে করিতেন এবং চারিদিকে নানারূপ শত্রুদ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সকল প্রকার আপদ হইতে রক্ষার জন্য এই সকল দেবতার স্তুতি করিতেন। পরিশেষে পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থাগুলি স্ববশে আনয়ন ও কৃষিকার্য্যের বিস্তার দ্বারা আর্য্যগণ যখন তাঁহাদিগের জীবনযাত্রার পথ সহজ ও সুগম করিতে সমর্থ হইলেন, তখন বাহ্যপ্রকৃতির যেটি শোভন ও মঙ্গলময় দিক্ তাহার প্রতি মনোনিবেশের প্রকৃত অবসর প্রাপ্ত হইলেন। বিষ্ণু বিশেষভাবে এই সময়ের দেবতা। ক্রমে জ্ঞানবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল

বিভিন্ন দেবতার কার্য্যের নিয়ন্তারূপে যে এক দেবতা রহিয়াছেন, কোন কোন ঋষির মনে এই ভাবেরও উদয় হইয়াছিল দেখা যায়। ঋষি দীর্ঘতমা এই সত্য অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি সেই দেবতাকে "একং সৎ" বলিয়াছেন, কোন বিশেষ নাম দেন নাই। পরমেশ্বর নামের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। "পরমেশ্বর" শব্দের ধাতুগত অর্থ হইতে বুঝা যায়, মানব তাহার বিচার ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগদ্বারা প্রাকৃতিক রাজ্যের যে সকল বিভিন্ন শক্তির খেলা—একাধারে এই সকলকে প্রকাশ করিবার জন্য এই শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন (result of a process of abstract reasoning) ঋষিদিগের শব্দজ্ঞান তখনও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষভূত যে জড় জগৎ (concrete things) তাহাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, ক্বচিৎ মানস-চিন্তা-প্রসূত-অনুভূতিগুলিকে ব্যক্ত করিবার জন্য এই জড়-নিরপেক্ষ দুই একটি নামের সৃষ্টি হইয়াছে হয়ত, কিন্তু প্রধানতঃ জড়ের আশ্রয়েই তাহা ব্যক্ত করা হইত। ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি নামের প্রয়োগও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করে। জীবনপথ যখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে দেখা যায় সেই সময় বিষ্ণু অন্যান্য দেবতাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। ইঁহার বিক্রমের বর্ণনাসূচক কয়টী স্তুতির উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে, কিন্তু তখনও তিনি ইন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই, বড় জোর তিনি ইন্দ্রের সহযোগী হইয়াছেন, কোন কোন মন্ত্র তাহা হইতে বুঝা যায়—যথা ১-২২-১৯)।

বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত। যতো ব্রতানি পস্পশে।
ইংদ্রস্য যুজ্যঃ সখা।

বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে ঋত্বিক্ বা যজমান ব্রতসকলের অনুষ্ঠান করেন, সেই কর্ম্মসকল দেখ। বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

আর একটী মন্ত্রে (৬-৬৯-৮) ঋষি ভরদ্বাজ ইহাদের উভয়ের স্তুতিপ্রসঙ্গে বলিতেছেন—

"তোমরা জয় করিয়াছ, কখনও তোমাদের দুইজনের মধ্যে কেহ পরাজিত হয় নাই"।

অন্যত্র (৭-৯৯-৫) ঋষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"তোমরা সম্বরের ৯৯টী দৃঢ় পুরী বিনাশ করিয়াছ, তোমরা বর্চ্চির শত সহস্র বীরকে নাশ করিয়াছ(১)। কিন্তু তথাপি ইন্দ্রেরই প্রাধান্য। ইহার তাৎপর্য্য কি? পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৈদিক আর্য্যগণ কোন সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন তাহা সঠিক নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। কোন কোন মতে ইরাণে পার্শীদিগের সঙ্গে মতভেদ হয় এবং তথা হইতে ভারতে আগমন করেন। প্রাকৃতিক ঘটনাবিপর্য্যয়বশতঃ আহারান্বেষণ ও নিরাপদ আশ্রয়স্থান লাভের আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া সম্ভবতঃ তাঁহারা প্রথম এদেশে আসেন। ভূতত্ত্ববিদ্যার (geology) অনুশীলন হইতে জানা যায় য়ুরোপ, উত্তর আমেরিকা ও এসিয়ার পশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশ অন্ততঃ চারিবার তুষারপাতে বিধ্বস্ত হইয়াছে। অস্‌বরন্‌কৃত "Man of the Old Stone Age" নামক গ্রন্থে এই সকল তুষারপাত ও দুই তুষারপাতের মধ্যবর্ত্তী সময় সম্বন্ধে (Glacial and Interglacial period) সিদ্ধান্ত সকলের উল্লেখ আছে। তাঁহার মতে প্রথম তুষারপাত হয় ছয় লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে,

(১) সম্বর ও বর্চ্চি নামক দুইজন অনার্য্য নরপতি। অন্তরীক্ষ প্রদেশে অনাবৃষ্টির কারণস্বরূপ বৃত্রকে ও কখন কখন এই সকল নামে অভিহিত করা হইয়াছে এবং আকাশে কখন কখন বজ্রপাত সহ বারিপাত ও ঝড় প্রবাহিত হওয়ার পূর্বে যে দুর্গাকারে অবস্থিত মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয় তাহাকে এই সকল পরাক্রমশালী অনার্য্য নরপতিদিগের পুরী ও সৈন্যগণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

ইহা ২৫০০০ (পঁচিশ হাজার) বৎসর স্থায়ী ছিল। ইহার পর দুই লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইলে পুনর্বার তুষারপাত আরম্ভ হয়। শেষ তুষারপাত আরম্ভের সময় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। এইচ্-জি-ওএল্স্ (H. G. Wells) এর মতে বর্ত্তমানকাল হইতে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্বে ইহা খুবই তীব্র মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছিল। য়ুরোপ ও উত্তর এসিয়া অদ্যাপি এই আক্রমণ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। এই শেষ তুষারপাত যুগের কোন সময়ে সর্বপ্রথম পৃথিবীবক্ষে মানবের আগমন হইয়াছে। (It was amidst the snows of this long universal winter that the first man-like beings lived upon our planet.) ফরাসী দেশের অন্তর্গত ক্রোম্যাগ্নন (Cro-magnon) নামক গহ্বরে এবং ইটালি দেশের গ্রিমল্ডিকুঞ্জ (Grimaldi Grottoe) মধ্যে মাথার খুলি, দন্ত ও অন্যান্য অস্থিখণ্ডসকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাহা নিঃসন্দেহে মানবের অস্থি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ক্রোম্যাগ্নন গর্ত্তের অস্থিগুলি ত্রিশ হাজার বৎসরের পুরাতন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে মানব তথায় বাস করিতেছিল। নানারূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, য়ুরোপের এই সকল স্থানে প্রথম মানবের উদ্ভব হয় নাই; তাহারা আহারান্বেষণে তথায় আগমন করিয়া থাকিবে। ভূতত্ত্ববিদ্যা হইতে জানা যায় পৃথিবীবক্ষে নানা কারণেই মাঝে মাঝে জল বায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যাহা হইতে অধিকাংশ জীবকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহারা নিরাপদ ভূমিতে আশ্রয় লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারাই কোনরূপ আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণেরও সম্ভবতঃ এইরূপ কোন দুর্বিপাকই এদেশে আগমনের কারণ হইয়া থাকিবে। তাঁহারা প্রথম যখন এদেশে আগমন করেন তখন তাঁহাদের পশুচারণশীল যাযাবর জীবন। তাঁহাদের গৃহপালিত পশু ছিল,

ইহাদিগের মধ্যে ছাগল ছিল, মেষ ছিল, কিন্তু গোধনই ছিল প্রধান, এদেশে আগমনের পূর্বেই কৃষিকার্য্যেরও কিয়ৎপরিমাণে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগের সঙ্গে অনুক্ষণ সংগ্রামে ব্যাপৃত থাকিয়া উপনিবেশ স্থাপনপূর্বক স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা এক সমৃদ্ধিশালী জাতিতে পরিণত হন। আদিম অধিবাসিগণ তাঁহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া অনেকে দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে বাধ্য হয়। অবশিষ্টেরা তাঁহাদের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়।

আর্য্যগণ যে দেশে বসতি স্থাপন করেন, ঋগ্বেদে সেই দেশের নাম সপ্তসিন্ধু। ইহা বর্ত্তমান পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, ও তাহার পশ্চিমে কান্দাহার (সাবেক গান্ধার) প্রভৃতি আফগানিস্থানের কতক অংশ, ও বর্ত্তমান কাশ্মীরের কতক অংশ সহ পূর্বদিকে সরস্বতী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত সিন্ধু প্রদেশই ঋঙ্মন্ত্রগুলি রচনার স্থান। সরস্বতী অতিক্রম করিয়া আর্য্যগণ পূর্বদিকে যে সময় গাঙ্গেয় প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকেন তাহার পূর্বেই ঋঙ্মন্ত্র রচনা শেষ হইয়াছে। সরস্বতীর পূর্ব প্রদেশ ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার স্থান। পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্বে দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচিত হয়, এইজন্য ইহার নাম ব্রহ্মবর্ত্ত দেশ।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু বেদের এই দুই দেবতার প্রতিপত্তি লাভের পশ্চাতে যে ইতিহাস রহিয়াছে, তাহা সম্যক অবগত হইতে হইলে ঋগ্বেদ ও ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি রচনার সময় জানা আবশ্যক।

১৮৫৯ খৃঃ অঃ প্রোঃ মোক্ষমূলর ১২২০ খৃঃ পূঃ হইতে ১০০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ঋগ্বেদ রচনার কাল নির্ণয় করেন। মৌর্য্যরাজবংশের

প্রতিষ্ঠার তারিখকে (৩১২ খৃঃ পূঃ) ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে এক এক স্তরের সাহিত্য রচনার জন্য দুই শত বৎসর হিসাব করিয়া তিনি এই মন্তব্য স্থির করেন।

প্রোঃ ম্যাক্‌ডোনেলও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া ব্রাহ্মণ আরণ্যক ও উপনিষদগুলির রচনার কাল ৮০০—৫০০ খৃঃ পূঃ স্থির করিয়াছেন। এই সকল উক্তিকে নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া আমাদের দেশের কোন কোন লেখক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খৃঃ পূঃ নবম শতকের ঘটনা (১)। কাহারও মতে আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে (২)। এই সকল উক্তি যে নিতান্তই অসমর্থনীয় ঋগ্বেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। দেখা যায় মোক্ষমূলরও তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃঃ অঃ তিনি এক বক্তৃতায় "Physical Religion" (Gifford Lecture) বলেন --

"Whether the Vedic Hymns were composed 1000 or 1500 or 2000 or 3000 years B. C. no power on earth will ever determine.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের পদানুসরণ ক্রমে আমাদের দেশী গ্রন্থকারগণ আর্য্যদিগের এদেশে আগমনের এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা যে নিতান্তই উপেক্ষণীয় বৈদিক সাহিত্যে তাহার অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে।

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের কাল নির্ণয় জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের রচনা। সেই প্রাচীন ঋগ্বেদীয় যুগেই চন্দ্রের গতি ও আকাশমণ্ডলে নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোন্ নক্ষত্রপুঞ্জের কখন কোথায় স্থিতি আর্য্যগণ বিশেষভাবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি

(১) ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী "Political History of Ancient India."

(২) ডাঃ সুকুমার সেন "ভাষার ইতিবৃত্ত।"

লক্ষ্য করিয়া তিথি গণনা করা হইত। তাঁহারা নির্ণয় করিলেন এক পূর্ণিমা হইতে পরবর্ত্তী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ২৭ দিন ২৭ রাত্রির প্রয়োজন হয়, এবং এই সময় মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। ইহার পর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এই ২৭ রাত্রির মধ্যে চন্দ্র উদয়-কালে কোন্ রাত্রিতে কোন্ নক্ষত্রপুঞ্জের নিকট অবস্থিতি করে তাহাও স্থির করিলেন। চন্দ্রমণ্ডলের আকাশ পথে এই পরিভ্রমণ-কালে পথের উপর অথবা ইহার সন্নিকটবর্ত্তী গগনমণ্ডলে অবস্থিত ২৭টী নক্ষত্রপুঞ্জ অবস্থিত রহিয়াছে তাহা দেখিতে পাইলেন। ইহাদিগকে নিয়া গগনমণ্ডলের রাশিচক্রের (zodiac) সৃষ্টি, এবং এই ২৭টি নক্ষত্রপুঞ্জের ২৭ নক্ষত্র নামকরণ হইল। চন্দ্র কখন কোন্ নক্ষত্রের সঙ্গে সমসূত্রে (in conjunction) অবস্থিতি করে তাহা নির্ণয় করিয়া যজ্ঞের কাল স্থির করা হইত। এইরূপে পূর্ণিমা রজনীতে চন্দ্র কোন নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থিতি করে তাহা নির্ণয় দ্বারা চান্দ্র মাসের সৃষ্টি হয়। ইহার পর সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর পরিভ্রমণের সময় নির্ণয় করিয়া এবং তাহাকে ১২ ভাগে বিভক্ত করিয়া সৌর-মাসের সৃষ্টি হয়। তদনন্তর নক্ষত্রগুলির সংযোগ অবলম্বনক্রমে চান্দ্র ও সৌরবৎসরের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় নির্ণয় করেন। ইহার পরবর্ত্তী কার্য্য ঋতুগুলির সঙ্গেও এইরূপ কোন যোগ স্থাপন করা যায় কিনা, তাহার প্রচেষ্টা। সূর্য্য উত্তরায়ণকালে যে সময় বিষুব রেখাকে অতিক্রম করে (Vernal Equinox) সে সময় পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য কোন নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থিতি করে কিনা, তাহা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সচরাচর এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না। তথাপি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত এই পর্য্যবেক্ষণ হইতে তাঁহারা একসময় দেখিতে পাইলেন সূর্য্য কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত এইভাবে অবস্থিত রহিয়াছে। **শতপথ** ব্রাহ্মণে (২য়—১-২)

ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। "এতা বৈ কৃত্তিকাঃ প্রাচ্যৈ দিশো ন চ্যবন্তে সর্বাণি হ বা অন্যানি নক্ষত্রাণি প্রাচ্যৈদিশশ্চৎবন্তে"। ৩০০০ খৃষ্টীয় অব্দ পূর্বের কাছাকাছি এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল (১)

ইহা হইতে দেখা যায় শতপথ ব্রাহ্মণের ঐ অংশ রচনার কাল ৩০০০ খৃঃ পূঃ। এই ব্রাহ্মণ রচনার পূর্বেই ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি রচনা শেষ হইয়াছে, আর্য্যগণও পূর্ব দিকে গঙ্গার তীরবর্ত্তী প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণের এই খণ্ডে পরীক্ষিৎ জন্মেজয় ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেনের নাম উল্লেখ আছে। আরো দেখা যায়, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের স্থানে স্থানে কুরুপাঞ্চালদের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং তাঁহারা উভয়েই দুই সমৃদ্ধিশালী বংশ। ইহা হইতে প্রমাণ হয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ৩০০০ খৃঃ পূর্বকালের ঘটনা।

শতপথ ব্রাহ্মণে বিবাহ সম্বন্ধীয় একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে যাহা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না; ইহা হইতেও এই গ্রন্থের অন্ততঃ কতক অংশ যে ৩০০০ খৃঃ পূর্বকালের রচনা তাহা বুঝা যায়।

(১) "The Pleiades (কৃত্তিকা পুঞ্জ) do not deviate from the east while all other Nakshatras do. This means that the Pleiades were on the Equator. The Rishis constantly observed the Nakshatras and had determined the exact eastern point. We have there a distinct point to start with in calculation. Now we know that on account of the precession of the equinoxes, the plane of the Krittikas with reference to the equator, is not always the same. At present they are to the north of the equator. We can calculate the next preceding time when they were on the equator. Calculating roughly we find that of 9 Touri the brighest star of the Plěiades was on the equator about 2990 B.C. or roughly speaking about 3000 B. C.

S. B. Dixit in Ind. Act Vol. XXXIV, P. 245.

অনুষ্ঠানটি এই :—

বিবাহের পর স্বামীগৃহে প্রথম আগমনের পর ধ্রুব নক্ষত্র আকাশে উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত বধূকে স্বামীর গৃহপ্রাঙ্গণে এক মৃগচর্ম্মের উপর উপবেশন করিয়া অপেক্ষা করিতে হইত। নক্ষত্র উদয় হইলে উহার প্রতি বধূর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া স্বামী মন্ত্রোচ্চারণ করিতেন, এই নক্ষত্র যেমন অচল তুমিও এই গৃহে তদ্রূপ অচল হইয়া প্রতিষ্ঠিত থাক। বধূও অনুরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ধ্রুব নক্ষত্রের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেন। এই নক্ষত্র বর্ত্তমান ধ্রুব নক্ষত্র নহে। প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূর্ব্বের কাছাকাছি এইরূপ আর একটী বৃহৎ ও উজ্জ্বলতর নক্ষত্র বর্ত্তমান ধ্রুব নক্ষত্রের স্থলে অধিষ্ঠিত ছিল। এই মাঙ্গল্যানুষ্ঠান সেই নক্ষত্রকে নির্দ্দেশ করে। উইন্টারনিট্জও (১) এই মত সমর্থন করেন। তাঁহার

---

(১) এ সম্বন্ধে—Winterneitze লিখিতেছেন,—

The marriage custom in which a constant star figures as the symbol of unchangeable constancy must have originated at a time on which a brighter star stood so near the celestial pole that is seemed to the observers of that time to be standing still.

Now it is again a result of the precession that with the gradual alteration of the Celestial Equator its North Pole also moves away describing in about 26,000 years a circle of 23½ degrees radius around the constant pole of the Ecleptic. By this it means one star after another slowly moves towards the North Pole and becomes north star or polar star; but only from time to time does a brighter star approach the pole so closely that it can for all practical purposes, be regarded as a constant one.

At present a star of the second magnitude in the Little Bear is the Polar star of the Northern Hemisphere. This star of course cannot be meant when the Pole star is spoken of in the Vedic times, because only 2000 years ago,

মতে ঋগ্বেদ রচনার কালও ৩০০০ খৃঃ পূঃ। এই বেদের সর্বাপেক্ষা আধুনিক মন্ত্রগুলির রচনা ৩০০০ খৃঃ পূর্বের কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব কিন্তু ইহাদিগের রচনা আরম্ভ হইয়াছে যে তাহার বহুপূর্বে কোন কোন মন্ত্র হইতে তাহা বুঝা যায়। জেকোবি (Jacobi) সে সকল মন্ত্র রচনার কাল ৪৫০০ হইতে ৪০০০ খৃঃ পূঃ স্থির করিয়াছেন। আমাদের মতে ৪৫০০ অথবা ৫০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত ২০০০ বৎসর হইতে ১৫০০ শত বৎসর ঋঙ্ মন্ত্র রচনার সময়। শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞ সম্বন্ধে এমন কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়, যাহা খৃষ্টাব্দের দশ হাজার বৎসর পূর্ববর্ত্তী কালের ঘটনা; যথা "এতদ্বৈ প্রজাপতেঃ শিরো যন্মৃগশীর্ষম্" (শতপথ ব্রাহ্মণ—১০ কাঃ ২-৫-১৩)। ইহা হইতে দেখা যায়, সে সময় অগ্রহায়ণ মাস হইতে বৎসর গণনা হইত। কিথ্ (Keith) মতে ইহা ১৩০০০ বৎসর পূর্বেকার সময় নির্দ্দেশ করে (১)। আর্য্যদিগের এদেশে আগমনের

this star was still so far removed from the Pole that it could not possibly have been designated as the constant one. Not untill 2780 B. C. do we meet with another Pole star which merited the name. At that time Alfa Draconi stood so near to the pole for over 500 years, that it must have appeared immovable to those who observed with the naked eye. We must then fix the origin of the name Dhruva as well as the custom showing the "Constant star" to the bride on her marriage evening as the symbol of constancy into a period in which Alfa Draconis was the Pole star, that is in the first half of the third millennium B. C.

(১) Jacobi, on the strength of two hymns in the Rig Veda argued that the year began with the summer solestice which took place on 4000 B.C. Our estimate however is that Rig Veda cannot be less than 13000 years old. (Encyclo—Brit.)

(Continued)

বহুপূর্ব হইতে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলি প্রচলিত ছিল। এই যজ্ঞ আর্য্যদিগের সকল শাখারই এক বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞবিষয়ক এরূপ অনেক অনুষ্ঠানের উল্লেখ রহিয়াছে যাহা আর্য্যদিগের এদেশে আগমনের পূর্ব কালকে নির্দ্দেশ করে। ফলতঃ এই সকল যজ্ঞ হইতে (যথা গবায়ন যজ্ঞ) লোকমান্য তিলক প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আর্য্যগণ উত্তর মেরুর সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ হইতে আগমন করিয়াছেন (Arctic Home of the Rig Veda) যজ্ঞে পূর্বাপর প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু ঋগ্মন্ত্রগুলি রচনার স্থান সপ্তসিন্ধু প্রদেশ; এবং তাহার সময় যে ৫০০০ কি ৪৫০০ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ৩০০০ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত আমরা ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে তাহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব।

পৃথিবীবক্ষে একাধিকবার তুষারপাতের আমরা উল্লেখ করিয়াছি। এই তুষারপাতের কারণ কি অবশ্য অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। ডাঃ সি, ই, পি, ব্রুক্স্ জলবায়ু-পরিবর্ত্তন ও সুদীর্ঘকালব্যাপী এক নিয়মানুবর্ত্তিতার সন্ধান পাইয়াছেন। এই নিয়মানুসারে অতিবৃষ্টির পর ক্রমশঃ তাহা হ্রাস পাইতে থাকিয়া অবশেষে অনাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই অনাবৃষ্টির যুগও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। এই ভাবে অতিবৃষ্টির চরমসীমা হইতে অনাবৃষ্টির চরমসীমা ব্যাপিয়া এক যুগ। ইহা এক পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা, তদন্তর অমাবস্যা হইতে আর এক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় একনিয়মানুবর্ত্তিতানুসারে ঘটিয়া থাকে। তবে চক্রগুলি সমকালব্যাপী না হইতে পারে।

The Indian year began in the month of Marga shirsha (Margoshirsha-Orion) or Agrahayan (October)—as the very name signifies. The Indian year now begins in Baishaka or March, a difference of six months which means 12865 years.

তিনি য়ুরোপ ও এসিয়ার পশ্চিমভাগে এইরূপ পরিবর্ত্তনের নিয়ম বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিয়া "Climate through the Ages" নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, অতিবৃষ্টি চূড়ান্ত সীমানায় পঁহুছিয়াছিল ৫০০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে; তৎপর ইহা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং ২০০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে অনাবৃষ্টির চরম সীমানায় পঁহুছে। ইহার পরবর্ত্তী তরঙ্গ চক্র ২০০০ খৃঃ পূঃ কাল হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। এই যুগে সর্বাপেক্ষা অধিক অতিবৃষ্টির কাল ৮০০ খৃঃ পূঃ এবং অনাবৃষ্টি চূড়ান্ত সীমায় পঁহুছে ২০০০ খৃঃ অঃ পূর্ব্বে ও ৫০০ খৃষ্টাব্দে। (১)

ভারতীয় আর্য্য ও ইরাণীগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ঋগ্বেদে যে স্থানকে সপ্তসিন্ধু প্রদেশ বলা হইয়াছে, তাহারই উত্তর পশ্চিম সীমান্তে কোন স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইরাণীদের প্রধান দেবতা অহুরমজদা (অহুর-অসুর-সর্বশক্তিমান্ মজদা অর্থাৎ মঙ্গলময় ঈশ্বর) এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতা

(১) In "Climate through the Ages" Dr. C. E. P. Brooks discusses climatic fluctuations, and builds up climatic curves for the last 7000 years over Europe and Western Asia. He finds that condition of maximum wetness existed about 5000 B. C., and changed from wet to dry from 5000 B. C., to about 2000 B. C., when maximum dryness prevailed. Another such wave disregarding minor fluctuations followed between this date and 500 A. D, maximum condition of wetness having occurred about 800 B. C. and of dryness about 2000 B. C. and 500 A. D,····The curve of wetness in Asia agrees closely with that of Europe,—" Meteorology in Rig Veda by M. V. Unakar.

অংগ্রমন্যু। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বেদের অঙ্গগুলির ন্যায় তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার অঙ্গবিশেষের নাম ভেণ্ডিদাদ্ (Vendidad)। ইহার প্রথম অধ্যায়ে (Fargard) ইরাণীয়-দিগের স্থান হইতে স্থানান্তরে উপনিবেশ স্থাপনের এক বিবরণ আছে। অহুরমজদা এক একটি উৎকৃষ্ট স্থান চিহ্নিত করেন, কিছুকাল তথায় অবস্থানের পর অংগ্রমন্যু কর্ত্তৃক তাহা বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠে। গ্রন্থে এইরূপ ষোলটী স্থানের উল্লেখ আছে। তাহার মধ্যে পঞ্চদশ স্থান সপ্তহিন্দু। অহুরমজদা এই স্থান সম্বন্ধে জুরাস্ত্রাঁকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"তোমাদের জন্য পর পর যত উৎকৃষ্ট স্থান সৃষ্টি করিয়াছিলাম—তাহার পঞ্চদশ স্থান হপ্তহিন্দু। অংগ্রমন্যু এখানেও নানারূপ অশুভ সৃষ্টি করে, তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিল অসহনীয় উত্তাপ (Excessive heat)। গ্রন্থের অনুবাদক ডার্মিষ্টেটার এই অতিরিক্ত উত্তাপ দ্বারা জ্বর বুঝায় এরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই হপ্তহিন্দুর পরবর্ত্তী স্থানের নাম রঙ্গহা (Rongha), ইহার সংস্কৃত নাম রসা (Rosa)। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে সিন্ধুর পশ্চিম-দিকের যে সকল শাখানদীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে রসা নদী অন্যতম। ষোড়শ স্থান এই নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশে কোন স্থান বলিয়া মনে হয়। সে যাহাই হউক, হপ্তহিন্দুর উত্তরাংশের কোন স্থান হইতে একদল (ইরাণীগণ) পশ্চিমদিকে এবং অপরদল ভারতীয় আর্য্যগণ যে দক্ষিণে পঞ্জাবের সমতল ভূমির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাহা অনুমান করা যায়। মহাভারতে অসুররাজা বৃষপর্বা ও যযাতির আখ্যান আছে। যযাতি বৃষপর্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। ইহা হইতে তখনও যে আর্য্যদিগের এই দুই শাখা বিচ্ছিন্ন হয় নাই, তাহা বুঝা যায়। যযাতি ঋগ্বেদের একজন ঋষি, তাঁহার বংশধর তুর্বসু, যদু, পুরু, দ্রুহ্যু ও অনুর অনেক বিবরণ ঋগ্বেদে রহিয়াছে। ঐ বেদে

পঞ্চকৃষ্টি, পঞ্চজনা, পঞ্চক্ষিতির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। ইহাদিগের মধ্যে তুর্বসু ও যদু এক কৃষ্টি, পুরু এক কৃষ্টি, দ্রুহ্যু ও অনু এক কৃষ্টি, তৃৎসু ও ভরত শাখা অপর দুই কৃষ্টি।

ভারতীয় আর্য্যগণ ও ইরাণীদিগের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ কি, তাহা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু ইহারা যে পরস্পরের সহিত সদ্‌ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পৃথক হন নাই, নানা কারণ হইতে তাহা বুঝা যায়।

ঋগ্বেদের দেবতাদিগের মধ্যে বরুণ মিত্র দ্যৌ, অগ্নি, সোম, যম ও বায়ু ইরাণীদিগেরও দেবতা। ইহাদিগের মধ্যে বরুণ ও অগ্নির বিশেষ প্রধান্য ছিল। ঋগ্বেদে নানা স্থানেই বরুণকে অসুর বলা হইয়াছে। এই শব্দ বরুণের শক্তিমত্তার পরিচায়ক, তিনি দেবতাদিগের রাজা। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ইরাণীগণ অসুর শব্দের এই অর্থই রাখিয়াছেন, তাহাদের পরমেশ্বর অহুর (অসুর) মজদা—কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ এই শব্দ অপদেবতার বিশেষণরূপে প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং উভয় শাখার এমন কি আর্য্যদিগের সকল শাখারই প্রাচীনতম দেবতা দ্যৌ (আকাশ) শব্দের দিব (উজ্জ্বল) ধাতু হইতে তাঁহাদের মঙ্গলপ্রদ উপাস্য শক্তিগুলিকে দেবতা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

প্রাচীন ঋঙ্‌মন্ত্র ও ইরাণীদিগের আবেস্তা উভয়ের মধ্যে বরুণের প্রাধান্য। উভয় স্থলেই মিত্র ও বরুণ উভয় দেবতার এক সঙ্গে স্তুতি। বরুণ ঋতের দেবতা অর্থাৎ তাঁহার অমোঘ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া আর সব চলিতেছে। ঋগ্বেদে বরুণের নিকটও বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল প্রার্থনাতে কোনরূপ অনাবৃষ্টি কিম্বা ঝড়ঝঞ্ঝাবাতের বিশেষ কোন উপদ্রব দৃষ্ট হয় না। তাঁহার নিয়মানুবর্ত্তিতায় যথাসময়েই বারিপাত হইতেছে।

বরুণের দান বারিকে স্বর্গের ক্ষীরধারা ও মধু বলা হইয়াছে। উনাকর মনে করেন ইহা দ্বারা বরফপাত বুঝাইতে পারে। "The characteristic metaphorical association with milk, butter, honey and sweetness would perhaps indicate experience of quiet snowfall." মিত্র একজন আদিত্য। ঋগ্বেদে কোন স্থানে তাঁহাকে বরুণের চক্ষু বলা হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থানে তাঁহাকে বরুণের বাহন সুবর্ণের পক্ষী বলা হইয়াছে। এক স্থানে বলা হইয়াছে, বরুণ বিশাল বৃক্ষের শিখরদেশকে উর্দ্ধমূল অবস্থায় শূন্যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এখানে বৃক্ষের শিখরদেশ সূর্য্য এবং ইহার মূল বা শিকড়গুলি সূর্য্যরশ্মিমালা। আবেস্তায় এই মিত্র দেবতার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, কিন্তু ঋগ্বেদে ক্রমেই তিনি ক্ষীণপ্রভ হইতেছেন, এবং ইন্দ্রের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছে। দেখা যায় এক সূক্তে ইন্দ্র ও বরুণের মধ্যে কে প্রধান সে সম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, ঋষি অবশেষে ইন্দ্রের প্রাধান্য স্থির করিয়াছেন।

ইরাণী ও আর্য্য উভয় শাখার মধ্যে যখন বরুণের প্রাধান্য তখন তাঁহারা এমন এক স্থানে বাস করিতেছিলেন, যথায় বর্ত্তমান কালের Trade Windsএর ন্যায় যথারীতি নিয়মিতভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, বৃষ্টিবর্ষণ ও বরফপাতও যথানিয়মেই হইতেছে। শীতপ্রধান দেশে মিত্রের (সূর্য্যের) তাপ ও আলো উভয়ই পরম আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু। ইরাণী শাখা পশ্চিমদিকে যে স্থানে গমন করিলেন তাহা শীতপ্রধান দেশ, যেখানে সূর্য্যের তাপ ও আলোর প্রয়োজনীয়তা পূর্বের ন্যায়ই থাকিয়া যাওয়ায় মিত্রের প্রাধান্য তাহাদের নিকট পূর্ববৎই রহিয়া গেল, কিন্তু ভারতীয় শাখা এমন একস্থানে আসিয়া উপনীত হইল, যথায় আকাশ ও পৃথিবীর অন্তর্বর্ত্তী মধ্য আকাশে (অন্তরীক্ষে) নিরন্তর ঝড়ঝঞ্ঝাবাত ইত্যাদির

তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে। এই স্থানের দেবতা পর্জন্য (monsoon rains), মরুৎ (depressional storms), অনাবৃষ্টি (Demon of droughts), এবং ইহাদের বিনাশক্ষম দেবতা ইন্দ্র রহিয়াছেন ঋষিরা এরূপ অনুভব করিলেন। ইহা প্রধানতঃ ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি রচনার স্থান পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ। ইহা আরব সাগর হইতে উত্থিত ঝঞ্ঝাবাতের (depressional storms), এবং বঙ্গদেশে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত যে ঝড় (nor'wester) অনুভূত হয় তাহার লীলাভূমি। আরব সাগরের মৌসুঁম বায়ুও এইস্থানের বৃষ্টিপাতের সহায়ক।

রুদ্র ঋগ্বেদের এক অতি প্রাচীন দেবতা। আর্য্যজাতির এক অতি প্রাচীন শাখা লিথুনিয়নদের এক দেবতার (Perquinas) যে বিবরণ আছে, তাহা ঋগ্বেদে রুদ্রের সম্বন্ধে একটি মন্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। অবশ্য পার্কুনাস ও পর্জন্য এই উভয় নামের মধ্যে এত সাদৃশ্য যে তাহা পর্জন্যকে নির্দ্দেশ করাও অসম্ভব নহে, কিন্তু ঋগ্বেদে পর্জন্য সম্বন্ধে যে সকল বর্ণনা আছে তাহা হইতে ইহাকে ভারতবর্ষের মৌসুঁম (monsoon) বৃষ্টির দেবতা বলিয়া মনে হয়।

পর্জন্য পৃথিবীবক্ষকে বৃষ্টিদানে অনুসিক্ত করিলে পৃথিবী শস্য-শ্যামলা হন, পর্জন্য অশনিগর্জ্জন সহকারে নিজের আগমন বার্ত্তা প্রেরণ করেন। তাঁহার দানস্বরূপ বারিবর্ষণকে মণ্ডুক (ভেক) সকল অভিবাদন করিতে থাকে। ইহা মৌসুঁম বায়ু ও বৃষ্টিকে বুঝায়। মরুৎগণকে রুদ্রের পুত্র বলা হইয়াছে। প্রাচীন ঋঙ্‌মন্ত্র-গুলিতে দেখা যায় আকাশে বিদ্যুতের খেলা ও অশনি গর্জ্জন রুদ্রের কার্য্য, ঋষিরা এরূপ মনে করিতেন। তখন পর্য্যন্ত ঋষিগণ ইন্দ্রে এই সকল শক্তি আরোপ করেন নাই।

অনেক সময় এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে মৌসুঁম বারিবর্ষণ (monsoon rains) একেবারে বন্ধ। দীর্ঘকালব্যাপী

অনাবৃষ্টি চলিয়াছে। অনাবৃষ্টি হইতে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে ঋগ্বেদে ইহারও উল্লেখ দেখা যায়, এমন কি দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ ছিল তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—(৯—১১২, ১-২-৩-৪) (১০—৯৮—১, ৪. ৮, ১০, ১২)। তখন বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনা। আমরা দেখিয়াছি আর্য্যদিগের সপ্তসিন্ধু প্রদেশে অবস্থান কালে এক সুদীর্ঘ অনাবৃষ্টির চক্র' (cycle) চলিয়াছিল। আকাশে মেঘ দেখা দিতেছে—চক্রবালের উপর স্থানে স্থানে পর্বতাকারে তাহা সঞ্চিত হইতেছে—মাথার উপর দিয়া মেঘ সকল মন্থরগতিতে চলিয়াছে, কিন্তু এক ফোঁটা বৃষ্টি নাই। পৃথিবীবক্ষ ফাটিয়া চৌচির হইতেছে, জলের অভাবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, বৃষ্টি নাই। এই অবস্থায় না পড়িলে কি যে কষ্ট তাহা ধারণাই করা যায় না—

রেগোজিন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ইহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন,—"The author's personal experience includes several 'dry spells' in central Italy, and a real unmitigated two years drought in Taxas —the most terrible in 59 years. Aggravating as the relentless blue sky was on the former occasions, it was nothing to the exasperation of gazing daily on a cloudy, some times an overcast sky, knowing that not a drop would fall from it. The feelling was distinctly one of animosity against some invisible, but sunheat and malicious power."

Vedic India—The Storm Myth.

রেগোজিন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা ঋগ্বেদীয় যুগের ঋষিদিগের মানসিক অবস্থার কিছু আভাস পাইতে পারি।

আমরা দেখিয়াছি ৫০০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০ খৃঃ অঃ পূব পর্য্যন্ত এই তিন হাজার বৎসর অতিবৃষ্টির পর অনাবৃষ্টির এক যুগ অতিবাহিত হইয়া ২০০০ খৃঃ অঃ পূর্বে পুনর্বার অতিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহা হইতে মনে হয় ৩৫০০ খৃঃ অঃ পূর্বে অনাবৃষ্টি (drought) তাহার চরম সীমানায় উপনীত হইয়াছিল। ইহাই ঋঙ্‌মন্ত্রগুলি রচনার প্রধান সময়। আকাশ দিনের পর দিন মেঘাচ্ছন্ন রহিয়াছে অথচ বৃষ্টি নাই। ইহা কোন অদৃশ্য অনিষ্টকামী প্রতিকূল শত্রুর কার্য্য এরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে। ঋষিগণ এই শত্রুকে বৃত্র আখ্যা দিলেন। বৃত্র শব্দের ধাতুগত অর্থ আবরণ করা, কখন বা মেঘগুলি আকাশে চক্রবালের উপরে পর্বতাকারে জমাট বাঁধিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে ফাঁকও দেখা যাইতেছে। আর্য্যগণ সে সময় অনার্য্যদিগের সহিত সর্বদা সংগ্রামে লিপ্ত রহিয়াছেন। কোন কোন অনার্য্য নরপতি সুদৃঢ় দুর্গবেষ্টিত পুরীতে বাস করিতেন বেদে তাহার উল্লেখ আছে। সম্বরের পুরী শতদুর্গ-বেষ্টিত ছিল। মেঘগুলিও সময় সময় এইরূপ শত শত শৃঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া সম্বরের পুরীর ন্যায় দেখাইত। পণিগণ ও অন্যান্য অনার্য্য দস্যুগণ আর্য্যদিগের গোধন চুরি করিয়া পর্বত গহ্বরে লুকাইয়া রাখিত. ইহা একপ্রকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। ঋগ্বেদে এরূপ ঘটনার অপ্রতুলতা নাই। পর্বতগাত্রে দুর্গবেষ্টিত অনার্য্যদিগের পুরীর ন্যায় আকাশে পর্বতপ্রতিম মেঘরাশির মধ্যে ও পশ্চাতে পর্বতগাত্রে গহ্বরের ন্যায় ফাঁকা স্থানগুলিতে ধীরে ধীরে মেঘখণ্ড সকল ভাসিয়া ভাসিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইত। দিনের পর দিন এই সকল দৃশ্য চলিতেছে—অথচ বৃষ্টি নাই, বৃষ্টির অভাবে পর্বত শৃঙ্গস্থিত গ্লেসিয়ার হইতে জল আসিতেছে না। নদীবক্ষ জলশূন্য। এই সকল দুর্বিপাকের মূলে কোনরূপ প্রতিকূল দেবতার কার্য্য বিদ্যমান রহিয়াছে মনে করিয়া ঋষিগণ সেই দেবতার ধ্বংসের জন্য ইন্দ্রের স্তুতি করিতেন।

পর্বত পরিমাণ মেঘগুলিকে সম্বরের পুরী নামকরণ করা হইল, এবং ইহাদিগের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডগুলির অদৃশ্য হওয়া দস্যুগণ কর্ত্তৃক পর্বতগহ্বরে গাভীগুলিকে লুক্কায়িত রাখার সহিত উপমা করা হইল। মেঘখণ্ডগুলি যেন গাভী। নদীগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, পর্বতগাত্র হইতে জল ক্ষরণ হইতেছে না, অহি নামক সর্পরূপ অপদেবতা পর্বতশৃঙ্গে জলকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতাকারে মেঘ সঞ্চিত রহিয়াছে. বৃষ্টি নাই, সমগ্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টি নাই, ইহা বৃত্রের কার্য্য। এই অনাবৃষ্টি হইতে লোকের যে ভীষণ যাতনা তাহা আংশিক পরিমাণে অনুভব করিবার সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়া রেগোজিন(Regozin) লিখিতেছেন—

"Those whose ill fortune it has been to live through a genuine drought in a semi-tropical clime will heartily endorse this remark that nothing can be more disheartening when every breathing and growing thing, nay the inanimate soil itself, with its grey dusty rifted surface, is panting and gaping for rain to bring moisture and coolness, than to see the clouds collecting and floating across the sky day after day without discharging their contents."

অন্তরীক্ষ মণ্ডলের এই সকল ঘটনা বৃষ্টিপাতের পূর্ব্বে অশনি-গর্জ্জন সহকারে প্রবল ঝড়ের সূচনা করে। কল্পনাপ্রিয় আর্য্যগণ একদিকে যেমন এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে বৃত্র অহি প্রভৃতি দেব শত্রুদিগের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন, অপরদিকে একমাত্র ইন্দ্রই ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সক্ষম, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে স্তব ও যজ্ঞ করিতেন। বারিবর্ষণের পূর্ব্বে অশনিপাত সহকারে প্রবল বেগে ঝড় উঠিত। অন্তরীক্ষ

প্রদেশে ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি অশনি নিক্ষেপ করিতেছেন। পর্ব্বতশৃঙ্গেও অশনি বর্ষণ দ্বারা অহিকে বিনাশ করিয়া জলরাশি মুক্ত করিয়া দিতেছেন। শত্রুর সঙ্গে সংগ্রামে মরুৎগণ পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তাঁহার সাহায্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অন্তরীক্ষমণ্ডলে প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের এই যে নাট্যাভিনয় সেই অনাবৃষ্টির যুগে ইহা আর্য্যদিগের চিত্তকে যে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত করিবে ইহা স্বাভাবিক।

প্রথমাবস্থায় বরুণের প্রাধান্য ছিল। অতঃপর বরুণ ও ইন্দ্রের এক সঙ্গে প্রাধান্য, কিন্তু ক্রমশঃ বরুণের শক্তি খর্ব্ব হইতেছে এবং তদনুপাতে ইন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এবং পরিশেষে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী যুগে মরুৎগণ ও ইন্দ্রের প্রাধান্য। ইন্দ্র অনার্য্যদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রধান সহায়, একমাত্র তাঁহার অনুগ্রহেই অনার্য্যগণকে পরাজয় করা সম্ভবপর। এই জন্য ইন্দ্রের প্রাধান্য অপ্রতিহত থাকিল। কিন্তু বৃত্র অহি প্রভৃতি প্রতিকূল শক্তিগুলিকে সংহার করিতে একমাত্র ইন্দ্রের শক্তি পর্য্যাপ্ত নহে, মরুৎগণের সাহায্যও অপরিহার্য্য, এই জন্য মরুৎগণ ইন্দ্রের সহায়কারী দেবতারূপে গণ্য রহিলেন। আর্য্যগণ যখন পঞ্জাবের সীমানা অতিক্রম করিয়া গঙ্গা যমুনার তীরবর্ত্তী ভূমিতে উপনীত হইলেন তখন অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অনাবৃষ্টি যুগের তীব্রতা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া অতিবৃষ্টি যুগের দিকে চক্রের আবর্ত্তন চলিয়াছে। সপ্তসিন্ধু প্রদেশে অবস্থান-কালে ঋগ্বেদের যুগেই আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের বশীভূত করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। অধিকাংশ অনার্য্য আর্য্যগণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছে, রক্ত সংস্রবও ঘটিয়াছে; অনার্য্যদিগের মধ্যে কোন কোন নরপতি আর্য্য-ভাবাপন্ন হইয়াছেন, এমন কি অনার্য্যদিগের মধ্য হইতে কোন

কোন খ্যাতনামা ঋষিও আবির্ভূত হইয়াছেন, ঋগ্বেদে এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। অনার্য্যগণ আর্য্যদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইতেছে, কৃষিকার্য্যে এইক্ষণ তাহারাই প্রধান সহায়। এই সকল অবস্থার আবেষ্টনের মধ্যে বিষ্ণু দেবতার অভ্যুদয়। কিন্তু তথাপি অনাবৃষ্টি ও তাহার আনুসঙ্গিক দুর্ভিক্ষ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। সুতরাং দেবতাদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত ইন্দ্রের প্রাধান্য স্থির রহিয়াছে এবং বিষ্ণুর মহিমা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার স্থান মধ্যভারত পশ্চিমে সরস্বতী হইতে পূর্ব্বদিকে গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। শতপথ ব্রাহ্মণের কোন কোন অংশ প্রায় ৩০০০ খৃঃ পূঃ কালের রচনা, সুতরাং ইহা অনুমান করা যাইতে পারে আর্য্যগণ এই সময়ের কাছাকাছি পঞ্জাবের পূর্ব্বদিকে উপনিবেশ বিস্তৃত করিতে থাকেন। নানা কারণে পূর্ব্বদিকে এই উপনিবেশ বিস্তার আর্য্যদিগের জীবনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

পঞ্জাবের দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্রের তীরবর্ত্তী মরুভূমিগুলি আবহাওয়ার নানারূপ বিপর্য্যয়ের জন্য কতক পরিমাণে দায়ী। পূর্ব্বদিকের ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশ এই সকল উপদ্রব হইতে মুক্ত। গঙ্গা যমুনাদি নদী সকলের তীররর্ত্তী উর্ব্বর সমতল প্রদেশ কৃষি-কার্য্যের বিশেষ উপযোগী, তদুপরি দক্ষিণদিকে গঙ্গা ও যমুনা এবং উত্তরদিকে হিমালয় শ্রেণী ও কৈলাস পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এই প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার।

ভারতীয় জরিপবিভাগ হিমালয় পর্ব্বতকে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্বদিক হইতে আসাম হিমালয়, নেপাল হিমালয়, কুমায়ুন হিমালয় ও পঞ্জাব হিমালয়। কুমায়ুন হিমালয়ের প্রাচীন নাম কূর্ম্মাচল প্রদেশ

আর্য্যগণ এইক্ষণ যেস্থানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন উত্তর দিকে কূর্ম্মাচল প্রদেশ তাহার অন্তর্ভুক্ত। বর্ত্তমানকালেও হিন্দুদিগের অনেক পবিত্র তীর্থস্থান এই প্রদেশে অবস্থিত। উত্তরে পাঁচশূলি, নন্দাকূট, নন্দাদেবী, ত্রিশূল, নীলকণ্ঠ, বদরিনাথ, কেদারনাথ, শ্রীকান্ত, যমুনোত্রী প্রভৃতি হিমালয়ের প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ সকল, এবং এই হিমালয় শ্রেণীর অনতিদূরে উত্তরদিকে কৈলাস পর্ব্বত ও মানসসরোবর ইহারা সকলেই কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, বদরিনারায়ণ মন্দির, হৃষীকেশ মন্দির, হরিদ্বার প্রভৃতি অসংখ্য তীর্থস্থান এখানে বিরাজ করিতেছে। এই অঞ্চলে পশ্চিম সীমান্তে সরস্বতী এবং পূর্ব্ব সীমান্তে কর্ণালি ও কালী (সরযূ) নদী প্রবাহিত হইতেছে। গঙ্গা ও যমুনা এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সিন্ধু, শতদ্রু ও ব্রহ্মপুত্রের উদ্ভবস্থানও এই প্রদেশে।

গঙ্গা বিষ্ণুপাদ-সম্ভূতা। ভগীরথের কঠোর তপস্যাতে প্রীতা হইয়া সগরবংশকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। স্বর্গ হইতে প্রবাহিত ধারার বেগ পৃথিবীবক্ষ বহন করিতে সমর্থ হইবে না বিধায় স্বয়ং শঙ্কর প্রথমতঃ আপন মস্তকে তাঁহাকে ধারণ করেন। পথে জহ্নুমুণি জলরাশি উদরস্থ করিয়া ফেলেন, গঙ্গা তাঁহার জানু ভেদ করিয়া বাহির হন, তদনন্তর ঐরাবত তাঁহার বেগ রোধ করিতে অগ্রসর হইলে তাহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি ভগীরথের পশ্চাতে পশ্চাতে সাগরসঙ্গমে গমন করেন। এই সমুদয় পৌরাণিক আখ্যায়িকা গঙ্গার অপরিসীম মহিমা সূচনা করে।

গঙ্গার ভৌগলিকতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ণনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ফলতঃ কূর্ম্মাচল প্রদেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত অনেক শাখা নদীর সমবেত জলরাশি প্রসিদ্ধ লছমন ঝোলার উত্তরে মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। সেই সঙ্গম স্থানের

নাম দেবপ্রয়াগ ; ইহা একটী তীর্থস্থান। এই সমবেত জলস্রোত শিবালিক পর্ব্বতমালাকে বিদ্ধ করিয়া হরিদ্বারে প্রবেশ করিয়াছে। হরিদ্বার শিবালিক পর্ব্বতের দক্ষিণপ্রান্তে অবস্থিত। ভাগীরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। ভাগীরথীর প্রধান করদ নদী জাহ্নবী, অলকনন্দার প্রধান করদনদী বিষ্ণুগঙ্গা। ইহাদের উভয়েরই উদ্ভব স্থান হিমালয়ের উত্তরে। ইহারা হিমালয়কে ভেদ করতঃ দক্ষিণদিকে বাহির হইয়া আসিয়াছে।

বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গে ধাউলিগঙ্গা মিলিত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত। ধাউলি ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থানের নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ। আর একটী স্রোত ঋষিগঙ্গা। ইহা ধাউলির দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ হইতে প্রবাহিত হইয়া ধাউলিতে পতিত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রয়াগের সঙ্গমস্থান হইতে সমবেত জলরাশির নাম অলকনন্দা। ইহার উপর বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে দেড় মাইল নিম্নে যোশীমঠ অবস্থিত। এই স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬২০০ ফিট্ উচ্চ। কৈলাস ও মানস-সরোবরে যাইবার রাস্তা যোশীমঠের নিকট দিয়া গিয়াছে। যোশীমঠের দক্ষিণপূর্ব্বদিকে পাঁচ মাইল দূরে ধাউলি নদীর উপর তপোবন। বিষ্ণুপ্রয়াগ হইতে উত্তরদিকে ৬½ মাইল দূরে বিষ্ণুগঙ্গার উপর পাণ্ডুকেশ্বর। পাণ্ডুকেশ্বর হইতে ১০ মাইল উত্তরে বদ্রিনাথ। বদ্রিনাথ হইতে দুই মাইল উত্তরে তিব্বত যাইবার রাস্তা মনপাশ। বদ্রিনাথ মন্দির সমুদ্রগর্ভ হইতে ১০,২০০ ফিট উপরে। যোশীমঠের দক্ষিণে চামুলী, চামুলীর দক্ষিণে পূর্ব্বত্রিশূল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন পিণ্ডারনদী অলকনন্দাতে পতিত হইয়াছে। এই স্থান সমুদ্রগর্ভ হইতে মাত্র ২৬০০ ফিট উচ্চ। এই সঙ্গমস্থানের নাম কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগের দক্ষিণ-পশ্চিমে মন্দাকিনী অলকনন্দার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে—এই সঙ্গমস্থানের নাম নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগের অনতিদূরে দক্ষিণে রুদ্রপ্রয়াগ। এই সমুদয় নদীই কূর্ম্মাচল অঞ্চলের পূর্ব্ব অংশে প্রবাহিত।

ভাগীরথী কেদারনাথ শৃঙ্গের পশ্চাৎভাগে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের ১৩,০০০ ফিট উচ্চ গোমুখ নামক স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। ইহার অনতিদূরে গঙ্গোত্রী মন্দির। ইহা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে কোপালি নামক স্থানে জাহ্নবী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, এবং তাহাদের সমবেত জলরাশি ভাগীরথী নাম ধারণপূর্ব্বক যমুনোত্রী হইতে ৮ মাইল পূর্ব্বে হিমালয়শ্রেণীকে ভেদ করতঃ এক বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। গ্রীসব্যাক্ (Griesback) ইহার এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"This gorge of the Bhagirathee is one of the most remarkable in the Central Himalaya, and for picturesqueness can hardly be surpassed by any valley in the world. Its sides are often absolutely vertical, smoothed down by the torrent, which rushes 600 ft. or more down below through a narrow slit in the rocks."

"Geology of the Central Himalayas."

বস্তুতঃ এই নদীস্রোত বরফ সমাচ্ছাদিত হিমালয়গর্ভে গভীর খাদ খননপূর্ব্বক যে স্থানে বাহির হইয়াছে তথায় উভয় পার্শ্বে ৩০০ ফুট উচ্চ বরফরাশি যেন তপোমগ্ন অবস্থায় উপবেশন করিয়া আছে। গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ারের জলও অপূর্ব্ব কৌশলে কঠিন প্রস্তররাশিকে খনন করতঃ পাদদেশে গোমুখ গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে—জহ্নু মুনির জানু ভেদ করিয়া গঙ্গার বহির্গত হওয়ার কাহিনীর এই সকলই দৃশ্যতঃ মূল ইতিহাস।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলির কোনটাই যথাযথভাবে প্রয়োজ্য নহে। ভাগীরথীর সহিত বিষ্ণুগঙ্গার কোন সংস্রব নাই। জাহ্নবী এবং

বিষ্ণুগঙ্গাও দুইটী স্বতন্ত্র নদী, দুই বিভিন্ন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া একটি ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, অপরটি ধাউলির সঙ্গে মিলিত হইয়া অলকনন্দা নাম ধারণ করিয়াছে। এক একটি স্বতন্ত্র গ্লেসিয়ার হইতে উৎপন্ন এই সকল নদীর সমবেত জলরাশি যে স্থানে একত্র মিলিত হইয়াছে তাহার নাম দেবপ্রয়াগ। এই স্থান হইতে নদী গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এ স্থানে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—সময় সময় পার্শ্বস্থ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ ধ্বসিয়া নদীগর্ভে পতিত হয়। কখন কখন ইহা এরূপভাবে স্থানচ্যুত হয় যে শৃঙ্গটির অবয়বে কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে না। ইহা নদীগর্ভকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেয়। ইহা হইতে এই বাঁধের পশ্চাতে এক বিপুল হ্রদের সৃষ্টি হয়। ক্রমে জলের বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে এবং যখন বাঁধকে চূর্ণ করিয়া জলরাশি বাহির হয় তখন এক বিরাট প্রলয় ব্যাপারের সূচনা হয়।

১৯২৪ খৃঃ অঃ গোনা নামক স্থানে বিরাহী গঙ্গাবক্ষে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। বিরাহী নন্দঘাট গ্লেসিয়ার হইতে বাহির হইয়া চামেলীর উত্তরে অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার পাশের এক শৃঙ্গ ধ্বসিয়া পড়িয়া নদীর বক্ষ বন্ধ করিয়া দেয় এবং বৎসরাধিককাল পর্য্যন্ত নদীর জল নির্গমন পথ বন্ধ থাকে। বিরাহী ক্ষুদ্র নদী, তথাপি এই জল নির্গমন বন্ধ হইয়া ইহার পশ্চাতে ১০০০ ফিট গভীর এক হ্রদের সৃষ্টি হয়। অবশেষে জলরাশি এই বাধা অতিক্রম করিয়া যখন বাহির হইয়াছিল, তাহাতে এক ভয়াবহ ব্যাপারের সূচনা হয়। বহুদূর পর্য্যন্ত জলের কল্লোল শুনা গিয়াছিল। দূরে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত গঙ্গার উভয় কূল বিধ্বস্ত ও সন্ন্যাসীদিগের অসংখ্য কুটির ধ্বংস করিয়া ভয়ঙ্কর রবে বারিরাশি প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সকল অনুচ্চ পর্ব্বতচূড়া অধিকাংশই চূনা পাথরে গঠিত এবং ধব্‌ধবে সাদাবর্ণ। গঙ্গার সঙ্গে ঐরাবতের সংগ্রামের ইহাই কাহিনী, এই সংগ্রাম যুগযুগান্তরকাল হইতে চলিয়া

আসিতেছে। হিমাচলের এই কূর্ম্মাচল অঞ্চল একদিকে যেমন অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার, অপরদিকে ইহার ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থানও অন্যত্র বিরল। মৌসুরি, নৈনীতাল, আলমোরা, রাণীক্ষেত, ভিমতাল, ভাওয়ালি প্রভৃতি অনেক স্বাস্থ্যকর স্থান এই অঞ্চলে অবস্থিত। নৈনীতাল যুক্তপ্রদেশের গভর্ণরের শৈলনিবাস। নৈনীতাল দৈর্ঘ্যে ১৫৫৭ গজ, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত স্থানের পরিসর ৫০০ গজ ব্যাপিয়া একটী সরোবর। ইহা ৯৩ ফিট গভীর এবং সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬৩৫০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহাকে বেষ্টন করিয়া গর্গর পর্ব্বতমালা। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখর চীনা পাহাড় ৮৫৬৮ ফিট। ইহার উপর হইতে বৃহৎ হিমালয়ের প্রায় একশত মাইল দূরে চিরবরফমণ্ডিত সারিবদ্ধ শৃঙ্গরাজির যে দৃশ্য তাহা বর্ণনাতীত। চীনার পাদমূল হইতে বৃহৎ হিমালয়শ্রেণী পর্য্যন্ত এই একশত মাইল স্থান ব্যাপিয়া পর্ব্বতমালাসকল তরঙ্গাকারে অবস্থান করিতেছে; যেন সমুদ্রবক্ষে ঢেউএর পর ঢেউ চলিয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটি শৃঙ্গ ভিন্ন ইহারা সকলেই ৬৫০০ ফিটের মধ্যে। চীনার উপর হইতে এই সমগ্র দৃশ্য এক সঙ্গে দৃষ্টিপথে পতিত হয়। দার্জ্জিলিং প্রভৃতি অপরাপর স্বাস্থ্যকর শৈল-নিবাসগুলির ন্যায় এই সমগ্র ভূমিখণ্ড সমুদ্রগর্ভ হইতে ৬৫০০ ফিটের মধ্যে। নৈনীতালকে কোন কোন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারী সমগ্র হিমাচল-প্রদেশ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, সময় সময় এই স্থানের দৃশ্যগুলির পট পরিবর্ত্তন বড়ই বিস্ময়কর। সরোবরকে বেষ্টন করিয়া পর্ব্বতগাত্রে সারি সারি গৃহগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল গৃহের রাস্তাগুলি ক্রমশঃ বক্রগতিতে সরোবরতীরবর্ত্তী প্রশস্ত রাস্তা হইতে উপরদিকে চলিয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাড়ী হইতে সরোবরের চারিদিক বেষ্টিত বাড়ীগুলি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বায়ুমণ্ডল স্বচ্ছ, দৃশ্যগুলি সমুদয়ই দৃষ্টিপথে বিরাজমান রহিয়াছে।

হঠাৎ সরোবরের উপর একটী ক্ষুদ্র কুয়াসার কুণ্ডলী দৃষ্ট হইল, দেখিতে দেখিতে চক্ষুর নিমিষে তাহা বিস্তৃতিলাভ করিয়া ঘরবাড়ী ইত্যাদিকে এমন ভাবে ঢাকিয়া ফেলে যে, এই কুয়াসাকে ভেদ করিয়া এক হাত দূরের কোন পদার্থও দেখা যায় না। আবার কিছুক্ষণ পরে চক্ষুর নিমিষে এম্‌নি ভাবে সব পরিষ্কার হইয়া যায় যে, এ যেন এক অত্যাশ্চর্য্য ভেল্কিবাজী। সরোবর বক্ষের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বাষ্প বহন করিয়া থাকে, বায়ুপ্রবাহের তাপ হ্রাস হইলে এই বাষ্প কুয়াসার আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এই মায়াপুরীর দৃশ্য সৃষ্টি করে। আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে নৈনীতালে সচরাচরই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আর একটী বিস্ময়কর ব্যাপার মেঘের খেলা। পর্ব্বতমালাগুলি ঢেউএর পর ঢেউএর আকারে চলিয়াছে। সেপ্টেম্বরের নির্ম্মল আকাশে মেঘখণ্ড সকল যেন পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক মন্থর গতিতে আসিয়া এই সকল পর্ব্বত গাত্রে অবতীর্ণ হইতে থাকে। ইহাদের অঙ্গ সঞ্চালন এমন মনোরম যে চক্ষু ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না। মেঘের পর মেঘখণ্ড সকল দেখিতে দেখিতে পাহাড় গাত্র আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন পাহাড়ের গাত্রকে বেষ্টন করিয়া উচ্ছ্বসিত ফেনিলবক্ষ এক সাগরের দৃশ্য সম্মুখে উপস্থিত হয়। অপরাহ্ণে অস্তগামী সূর্য্যের আলোকরশ্মি নীচ হইতে এই সকল মেঘমালার মধ্য দিয়া যখন প্রকাশ পায় তখনকার রূপের খেলা উপভোগের বিষয়, ইহার বর্ণনা হয় না।

নৈনীদেবী হইতে নৈনীতালের নামকরণ। নৈনী ও নন্দাদেবী মহাদেবের দুই পত্নীরূপে কল্পিতা হইয়াছেন। নৈনীতাল এক সময়ে গর্গ ঋষির তপস্যার স্থান ছিল। স্কন্দপুরাণে বর্ণনা আছে নৈনীর আবাসভূমি গর্গ ঋষির তপোবন দর্শন করিতে আসিয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্য পুলহ ও অত্রি পিপাসায় বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তাঁহাদের এই অবস্থা জানিতে পারিয়া

ব্রহ্মা মানসসরোবর হইতে জল আনয়ণপূর্ব্বক এই সরোবরের সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ এই সরোবর তীরবর্ত্তী পর্ব্বতমালা যে আর্য্যদিগের নিকট পবিত্র ভূমি ছিল পর্ব্বতগুলির নাম হইতে তাহা বুঝা যায়। একটী পর্ব্বতের নাম আর্য্যপত্তন আর একটি অদ্যাপি দেবপত্তন নামে অভিহিত হয়।

কূর্ম্মাচল অঞ্চলে অবস্থিত পর্ব্বতগুলির নাম হইতে আর্য্যদিগের নিকট ইঁহা কিরূপ পবিত্র স্থান ছিল তাহা বুঝা যায়– যথা কেদার, বদ্রিনাথ, ত্রিশূল, পাঁচশূলি, নন্দাকূট, নন্দাদেবী। এই সকলের মধ্যে আবার নন্দাদেবী শৃঙ্গের বিশেষ প্রাধান্য। বস্তুতঃ ইহা হিমালয়ের কেন্দ্র স্থানীয়। নন্দা ও নন্দাদেবী মহাদেবের পত্নী এবং ইহারা পার্ব্বতী ও দুর্গারই অপর নাম। কূর্ম্মাচল অঞ্চলে তিনি এই নামেই পূজিতা হইয়া থাকেন।

ই-এস-ওকলি (E. S. Oakly) "Holy Himalaya" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—

"Devi is the *Sakti* or female energy of the god assuming the names Uma, Kali, Durga, Parbati, Bhowani or Nanda. Under the latter name she is the female Energy of Siva and a favourite deity in Almora having a local habitation in the peak.

এই দেবীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটি আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন - "The goddess had a temple in Almora fort which Mr. Trail removed. Some time later he happened to be struck with snow-blindness in the lower slopes of the Nanda Devi. This was accepted as a sign of displeasure of the goddess. Mr. Trail vowed to build her a temple. This vow he ful-

filled on his return to Almora and was delivered from the curse."

ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি রচনার সময় আর্য্যগণ যে স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা এই প্রদেশ—ইহা উত্তরে কূর্ম্মাচল হইতে দক্ষিণে গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গম প্রয়াগ ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রকৃতি যেন নিঃশেষে তাহার ধন ও সৌন্দর্য্যভাণ্ডার এখানে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির আশঙ্কা এখানে তিরোহিত হইয়াছে। অনার্য্যদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছে। জীবন শান্তিপূর্ণ, চিত্ত চাঞ্চল্যের যে সকল কারণ ছিল একে একে সকলেই অপনীত হইয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য উপভোগের সকল অন্তরায় দূর হইয়াছে। এত সব অনুকূল আবেষ্টনের মধ্যে আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা যে এক নূতন পথে ধাবিত হইবে তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

আমরা ঋগ্বেদে ইন্দ্রেরই প্রাধান্য দেখিয়াছি। কিন্তু বিষ্ণুর প্রতিপত্তি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে এবং তিনি ইন্দ্রের উপযুক্ত সখার পদে সমাসীন হইয়াছেন। পঞ্জাব হইতে পূর্ব্বদিকে উপনিবেশ বিস্তারের পর আর তেমন ভাবে ইন্দ্রের অধীনতা স্বীকার ও অনুগ্রহ ভিক্ষার কোন প্রয়োজন রহিতেছে না। বিষ্ণু প্রকৃতির প্রশান্ত মূর্ত্তির দেবতা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে ইন্দ্র অপেক্ষা বিষ্ণুরই প্রাধান্য। এমন কি অবশেষে ইন্দ্র পূজা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে এরূপ দেখা যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিষ্ণু-নারায়ণ।

আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদীয় যুগেই অনার্য্য প্রাচীন অধিবাসী-দিগের উপর আর্য্যদিগের আধিপত্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তখন হইতে বিষ্ণু ক্রমশঃ নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

ঋষি বশিষ্ঠ একস্থানে (ঋ ৭—৯৯, ১, ২) বলিতেছেন,—"পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় লোক আমরা জানি, একমাত্র বিষ্ণুই পরম লোক অবগত আছেন। যাহারা জন্মিয়াছে ও যাহারা জন্মিবে কেহই বিষ্ণুর মহিমার অপর পার দেখিবার শক্তি রাখে না।"

এক স্থানে (১ম—১৫৬-৩) বিষ্ণুকে যজ্ঞের গর্ভভূত (ঋতস্য গর্ভং) বলা হইয়াছে, তথাপি তখন পর্য্যন্ত ইন্দ্রই প্রধান দেবতা। ইহার কারণ কি পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি, আরো দেখিয়াছি পূর্ব্বদিকে কৃষিকার্য্যের বিশেষ অনুকূল গাঙ্গেয় প্রদেশে আর্য্যদিগের উপনিবেশ বিস্তারের পর অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষের ভয় তাহাদের অপনীত হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়ারও আর তেমন আবশ্যকতা থাকিতেছে না। ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে "ঋতস্য গর্ভং" বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির রচনার কালে তিনি যজ্ঞেশ্বর।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একস্থানে (১-৩০) বিষ্ণুকে দেবতাদের দ্বাররক্ষক বলা হইয়াছে। অন্যত্র (১-৪) তাঁহাকে ও বরুণকে দুই দীক্ষাপালক বলা হইয়াছে। যাহাতে যজ্ঞ যথাবিধি সম্পন্ন হয়, বিষ্ণু তাহা দেখেন, ভূল-ভ্রান্তিজনিত অপকার নিবারণ করেন। বরুণ যজ্ঞের ফল রক্ষা করেন।

এখানে ইন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে বরুণ বিষ্ণুর সহযোগী দেবতা। আদিতে বরুণই প্রধান দেবতা ছিলেন। আর্য্যদিগের পঞ্জাবে আসার পর ইন্দ্র ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করিয়া তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন; কেন এরূপ হইয়াছে পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইন্দ্র ও বরুণের মধ্যে প্রাধান্য লইয়া অনেককাল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল, যতদিন তাঁহারা পঞ্জাব প্রদেশে ছিলেন, জলবায়ুর অনিশ্চিত আবেষ্টন নিবন্ধন জীবনরক্ষার জন্য বরুণ অপেক্ষা ইন্দ্রের শরণাপন্ন হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল, এজন্য ঋষি ইন্দ্রকে প্রধান দেবতার আসন প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তথাপি বরুণকে একেবারে অস্বীকার করা হইল না। ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান-কর্ত্তা হইলেন ইন্দ্র, আর আধ্যাত্মিক রাজ্যে বরুণের প্রাধান্য রহিল অব্যাহত। বরুণ ঋতের দেবতা। তাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রাদি নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্ত্তন করিতেছে। দিবসের পর রাত্রি আগমন করিতেছে, যথাকালে ঋতু সকলের আগমন ও নির্গমন ঘটিতেছে। তাঁহার নিয়মের ব্যতিক্রম করে এমন সাধ্য কাহারো নাই, সুতরাং তাঁহার প্রবর্ত্তিত ঋত যাহা—তাহাই সত্য পথ, সকল মঙ্গলের পথ। আদিতে তিনি সমস্ত আকাশ মণ্ডলে সূর্য্যরশ্মিতে অবস্থিত বাষ্পাকাশের অধিনায়ক সর্ব্বব্যাপী এক দেবতা ছিলেন, যাঁহার অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুবর্ত্তিতায় যথাকালে বারিবর্ষণ দ্বারা পৃথিবী তাহার শস্যোৎপাদিকাশক্তি সঞ্চার করিত, কিন্তু পঞ্জাবে আসার পর তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে দেখা গেল; অনাবৃষ্টি নিবারণ জন্য তাঁহার স্থানে ইন্দ্রের অধিষ্ঠান হইল বটে, কিন্তু জাগতিক ব্যাপারে বৃহত্তর ঘটনাগুলিতে তাঁহার ঋত সকল অব্যাহত থাকিয়া গেল। অধিকন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাঁহার অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল। বহির্জগতে যাহা অলঙ্ঘ্য নিয়ম (inexorable laws of nature); অন্তর্জগতে তাহা নৈতিক নির্দ্দেশ; ইহার

ব্যতিক্রম ঘটিলে পাপ; তিনি পাপের দণ্ডদাতা। তাঁহার ঋতলঙ্ঘনজনিত পাপের দণ্ডে ভীত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে বহু স্তুতি রহিয়াছে এবং পাপ মোচনের জন্যও অনেক ব্যাকুল প্রার্থনা রহিয়াছে। বস্তুতঃ বহির্রাজ্য হইতে অন্তর্রাজ্যে বরুণের অধিনায়কত্ব সম্বন্ধে ঋগ্বেদের প্রার্থনাগুলি যেমন পবিত্র ভাব-ব্যঞ্জক তেমনি মর্ম্মস্পর্শী। কবিত্বের দিক দিয়াও এইগুলি অতুলনীয়।

ঋগ্বেদের সর্ব্বাধিপতি বরুণ অথর্ব্ববেদে আরো উন্নত হইয়া সর্ব্বেশ্বর হইয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণুর সঙ্গে বরুণের এই যে সহযোগিতার উল্লেখ, তাহা যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ফলবিষয়ক।

বিষ্ণুর প্রাধান্য লাভ সম্বন্ধে তৈত্তিরীয়, আরণ্যক ও শতপথ ব্রাহ্মণে একটি আখ্যায়িকা আছে; দেবতাগণ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য ও আহার্য্য লাভের জন্য যজ্ঞানুষ্ঠান করেন এবং প্রস্তাব করেন তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞ সাধনের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হইতে পারিবেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইবেন। বিষ্ণু সকলের পূর্ব্বে পহুঁছেন, তদবধি দেবতারা তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ ১৪-১-১)

---

(১) মিত্র ও বরুণ প্রথমতঃ যুগ্ম দেবতা। সূর্য্য তাঁহাদিগের চক্ষু, তাঁহারা ঋতের অধিপতি, পাপের দণ্ড দাতা, ক্রমে পাপের মোচন কর্ত্তারূপেও স্তুত হইতে থাকেন। ইহার পর মিত্র বৈদিকসাহিত্য হইতে পরিত্যক্ত হইলেন, কিন্তু ইরানীদিগের গ্রন্থে তাঁহার মহিমা অপ্রতিহত থাকিয়া গেল। বরুণ সমগ্র আকাশের দেবতা। আকাশে অবস্থিত বাষ্প হইতে বৃষ্টির উদ্ভব, সুতরাং এই বাষ্পই সমুদ্র। বরুণ এই সমুদ্রের দেবতা। ঋগ্বেদে যজ্ঞ প্রভাবে এই উপরের সমুদ্রকে নীচের সমুদ্রে আনিবার উল্লেখ আছে (১০-৯৮-৬) অর্থাৎ প্রচুর পরিমাণে বারিপাতের বর্ণনা আছে। ক্রমে বরুণের সর্ব্বময়ত্ব সঙ্কোচিত হইয়া পৌরাণিক যুগে তিনি পার্থিব সমুদ্রের অধিপতি হইয়াছেন, এবং তাঁহার ঋতলঙ্ঘন জনিত যে পাশের বন্ধনের উল্লেখ ঋগ্বেদে রহিয়াছে—তাহা পুরাণের নাগপাশে পরিণত হইয়াছে।

বিষ্ণুর অলৌকিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে শতপথ ব্রাহ্মণে (১-২-৫) আর একটি আখ্যায়িকা আছে ; একদা যজ্ঞকালে কাহাদের জন্য কতদূর স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ইহা লইয়া দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে তর্ক বাঁধে, অসুরগণ দেবতাদিগের জন্য মাত্র এক বামনের পরিমিত স্থান ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। দেবতারা অগত্যা তাহাতেই রাজি হন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ আদিত্য বিষ্ণুর দেহের পরিমিত ভূমি অসুরগণ দেবতাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন স্থির হয়। বিষ্ণু মাটিতে শুইয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীর বিস্তৃত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া গেল। দেবতারা পৃথিবী পাইলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬-১৫) এইরূপ একটি গল্প আছে। তথায় বলা হইয়াছে দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগের প্রশ্ন উঠিলে ইন্দ্র প্রস্তাব করেন বিষ্ণু যতটুকু স্থান ত্রিপাদ বিক্ষেপে পরিক্রম করিতে পারিবেন ততটুকু দেবগণের প্রাপ্য হইবে, অবশিষ্ট অসুরগণ পাইবে। অসুরগণ তাহাতে রাজি হয়, তখন বিষ্ণু তিন পাদবিক্রমে জগৎ, বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করেন।

বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুসম্বন্ধে এই সকল বর্ণনা হইতে বামন অবতার প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। দেবতাদিগের মধ্যে বিষ্ণু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি ঋগ্বেদের ঋষি (১-১৬৪-৪৬) আদিত্যের প্রতি "দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সায়ন ইহার অর্থ করিয়াছেন "সুপতঃ গমনবান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব"। এই সূক্তে তিনি অগ্নি এবং তিনিই ইন্দ্র এরূপ বলা হইয়াছে। আরো বলা হইয়াছে বিষ্ণুরূপী এই যে আদিত্য তিনি পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং আকাশে সূর্য্যরূপে সমুদয় ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন।

ইন্দ্রও একজন আদিত্য। অগ্নি, সূর্য্য ও ইন্দ্র নামক তিন আদিত্য দেবতাই রথে চড়িয়া পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগের রথের অশ্বের নাম যথাক্রমে রোহিত, হরিৎ ও হরি। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১৪ সূক্তের ১২শ মন্ত্রে ঋষি মেধাতিথি অগ্নির স্তুতিতে বলিতেছেন—"রোহিত নামক গতিশীল ও বহনসমর্থ অশ্বদিগকে রথে যোজনা কর" (যুক্ষা হ্যরুষী রথে হরিতো দেব রোহিতঃ)। আদিত্যের পৃথিবীতে অগ্নিরূপে, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে এবং আকাশে সূর্য্যরূপে ত্রিপাদবিক্ষেপের যে বর্ণনা তাহা অশ্বগুলির কল্পনার মূল। আদিত্য সপ্তকিরণবিশিষ্টও বটেন। অশ্ব যেমন রথীর অগ্রে অগ্রে রথ টানিয়া চলে কিরণমালাও তদ্রূপ অগ্নি, ইন্দ্র ও সূর্য্যরূপী আদিত্যের পূর্ব্বে গমন করে, এইজন্য কিরণগুলির অশ্ব নামকরণ। বলা হইয়াছে উদয়গিরির ললাটে প্রথম আদিত্যের আলোকস্পর্শ হয়। এই আলোক অগ্নির ন্যায় রোহিতবর্ণ। অন্তরীক্ষ প্রদেশে যে বিদ্যুৎতের প্রকাশ হয় তাহা অগ্নি ও অত্যুগ্র শ্বেতবর্ণের মাঝামাঝি বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণ অত্যুগ্র শ্বেতবর্ণ। এই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন বর্ণ-বিশিষ্ট আদিত্য কিরণকে রথবাহী অশ্বের সঙ্গে তুলনা করিয়া অগ্নির অশ্বের রোহিত, সূর্য্যের অশ্বের হরিৎ এবং ইন্দ্রের অশ্বের হরি নামকরণ করা হইয়াছে। অন্যত্র আদিত্যের কিরণকে গমনশীল সুপর্ণপক্ষবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বোপরি আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আদিত্যের যে "সুপর্ণো গরুত্মান্" বিশেষণ, তাহা বিষ্ণুর বাহন হইয়াছেন। এই বিশেষণকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া উত্তরকালে পৌরাণিক যুগে এই দেবতা হিন্দুধর্ম্মের ত্রিমূর্ত্তির অন্যতম মূর্ত্তি এবং ঐশ্বর্য্যের প্রতীক গরুড়বাহন বিষ্ণু হইয়াছেন।

বৈদিকসাহিত্যে বিষ্ণু সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন বিবরণ দেখা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ইহার পর নারায়ণ।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের পঞ্চম ও ষষ্ঠ মন্ত্র ঃ—

"যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা পৃথিবীর অপর পারে, যাহা পরাক্রমশালী (অসুর), দেবগণকে (অথবা অসুর ও দেবগণকে) অতিক্রম করিয়া আছে, **জল সকল** এমন কোন গর্ভ ধারণ করিয়াছিল যাহার মধ্যে দেবতা সকল অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন"।

"সেই অজপুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে সমস্ত বিশ্বভুবন অবস্থিত আছে। **আপ সকল** ইহাই আপন গর্ভস্বরূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার মধ্যেই দেবতাগণ পরস্পরকে দেখিতেছেন।"

এই ঋক্ দুইটিতে আপ (জল) শব্দের উল্লেখ আছে। এবং তন্মধ্যে অজাতপুরুষের অবস্থান, এবং এই পুরুষের নাভিদেশকে গর্ভাবাস বলা হইয়াছে, তথায় দেবতাগণ পরস্পরকে দেখিতেছেন এরূপ বর্ণনা আছে।

মনুসংহিতায় (১।১০) জল অর্থাৎ আপকে নার বলা হইয়াছে ; কারণ জলরাশি নরদেবতার পুত্র। বৈদিক সাহিত্যে নর বলিতে শক্তিশালী দেবতা বুঝায় ; যথা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বিতীয় সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে বায়ু ও ইন্দ্র এই দেবতাদ্বয়কে নরদ্বয় বলা হইয়াছে ("বায়বিংদ্রশ্চ···ধিয়া নরা")। এই মণ্ডলের ২২ সূক্তের ৯, ১০, ১১, ১২শ এই চারি মন্ত্রে দেবপত্নীদিগের যজ্ঞস্থলে আহ্বান বিষয়ক একাদশ মন্ত্রে তাঁহাদিগকে "নৃপত্নী" বলা হইয়াছে— "অভি নো দেবীরবসা মহঃ শর্মণা নৃপত্নীঃ"। এই মণ্ডলের ৩৯ সূ ৩ ঋকে মরুৎগুলিকে "নরসমূহ" বলা হইয়াছে, ৪৬ সূ ৪ ঋকে অশ্বিদ্বয়কে "নরদ্বয়" বলা হইয়াছে। এই নার অর্থাৎ জলরাশিতে সেই অজ্ঞাতপুরুষের অয়ন বা স্থিতি এইজন্য তিনি **নারায়ণ**। তাঁহার নাভিদেশ জল সকলের গর্ভাধার, যাহা হইতে এই সৃষ্টির

উদ্ভব হইয়াছে এবং যাহাতে দেবগণ পরস্পরকে দর্শন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ ইহা তাঁহাদেরও উৎপত্তি স্থান।

মহাভারত বনপর্বে ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে প্রলয়ের বর্ণনা আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে সেকালে সমস্ত বিশ্ব জলধিজলে নিমগ্ন হইলে একটি বালক ন্যগ্রোধ (অশ্বত্থ) বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা আশ্রয়ে ভাসিতে থাকে। বালক মুখব্যাদন করিলে মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাতে প্রবেশ করেন এবং তাহার মধ্যে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পান। বালক উদ্গারপূর্বক তাঁহাকে বাহির করিয়া দিলে তিনি পুনর্বার চতুর্দ্দিকে কেবল জলরাশিই দেখিতে পান। মার্কণ্ডেয় বিস্ময় বিস্ফারিতনেত্রে বালকের দিকে তাকাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "পূর্বে আমি এই জলরাশিকে **'নারা'** নাম দিয়াছিলাম। এই জলই আমার **'অয়ন'**—বিশ্রাম স্থান ছিল, এই জন্য আমি **'নারায়ণ'**।

বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে সৃষ্টির এক বিবরণ রহিয়াছে। স্বয়ং নারায়ণ এই সূক্তের ঋষি। ইহাকে **পুরুষ-সূক্ত** বলা হয়। উহাতে এরূপ বর্ণনা আছে যে, যে পুরুষের (প্রজাপতির) দেহ হইতে জাগতিক বস্তুসকলের উদ্ভব হইয়াছে সেই পুরুষই জগতের উপাদান কারণ।

এই সূক্তের দেবতা পুরুষ ও ঋষি নারায়ণ, এই উভয় নাম যোগ করিয়া শতপথব্রাহ্মণে (১৩।৬।১) পুরুষ-নারায়ণের এক আখ্যান রহিয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, পুরুষ-নারায়ণ পাঁচ দিনব্যাপী যজ্ঞ (পঞ্চরাত্র সত্র) করিয়া জাগতিক বস্তু সকলের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহা যজ্ঞে বিষ্ণুর প্রাধান্য লাভের আখ্যায়িকার রূপান্তর; সুতরাং বিষ্ণু এবং পুরুষ-নারায়ণ যে একই দেবতা তাহা বুঝায়। এই গ্রন্থের অপর স্থানে (১৩।৩।৪) পুরুষ-নারায়ণ সম্বন্ধে আর একটি আখ্যায়িকা আছে;—তাহাতে বলা হইয়াছে, প্রজাপতি পুরুষ-নারায়ণকে পুনঃ পুনঃ যজ্ঞ করিতে আদেশ করিলে তখন তিনি (পুরুষ-নারায়ণ)

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে নিজকে স্থাপন করিলেন, এবং আপনার মধ্যে সকলকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিলেন। এই আখ্যায়িকা পূর্ব বর্ণিত দশম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রের নারায়ণ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা বিশেষ। এখানে পুরুষ-নারায়ণের সর্বব্যাপিত্ব জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বিষ্ণুর সহিত নারায়ণের নাম এক সঙ্গে যোজিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই ইহা যজ্ঞ ব্যাপার উপলক্ষে। তিনি যজ্ঞপালক, যজ্ঞরক্ষক, যজ্ঞের অধীশ্বর। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে এই সম্বন্ধে আর কোন বর্ণনা দেখা যায় না।

উপনিষদগুলির মধ্যে ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে "দহর বিদ্যা" উপলক্ষে নারায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে। তৈত্তিরি শ্রুতিতে দহর বিদ্যার পরে বলা হইয়াছে—

"সহস্রশীর্ষং দেবং বিশ্বাক্ষং বিশ্বসম্ভবম্।
বিশ্বং নারায়ণং দেবমক্ষরং পরমং প্রভুম্॥"

(দহর বিদ্যার পরেই) সহস্র শীর্ষযুক্ত দ্যুতিমান্ বিশ্বদর্শী, বিশ্বের কারণ বিশ্বাত্মক নির্বিকার পরমপ্রভু নারায়ণকে ভজনা করিবে। আরও বলা হইয়াছে—"সোঽক্ষরঃ পরমঃ স্বরাট্" তিনি স্বয়ং জ্যোতি নিরতিশয় প্রকাশমান অক্ষর। সেই প্রভু নারায়ণের অভিব্যক্তি স্থান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,—

"দহং বিপাপ্মং পরবেশ্মভূতং যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যস্থম্।
তত্রাপিদহং গগনং বিশোকস্তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্॥"(১)

মনুষ্যের নিষ্পাপ হৃদয় পরমেশ্বরের বাসগৃহ। তাহা দেহমধ্যস্থ 'পুণ্ডরীক' নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে যে আকাশ আছে, সেই ক্ষুদ্র হৃদাকাশে যাহা অবস্থিত রহিয়াছে, তাহারই উপাসনা করিতে হইবে।

---

(১) "যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং" পাঠান্তর।

সেই বস্তুই নারায়ণ, পদ্মকোশ সদৃশ অধোমুখে অবস্থিত হৃদয়ের অন্তর্বর্ত্তী যে ক্ষুদ্র আকাশ (দহরাকাশ) তাহা তাঁহার অভিব্যক্তির স্থান বলিয়া তিনি পুণ্ডরীক নামে অভিহিত হন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্তের ঋষিরূপে নারায়ণ পুরুষের বর্ণনায় "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" এবং তিনি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়াও তদতিরিক্ত হইয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অবস্থিত থাকেন বলিয়া যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এখানে উল্লেখযোগ্য। তৈত্তিরি শ্রুতিও সেই পুরুষকেই **নারায়ণ** আখ্যা দিয়াছেন।

নারায়ণ-তত্ত্ব ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া তিনি কিরূপে সর্বব্যাপী ও সর্বান্তরভাবক সর্বময় দেবতার আসন লাভ করিয়াছেন, পরবর্ত্তী সাহিত্য মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নারায়ণ-বাসুদেব।

বৈদিক সাহিত্যের নারায়ণ তত্ত্ব* মহাভারতে অনেক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। শান্তিপর্বের ৩৩৫ হইতে ৩৫২ অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে কতকগুলি আখ্যায়িকা আছে। এই সকল আখ্যায়িকার মূলে যে ভক্তিতত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এই সকল আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের যিনি উপাস্য দেবতা তাঁহার সহিত বেদ বর্ণিত বিষ্ণু-নারায়ণের যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বের মূলও এই স্থানে।

শান্তিপর্বের ৩৪৯ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে যে, নারদ ব্যাসের নিকট পঞ্চরাত্রসম্মত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। ইহার মূল পুরুষ-নারায়ণ অনুষ্ঠিত পঞ্চদিবসব্যাপী সত্র। এই ধর্ম্মমতে সাংখ্য যোগ ও আরণ্যক বেদ ইহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভূত এবং শাশ্বত সনাতন ধর্ম্ম। কল্পান্তে প্রত্যেক সৃষ্টি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং নারায়ণ এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। প্রথম ব্রহ্মা নারায়ণের মুখ হইতে উৎপন্ন হইলে এই ধর্ম্ম প্রকাশিত হয়। ফেনপ নামক মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইয়া কালক্রমে পুনর্বার লোপপ্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়বার নারায়ণের চক্ষু হইতে ব্রহ্মার উদ্ভব হইলে বালখিল্য মহর্ষিগণ এই ধর্ম্ম আচরণ করেন। নারায়ণের মায়াপ্রভাবে এবারও কালক্রমে ইহা তিরোহিত হয়। এইরূপ পর পর নারায়ণের বাক্য কর্ণ নাসিকা ও অণ্ড হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলে এই ধর্ম্মের উদ্ভব হয় ও কালক্রমে তাহা তিরোহিত হয়, এবং সপ্তমবার নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। নারায়ণ পুনরায় তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন (১)। এবার ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বানকে এই ধর্ম্ম শিক্ষা দান করেন। অনন্তর ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্ম্ম সমর্পণ করিলে ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে ইহা প্রচার করেন, এবং অদ্যাপি ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সনাতন ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম, ইহা সকল ধর্ম্মের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। ইহা ঐকান্তিক ধর্ম্ম। পূর্ব্বে হরিগীতায় যতিধর্ম্ম কীর্ত্তন প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১) ভাগবতের প্রথম শ্লোকের প্রথম অংশ—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।

আর একটি আখ্যায়িকা :—

অতি প্রাচীন কালে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন মহর্ষি (২) সুমেরু পর্বতে অবস্থান করিতেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডী নামে খ্যাত। স্বায়ম্ভুব মনুকে লইয়া তাঁহারা আটজন নারায়ণের অভিপ্রায় অনুসারে দেবী সরস্বতীর অনুকম্পায় লোকহিতকর এবং বেদসম্মত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। শব্দ, অর্থ, ও হেতুগর্ভ এই সর্বোৎকৃষ্ট নীতি-শাস্ত্রই সর্বশাস্ত্রের মূল শাস্ত্র। মহর্ষিগণ ওঙ্কারস্বর সমলঙ্কৃত এই শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথম নারায়ণকে শ্রবণ করান। নারায়ণ প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অদৃশ্যভাবে তপোধনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহর্ষিগণ! তোমরা যে এই লক্ষশ্লোকাত্মক উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র প্রণয়ণ করিয়াছ, ইহা হইতে সমস্ত লোকধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে, এবং ইহা লোকের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণস্থল হইবে। মনু এই শাস্ত্র অনুসারে ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবেন, বৃহস্পতি ও শুক্র উৎপন্ন হইয়া তোমাদিগের এই নীতিশাস্ত্র অনুসারে সকলকে উপদেশ দিবেন। বৃহস্পতি রাজা উপচরকে ইহা প্রদান করিবেন। উপচরের লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে এই সনাতন নীতি-শাস্ত্র অন্তর্হিত হইবে। এই বলিয়া নারায়ণ অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর সত্যযুগে বৃহস্পতি জন্মগ্রহণ করিলে মহর্ষিগণ এই নীতি-শাস্ত্রের প্রচার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন।

এখানে লক্ষ্যের বিষয় এইবার এই ধর্ম্ম ব্রহ্মার মধ্যবর্ত্তীতায় প্রকাশিত হয় নাই, অথচ প্রথম কল্পের স্বায়ম্ভুব মনুর সময়ের এই ঘটনা। এই দুইটি আখ্যায়িকার প্রথমটিতে ত্রেতাযুগে ইক্ষ্বাকু কর্ত্তৃক

---

(২) ঋগ্বেদে সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, জমদগ্নি, কশ্যপ, গোতম, অত্রি ও ভরদ্বাজ। কশ্যপ মরীচির পুত্র। অত্রি ও বশিষ্ঠ ব্যতীত বেদের অপর পাঁচ জন ঋষির নামের সঙ্গে এই সকল ঋষির মিল দেখা যায় না।

এই ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে। দ্বিতীয়টি তাহা হইতে অনেক প্রাচীন সত্যযুগের ঘটনা, ইহাতে বৃহস্পতি কর্ত্তৃক রাজা উপচরিকে এই ধর্ম্ম প্রদানের উল্লেখ আছে। উপচর সম্বন্ধে এই আখ্যায়িকার মধ্যে এক ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। আখ্যায়িকাটি এই ঃ—

পুরাকালে নারায়ণে পরম ভক্তিপরায়ণ উপচর নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি সর্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অনুযায়ী বিষ্ণুর অর্চ্চনা করতঃ পরিশেষে পিতৃগণের পূজা ও আশ্রিতগণকে অন্নদান করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইতেন। তিনি কখনও সত্যের অপলাপ করিতেন না। বৃহস্পতির নিকট হইতে নীতিশাস্ত্র লাভ করিয়া তদনুযায়ী প্রজাপালন করিতেন। তাঁহার কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞ কার্য্য সকল এই পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অনুসারে নির্বাহ হইত। রাজা মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞে বৃহস্পতি প্রধান পুরোহিত এবং একত দ্বিত ত্রিত মেধাতিথি তাণ্ড্য কণ্ব বৈশম্পায়নের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তিত্তিরি প্রভৃতি সদস্য হন। তিনি অহিংসাপরায়ণ ছিলেন, যজ্ঞে পশুবধ না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ধান্যাদি পৃথিবীজাত শস্য দ্বারা যজ্ঞভাগ সকল কল্পনা করেন। নারায়ণ পশুহিংসা-বিবর্জ্জিত এই যজ্ঞে উপচরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, এবং একমাত্র তাঁহাকেই নিজরূপ প্রদর্শনকরতঃ যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। যজ্ঞের প্রধান হোতা বৃহস্পতি নারায়ণের দর্শন পাইলেন না। ইহাতে তাঁহার অভিমানে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যজ্ঞক্রিয়া হইতে বিরত হইলেন। সদস্যগণ অনুনয়-পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ক্রোধ করা **সত্যযুগের** ধর্ম্ম নহে। ভগবান্ নারায়ণের ক্রোধ নাই, তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনিই তাঁহার দর্শন পান। অপর কাহারও তাঁহাকে দর্শন করিবার ক্ষমতা নাই।

এই প্রসঙ্গে একত দ্বিত ও ত্রিতের এক আখ্যায়িকার বর্ণনা আছে। তাঁহারা বৃহস্পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন ;—

"আমরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। পূর্বে নারায়ণের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ক্ষীরোদ সাগরের অদূরবর্ত্তী সুমেরুর উত্তর প্রদেশে গমনপূর্বক এক পায় দাঁড়াইয়া কাষ্ঠের ন্যায় অচলভাবে সমাহিতচিত্তে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম। ইহার পর আকাশবাণী শুনিলাম "তোমরা নারায়ণের প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ সত্য, তাঁহার দর্শন লাভ সুদুষ্কর। ক্ষীরোদ সাগরের উত্তর দিকে শ্বেতদ্বীপ নামে এক প্রভাসম্পন্ন প্রসিদ্ধ স্থান আছে। তথায় নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে, সেখানে গমন করিতে পারিলে তাঁহার কথঞ্চিৎ দর্শন লাভ করিতে পারিবে।" আমরা সেই দৈববাণী নির্দ্দিষ্টপথে তথায় উপস্থিত হইলাম। কিন্তু পঁহুছিবামাত্র আমাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সাত বৎসর দৃষ্টিহীন অবস্থায় কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত হইলে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসিল এবং দেখিলাম চন্দ্রের ন্যায় পরমসুন্দর সর্বলক্ষণসম্পন্ন মহাত্মারা ব্রহ্মমন্ত্র জপে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাঁহারা একান্তচিত্তে ভগবান্ নারায়ণের উপাসনা করেন বলিয়াই তিনি তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন। এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে যুগপৎ উদিত সহস্রসূর্য্যের প্রভা সহসা আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল, এবং ঐ দ্বীপবাসী মহাত্মারা "আমি সকলের অগ্রে গমন করিব" এরূপ বলিতে বলিতে সেই তেজঃপুঞ্জাভিমুখে ধাবিত হইলেন। আমাদিগের দৃষ্টিবল ও ইন্দ্রিয়শক্তি সমুদয় রোধ হইয়া গেল। কেবলমাত্র শুনিতে পাইলাম তাঁহারা এই বলিয়া স্তুতি করিতেছেন,— "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমার জয় হউক, হে হৃষীকেশ! তুমি বিশ্বভাবন, মহাপুরুষ ও সকলের আদি, তোমাকে নমস্কার।" সেই সহস্র সহস্র মহাত্মাদিগের একজনও আমাদিগের প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেন না। একমাত্র ব্রহ্মের প্রতি চিত্ত সমাধান করিয়া রহিলেন।

এমন সময় আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী হইল, "হে মুনিগণ! তোমরা এই যে শ্বেতদ্বীপের মানবগণকে দেখিলে ইঁহারা বাহ্যেন্দ্রিয়শূন্য, নারায়ণে ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন, ইঁহারাই নারায়ণের সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ হয়েন। ভক্তিহীন ব্যক্তিরা কখনই তাঁহার দেখা পায় না। বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্‌গতচিত্ত হইতে পারিলেই সেই দুর্নিরীক্ষ নারায়ণকে সন্দর্শন করিতে পারা যায়। তোমরা তাঁহার দেখা পাইবে না, স্বস্থানে গমন কর।"

এই উপাখ্যান শ্রবণে বৃহস্পতির ক্রোধ দূর হইল। অতঃপর তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন।

উপচর সম্বন্ধে আখ্যায়িকাগুলি নানা কারণেই প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার বিষয়ে 'মহর্ষি ত্রিদশ সংবাদ' নামে আর একটি আখ্যায়িকা এই ;—

একদা মহর্ষিগণ ও দেবতাদিগের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হয় "অজ ছেদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য" শাস্ত্রে এই যে বিধি আছে—"অজ" বলিতে কি বুঝায় ;—

দেবতাদিগের মতে অজ ছাগশিশুকে নির্দ্দেশ করে। সুতরাং যজ্ঞে পশুবধ কর্ত্তব্য। মহর্ষিগণ বলেন, "বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, বীজ দ্বারাই যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, বীজের নামই অজ, অতএব যজ্ঞে ছাগপশু ছেদন কর্ত্তব্য নহে। এই নিয়ে দুই দলে যখন বিতণ্ডা চলিতেছে তখন ঘটনাক্রমে উপচর তথায় উপস্থিত হন। এই রাজা যাজ্ঞিক, দানশীল ও সর্বভূতের হিতানুষ্ঠানে তৎপর জানিয়া উভয় পক্ষ তাঁহাকে মধ্যস্থ মানিয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রমাণ। একদিকে দেবগণ ও অপরদিকে মহর্ষিগণ, রাজা বিষম সমস্যায় পড়িলেন, তখন এক বুদ্ধি স্থির

করিয়া নিজের মত দিবার পূর্বে কোন পক্ষের কি মত অগ্রে তাহা জানিতে চাহিলেন। তাঁহাদের দুই পক্ষের মত অবগত হওয়ার পর সমস্যা, 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি'। রাজা তাঁহার পুণ্যপ্রভাবে দেবতাদের প্রায় সমকক্ষ হইয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় তিনিও আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে সমর্থ, ফলতঃ এইজন্যই তাহার অপর নাম উপরিচর বসু। দেবতাদের সখ্যলাভ হইতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে তিনি তাঁহাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করিয়া ছাগপশু ছেদনের পক্ষে মত দিলেন। নিজের জীবনে আচরিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের জন্য মহর্ষিগণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। এই অভিসম্পাতবশতঃ তাঁহার অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। দেবতারা আশ্বাস দিয়া বলিলেন, তুমি **বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ** তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার শাপ মোচন করিবেন। মহর্ষিদিগের অভিসম্পাৎ ফলে উপরিচর বসুকে দীর্ঘকাল ভূগর্ভে গর্ত্তে বাস করিতে হইয়াছিল। অবশেষে নারায়ণ তাঁহার ভক্তকে উদ্ধার করিবার জন্য গরুড় পক্ষীকে প্রেরণ করেন। গরুড় তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে নিয়া যান। গরুড় বিষ্ণুর বাহন, সুতরাং এই উপাখ্যানমতে বিষ্ণু ও নারায়ণ এক দেবতা।

নারায়ণ ও তাঁহার অনুমোদিত ঐকান্তিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর একটি আখ্যান আছে, তাহা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাশ্রমী ও ভিক্ষুদিগের সিদ্ধিলাভের জন্য কোন্ দেবতার আরাধনা কর্ত্তব্য, লোক মুক্ত হইলে কোন্ স্থানে গমন করে, মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ, এই সকল তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন,—

স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে

অবতীর্ণ হইয়াছেন। (১) তাঁহাদিগের মধ্যে নর নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ইত্যবসরে নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন। নর নারায়ণকে তপোরত দেখিয়া তাঁহার মনে চিন্তার উদ্রেক হইল। ইঁহারা স্বয়ং **পরব্রহ্ম** স্বরূপ হইয়া আবার কোন দেবতার আরাধনা করিতেছেন। এই সংশয়ের কথা তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন করিলে নারায়ণ বলিলেন—"যিনি সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয় কার্য্যবিহীন, অচল, নিত্য; ইন্দ্রিয়, বিষয় ও সর্ব্বভূতের অতীত, পণ্ডিতরা যাঁহাকে সর্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, ব্যক্তভাবে যাহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই পরমাত্মাই আমাদিগের উৎপত্তির কারণ। আমরা তাঁহার পূজা করিতেছি। তিনি শ্বেতদ্বীপে আত্মামূর্ত্তিতে অবস্থিত রহিয়াছেন।"

নারদ নারায়ণ মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া আত্মামূর্ত্তি দর্শনাভিলাষে শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। তথায় বিশুদ্ধ সত্ত্বসম্পন্ন পুরুষ সকল বাস করেন। উঁহারা প্রাকৃতিক স্থূলদেহ-বিবর্জ্জিত, শব্দাদি বিষয়-ভোগ-শূন্য। পাপাত্মারা ইঁহাদিগের প্রতি তাকাইতেও পারে না, চক্ষু দগ্ধ হইয়া যায়। উহাদিগের মস্তক ছত্রাকার, অন্যান্য অবয়বেও মানুষ হইতে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে।

নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া নারায়ণের দর্শনাভিলাষে একান্ত-চিত্তে স্তব করিতে লাগিলেন। এই সুদীর্ঘ স্তবমালামধ্যে অন্যান্য মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন,—

"পঞ্চরাত্র বেদে তোমারই মহিমা কীর্ত্তিত আছে, তুমি বিশ্বেশ্বর, জগতের আদি কারণ ও প্রকৃতি, তুমি বিশ্বকর্ত্তা ও বিশ্বরূপী, তুমি

(১) এই আখ্যায়িকায় তাঁহাদের মাতা কে তাহার উল্লেখ নাই। বামন পুরাণের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে অহিংসার গর্ভে তাঁহাদের জন্ম। পিতা ধর্ম্ম মাতা অহিংসা তাঁহাদের সন্তান হইতে যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা অহিংসামূলক হওয়া স্বাভাবিক।

যজ্ঞ, তুমি চিত্রশিখণ্ডী, তুমি **বাসুদেব**, তুমি সমুদয় কার্য্যে প্রবৃত্ত, আবার সমুদয় হইতে নিবৃত্ত রহিয়াছ।”

নারায়ণ নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—**ঐকান্তিক ভক্তি** না থাকিলে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না, তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিপরায়ণ তাই আমাকে দেখিতে পাইলে। আমার এই মূর্ত্তি ধর্ম্মের ঘরে চারি অংশে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমি নিরন্তর সেই সকল মূর্ত্তির আরাধনা করিবে। ইহার পর তিনি তথাকার অধিবাসীদিগের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, ইহারা জিতেন্দ্রিয় ভক্ত, রজঃ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত, আহারবিহীন ও একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছে। আরো বলিলেন, যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন, ত্রিগুণাতীত, সর্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ অজ, নিত্য, নিরাকার, চতুর্ব্বিংশ তত্ত্বাতীত, সেই সনাতন পরমাত্মাকেই **বাসুদেব** বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। সমুদয় জগৎ সলিলে, সলিল জ্যোতিতে, জ্যোতি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ মনে, মন প্রকৃতিতে, প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে। সেই সনাতন পরব্রহ্ম কিছুতেই লীন হন না। ইহলোকে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় প্রাণীই অনিত্য, কেবল সেই সর্বভূতের আত্মভূত **বাসুদেবই** নিত্য।

পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ, এই পঞ্চভূত একত্র হইয়া শরীররূপে পরিণত হয়, শরীর উৎপন্ন হইলে জীব কর্ত্তৃক এই শরীরস্থ বায়ু সঞ্চালিত হইতে থাকে। এই জন্য জীবাত্মা শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। এই জীবাত্মাকেই ভগবান্ অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। এই সঙ্কর্ষণাখ্য জীব হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। তিনি সর্বভূতের মনঃস্বরূপ। এই প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়।

তিনি সর্বভূতের অহঙ্কারস্বরূপ। তাঁহা হইতে কর্ত্তা কারণ ও স্থাবর জঙ্গম পরিপূর্ণ সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়।

বাসুদেবই যজ্ঞ। ব্রহ্মা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক তাঁহারই আরাধনা করিয়াছিলেন। বেদশাস্ত্রে তিনিই হিরণ্যগর্ভ। স্বর্গে সহস্র যুগ অতীত হইলে পুনরায় এই জগৎ সংহার পূর্ব্বক স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করিবেন। পুনর্বার তাঁহার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হইবে।

এই সকল উপদেশ শ্রবণান্তর নারদ শ্বেতদ্বীপ হইতে বদরিকাশ্রমে নর নারায়ণ নিকট গমন করেন। তাঁহাদিগকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন,—

আমি শ্বেতদ্বীপে **অব্যক্তরূপী** নারায়ণকে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়াছি এখানে **ব্যক্তরূপী** আপনাদিগকেও সেই সমুদয় লক্ষণসম্পন্ন দেখিতেছি। উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, তুমি শ্বেতদ্বীপে **অনিরুদ্ধ** মূর্ত্তিতে অবস্থিত নারায়ণকে দেখিয়াছ। সেই অব্যক্তপ্রভব নারায়ণকে দর্শন করা নিতান্ত দুষ্কর। আমরা দুইজন ব্যতিরেকে সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন, অপর কেহই তথায় গমন করিতে পারে না। তোমার ঐকান্তিক ভক্তিপ্রযুক্ত তিনি স্বয়ং তোমাকে আপনার মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বরূপতঃ তিনিই সনাতন পরমাত্মা। পাপপুণ্যবিবর্জ্জিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ পরিণামে তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়। সেই সর্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া রস সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে, রূপাত্মক তেজ তাঁহা হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, সূর্য্যদেব সেই তেজ লাভ করিয়া প্রভা বিস্তার করিতেছে, সমীরণ তাহা হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে, শব্দ তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্যবস্তু দ্বারা অনাবৃত রহিয়াছে। সর্ব-

ভূতগত মন তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে প্রকাশশীল করিতেছে। পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করতঃ আদিত্য কর্ত্তৃক দগ্ধদেহ ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপর মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে, এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ **বাসুদেবে** প্রবেশ করিয়া থাকে। বাসুদেবই পরমাত্মা, সকল আত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার। জীবরূপ সঙ্কর্ষণ, মনঃরূপী প্রদ্যুম্ন, অহঙ্কাররূপী অনিরুদ্ধ, ইহারা তাঁহারই এক একটি ব্যূহ বা প্রতিমূর্ত্তি (১)।

সৃষ্টির এইরূপ ক্রমবর্ণনান্তর বলা হইয়াছে, সপ্তম মনুর যুগে এই গুহ্যাতিগুহ্য ধর্ম্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। ভূভার হরণের জন্য তিনি যুগে যুগে নানা অবতারে অবতীর্ণ হইবেন, এবং

(১) এ সম্বন্ধে (Dr. Grearson) ডাঃ গ্রিয়ার্সন—

The Bhagabat Basudev in the act of creation produces from himself not only prokriti, the indiscrete primal matter of the Samkhyas, but also a Vyuha or phase of conditioned spirit called *Sankarsan*. From the combination of Sankarsan and Prakriti spring Manas, corresponding to the Samkhya Buddhi or intelligence, and also a secondary phase of conditioned spirit called *Prodyumna*. From the association of Prodyumna with Manas spring the Samkhya Ahamkara, or consciousness, and also a tertiary phase of conditioned spirit known as *Aniruddha*. From the association of Aniruddha with Ahamkara spring the Samkhya *Mahabhutas* or elements with their qualities, and also Brahma who from the elements fashions the Earth and all that it contains.

Indian Ant 1908 p. 261.

পরিশেষে মথুরাতে কংশ ও অন্যান্য দানবদিগকে বিনাশ করিয়া দ্বারকাতে নিজের বসতি স্থাপন করিবেন, এবং তথায় আপন ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্র সঙ্কর্ষণ প্রত্যুম্ন অনিরুদ্ধের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ম্মূর্ত্তির কার্য্যসকল সম্পাদনান্তে সাত্বতগণসহ দ্বারকাপুরী ধ্বংস করতঃ ব্রহ্ম-লোকে গমন করিবেন।

পূর্বোল্লিখিত বনপর্বের নারায়ণ আখ্যায়িকামতেও ঋষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয় জনার্দ্দনই সেই প্রলয় জলধিজলে ভাসমান নারায়ণ। কৃষ্ণের অপর নাম জনার্দ্দন।

মহাভারত বনপর্বে বর্ণনা আছে জনার্দ্দন অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "তুমি নর আমি হরিনারায়ণ। আমরা নর নারায়ণ ঋষি যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়াছি।"

এই পর্বের ৩০ অধ্যায়ে শিব অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"পূর্বজন্মে তুমি নর ছিলে, নারায়ণ তোমার সঙ্গী ছিলেন, তোমরা এক যোগে সহস্র সহস্র বৎসর বদরিকাতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে।"

উদ্যোগপর্বে (৪৯ অ ১৯) উল্লেখ আছে " এরূপ জনশ্রুতি যে, বাসুদেব ও অর্জ্জুন পুরাকালে নর নারায়ণ দেবতা ছিলেন।"

বিষ্ণু ও নারায়ণের মধ্যে যোগসূত্রের বিষয় পূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই আখ্যায়িকাগুলির মধ্য দিয়া নারায়ণ, বাসুদেব ও কৃষ্ণ মধ্যে ঐ যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণ ।

পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে এই কয়টি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে ;—

(১) প্রথম মনুর (স্বায়ম্ভুব) আবির্ভাব কালে নারায়ণের অভিপ্রায়ানুসারে, এবং দেবী সরস্বতীর অনুকম্পায় এই মনু এবং চিত্র শিখণ্ডিন্ নামক সাতজন ঋষি শব্দ অর্থ ও হেতুগর্ভমূলক এবং লক্ষশ্লোকাত্মক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা নারায়ণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয়। ইহা অহিংসামূলক শাশ্বত সনাতন **ঐকান্তিক** ধর্ম্ম নামে খ্যাত।

(২) কল্পান্তে এক এক মনুর আবির্ভাব কালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম প্রকাশিত হয় ও পুনর্বার যথাকালে অন্তর্হিত হয়।

(৩) বর্ত্তমান যুগে সপ্তম মনুর আবির্ভাব কালে নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার সৃষ্টি হইলে নারায়ণ তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বানকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তদনন্তর ত্রেতা-যুগের আরম্ভে বিবস্বান মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্ম্ম অর্পণ করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে ইহা প্রচার করেন। এই গুহ্যাতিগুহ্য ধর্ম্ম সপ্তম মনুর যুগে সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে।

(৪) উপরিচর সত্যযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি যে পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অনুযায়ী বিষ্ণুর অর্চ্চনা ও অহিংসামূলক যজ্ঞ করেন তাহা সূর্য্যমুখনিঃসৃত।

(৫) যে নারায়ণ কর্ত্তৃক এই ধর্ম্মের প্রকাশ তিনি ক্ষীরোদ সাগরের উত্তরদিকে শ্বেতদ্বীপ নামক স্থানে অবস্থান করেন।

(৬) স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে নর নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপোমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি করেন।

(৭) নারদ বদরিকাশ্রমে তাঁহাদের নিকট হইতে শ্বেতদ্বীপস্থ আদি নারায়ণের বিষয় অবগত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি সেই আদি নারায়ণের নিকট হইতে পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণ অবগত হন। নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ নামে তাঁহার ধরাধামে চারি অংশে অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদও নারায়ণ তাঁহাকে প্রদান করেন।

(৮) অন্যান্য স্তবের সঙ্গে নারদ নারায়ণকে "তুমি বাসুদেব" এরূপ বলেন। নারায়ণও নারদকে উপদেশ দেন 'বাসুদেবই পরমাত্মা, সকল আত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার। এই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে গিয়া তিনি চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা করেন। আরো বলেন ভূ-ভার হরণের জন্য তিনি যুগে যুগে নানা অবতারে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরিশেষে মথুরাতে কংস প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া দ্বারকাতে নিজের বসতি স্থাপন করিবেন, এবং নিজের ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্রের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ব্যূহ মূর্ত্তির কার্য্য সকল সম্পাদনান্তে দ্বারকাপুরী ধ্বংস করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

(৯) পঞ্চরাত্রসম্মত এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম হরিগীতাতে পূর্ব্বে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) মহাপ্রলয়ে বিশ্ব জলধিজলে নিমগ্ন হইলে বালকরূপী নারায়ণ ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখার আশ্রয়ে ভাসমান অবস্থায় অবস্থান করেন।

এই সকল বর্ণনার মূলে কি তত্ত্ব রহিয়াছে—এইক্ষণে আমরা তাহার সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

উপরিচর বসু কর্তৃক সর্বপ্রথম এই পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম অনুযায়ী যজ্ঞাদিকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, এবং তাঁহার লোকান্তর গমনের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্তর্হিত হয়। উপরিচর সত্যযুগে স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতি হইতে এই ধর্ম্ম লাভ করেন। চিত্র শিখণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ঋষির নিকট নারায়ণ প্রথম এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন। বৃহস্পতি তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন, এবং উপরিচরকে তাহা দান করেন। উপরিচর সংক্রান্ত অপর একটি আখ্যায়িকায় বলা হইয়াছে বৃহস্পতির পৌরোহিত্বে তিনি অহিংসাপরায়ণ হইয়া পশুবধের পরিবর্ত্তে পৃথিবীজাত ব্রীহি ইত্যাদি শষ্যদ্বারা যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করেন এবং কেবলমাত্র উপচরকেই দেখা দেন, যজ্ঞের পুরোহিত বৃহস্পতি কিম্বা অপর কেহই তাঁহাকে দেখিতে পান না। এই আখ্যায়িকায়ও সত্যযুগে এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবার কথা উল্লিখিত আছে। চিত্রশিখণ্ডিগণ স্বায়ম্ভুব মনুর সমসাময়িক, তাঁহারা বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বুঝা যায় ইহা প্রথম মনুর অধিকার কালের ঘটনা। নারদ ব্যাসের নিকট এই ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করেন তাহাতে বলা হইয়াছে এক এক ব্রহ্মার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্ম প্রকাশ পাইয়া আবার লুপ্ত হয়। সর্ব্বশেষে সপ্তমবার নারায়ণের নাভিমূল হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলে নারায়ণ পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন, এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোকমধ্যে ইহা প্রচার করেন এবং অদ্যাপি (অর্থাৎ মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩৪৯ অধ্যায় রচনার সময়) ইহা বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ত্রেতাযুগ যে বর্ত্তমান মন্বন্তরের ত্রেতাযুগ তাহা সুস্পষ্ট।

ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তিনি তথায় একজন প্রবল পরাক্রমশালী সামন্ত নরপতি। এবং এই ধর্ম্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকার কথা উল্লিখিত আছে। সাত্বতগণ যদুবংশের এক শাখা। এই শাখাতেই শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাভারতে দ্রৌপদী সুভদ্রাকে সাত্বত কুমারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন আরো অনেকস্থানে তাঁহাদিগকে সাত্বত বলা হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথম মনুর আবির্ভাব কালে সত্যযুগে এই ধর্ম্ম একবার প্রকাশিত হইয়া রাজা উপচরের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়াছিল। তদনন্তর প্রত্যেক মনুর অধিকার কালে এক একবার আবির্ভূত ও তিরোহিত হওয়ার পর অবশেষে সপ্তম মনুর সময় ত্রেতাযুগে ইহা প্রকাশিত হইয়া দ্বাপরে সাত্বতদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকে।

আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতি কল্পান্তে নারায়ণের মুখ চক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিয়া এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন; কিন্তু স্বায়ম্ভুব মনুর সময় ইহার ব্যত্যয় দেখা যায়। এইবার স্বয়ং নারায়ণের অভিপ্রায়ে দেবী সরস্বতীর অনুকম্পায় চিত্রশিখণ্ডী নামধেয় ঋষিদিগের মধ্যে এই ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদে যে সাতজন ঋষির উল্লেখ আছে তাঁহাদের মধ্যে অত্রি ও বশিষ্ঠ ভিন্ন আর সকলই এই চিত্রশিখণ্ডিগণ হইতে স্বতন্ত্র। ঋগ্বেদের ঋষিরা মনুর সন্তান, চিত্রশিখণ্ডিগণ ব্রহ্মার মানস পুত্র।

আর একটি প্রণিধানের বিষয়, রাজা উপরিচরের যজ্ঞে যাঁহারা সদস্য ছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে দ্বিত, ত্রিত, কণ্ব, ও মেধাতিথি ঋগ্বেদের ঋষি। তাঁহারাও সমসাময়িক ঋষি নহেন। ত্রিত অতি প্রাচীন যুগের ঋষি। ঋগ্বেদের ন্যায় ইরাণীয়দিগের আবেস্তা গ্রন্থেও এই ঋষির উল্লেখ রহিয়াছে। তাণ্ড ও তৈত্তিরি ঋগ্বেদ রচনার পরবর্ত্তীকাল ব্রাহ্মণযুগের ঋষি। একত দ্বিত ও ত্রিত আপনা-

দিগকে ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়াছেন। দ্বিত ত্রিত ঋগ্বেদের ঋষি বটেন, কিন্তু উপরিচর সত্যযুগের লোক। ব্রাহ্মণযুগের তাণ্ড ও তৈত্তিরি উপরিচরের যজ্ঞে সদস্য পদে বৃত হওয়া সম্ভবপর মনে হয় না। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে এরূপ অসামঞ্জস্য অনেক রহিয়াছে।

বহুকাল তপশ্চরণ করিতে করিতে একেবারে তদ্গতচিত্ত হইতে না পারিলে নারায়ণের দর্শনলাভ হইতে পারে না ;— এই তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একত, দ্বিত ও ত্রিতের আখ্যায়িকা। এই আখ্যায়িকা মতে ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তরদিকে শ্বেতদ্বীপ নামক প্রভাসম্পন্ন স্থানে নারায়ণের আবির্ভাব রহিয়াছে। এই ক্ষীরোদ-সাগর সুমেরু পর্বতের উত্তরে অবস্থিত। ঋষিত্রয় সুমেরুর উত্তর প্রদেশে গমনপূর্বক এক পায়ে দাঁড়াইয়া কাষ্ঠবৎ অচলভাবে সহস্র বৎসর সমাহিতচিত্তে কঠোর তপস্যা করেন এবং তদনন্তর শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, কিন্তু নারায়ণের দর্শনলাভ হইল না।

নারায়ণ সম্বন্ধে অপর এক আখ্যায়িকা।

স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে অহিংসার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নর-নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন। ইত্যবসরে নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দর্শন করেন। ইঁহারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া আবার কাঁহার আরাধনা করিতেছেন, কৌতূহলপরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ নারায়ণ আত্মামূর্ত্তিতে শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত রহিয়াছেন এইরূপ জানিতে

পারেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাষে তথায় গমন করেন ও একান্ত-চিত্তে তাঁহার স্তব করেন। নারদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া নারায়ণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলেন একান্ত ভক্তি না থাকিলে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তথাকার অধিবাসীদিগকে উল্লেখ করিয়া বলেন, তাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, আহারবিহীন ও একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিরন্তর তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। অধিকন্তু নারদ তথায় তাঁহার নিকট হইতে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব অবগত হয়েন। নারদ তথা হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে নরনারায়ণ এই চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের আরো বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন;— বাসুদেবই পরমাত্মা, সকল আত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার, জীবরূপ সঙ্কর্ষণ, মনঃরূপী প্রদ্যুম্ন, অহঙ্কাররূপী অনিরুদ্ধ, ইঁহারা তাঁহার এক একটি ব্যূহ বা প্রতিমূর্ত্তি। আরো বলেন, সপ্তম মনুর যুগে এই গুহ্যাতিগুহ্য ধর্ম্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে। ভূভার হরণের জন্য নারায়ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন এবং অবশেষে দ্বারকাতে আপন ভ্রাতা পুত্র পৌত্র, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধের মধ্য দিয়া চতুর্ম্মূর্ত্তি প্রকটকরতঃ নিজের কার্য্যসকল সম্পাদন পূর্বক সাত্বতগণসহ দ্বারকাপুরী ধ্বংশ করিয়া ব্রহ্মালোকে গমন করিবেন।

উভয় আখ্যায়িকামতেই ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন নারায়ণের দর্শন লাভ হয় না। অধিকন্তু এই ধর্ম্ম অহিংসামূলক। উপরিচর পশুবধের পরিবর্ত্তে পৃথিবীজাত শস্যাদি দ্বারা যজ্ঞভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আখ্যানে নারায়ণের চারি অংশে অবতীর্ণ হওয়ার এবং চতুর্ব্যূহতত্ত্বের কোন উল্লেখ নাই। ইহাও লক্ষ্যের বিষয় যে, হরিগীতায় সংক্ষেপে ঐকান্তিক ধর্ম্মের বর্ণনা আছে বলা হইয়াছে, কিন্তু গীতাতে প্রকাশ্যতঃ এই সকল কথার কোন উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। মহাভারতে বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলি গীতার পরবর্ত্তী-

কালের রচনা এরূপ বুঝা যায়। ইহাদিগের মধ্যেও উপরিচর বসুর আখ্যায়িকা রচনার সময় পঞ্চরাত্র ধর্ম্ম যে বাহ্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান পরিশূন্য অবস্থা লাভান্তে নারায়ণে ঐকান্তিক ভক্তিসম্পন্ন ধর্ম্ম ছিল এরূপ বুঝা যায়। এই নারায়ণ শ্বেতদ্বীপে অবস্থিত নারায়ণ ছিলেন; তখন পর্য্যন্ত তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার কল্পনা হয় নাই। বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণরূপে তাঁহার দুই অংশের তপোমগ্ন অবস্থায় অবস্থিতি পরবর্ত্তীকালের ঘটনা।

আর একটী কথা, নারায়ণ—নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইলেন। মহাভারতের কোন স্থানেই তাঁহার হরি ও কৃষ্ণ এই দুই অবতারের কোন কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায় না। অবশ্য এক স্থানে "হরিগীতা" নামোল্লেখ আছে। কিন্তু এই হরি সেই হরি নহেন। পরন্তু যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে গীতার উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ ও হরিগীতার হরি একই ব্যক্তি বটেন, কিন্তু তিনি যে অহিংসার গর্ভজাত নারায়ণের অংশাবতার কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, মহাভারতে বর্ণিত আখ্যায়িকা হইতে তাহা বুঝা যায়।

বনপর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তুমি নর আমি হরিনারায়ণ, আমরা নরনারায়ণ ঋষি যথাসময়ে অবতীর্ণ হইয়াছি"। গীতাতেও এই উক্তির আভাস রহিয়াছে।

ঐ পর্বের ত্রিংশ অধ্যায়ে শিব অর্জ্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন, "পূর্বজন্মে তুমি নর ছিলে নারায়ণ তোমার সঙ্গী ছিলেন, তোমরা একযোগে সহস্র সহস্র বৎসর বদরিকাতে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলে।"

যে নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথম মনুর অধিকারকালে বর্ত্তমান ছিলেম, গীতার কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সপ্তম মনুর অধিকারকালে জন্মগ্রহণ করেন। এই সকল উক্তিতে বলা হইয়াছে সেই বদরিকাশ্রমের নরনারায়ণ অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে

অবতীর্ণ হইয়াছেন, সুতরাং এই কৃষ্ণ স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালে ধর্ম্মের গৃহে অহিংসার গর্ভে আবির্ভূত কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র কৃষ্ণ।

গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"**বাসুদেব সর্ব্বমিতি**"।

নারদ শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের উদ্দেশ্যে যে সকল স্তুতিবাক্যের প্রয়োগ করেন, তন্মধ্যে "তুমি বাসুদেব" এই উক্তিও রহিয়াছে। নারায়ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাতে বলা হইয়াছে, যিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দবিহীন, ত্রিগুণাতীত, সর্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ, অজ, নিত্য, নিরাকার চতুর্বিংশ তত্ত্বাতীত, সেই সনাতন পরমাত্মা বাসুদেব। তাহা হইতে এই জগতের প্রকাশ, এবং তিনিই পুনরায় এই জগৎ সংহারপূর্বক স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবকে শরীরস্থ করিয়া একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত বিহার করেন এবং পুনরায় তাঁহার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়। বনপর্বের ১৮৮ ও ১৮৯ অধ্যায়ে প্রলয়-জলধিজলে ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা আশ্রয়ে ভাসমান যে একটী বালকের উল্লেখ আছে—যিনি মুখব্যাদন করিলে মার্কণ্ডেয় মুনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া সেই মুখবিবরে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন—সেই বালক বাসুদেব। এই প্রলয় জলধির বর্ণনা পূর্বোল্লিখিত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২ সূক্তের ৫ম ও ৬ষ্ঠ ঋকে বর্ণিত অজাতপুরুষের অবস্থান বিষয়ের যে উল্লেখ তাহার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

রাজা উপরিচর সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, স্বয়ং অহিংসামূলক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাদিগের প্রতি পক্ষপাত-বশতঃ তিনি পশুছেদনের পক্ষে মত দেন। মহাভারতের আদিপর্বের ৬৩ অধ্যায়ে উপরিচর পুরুবংশীয় চেদিদেশের রাজা এরূপ বর্ণনা আছে। পুরু, তুর্বাসা, যদু, দ্রুহ্যু ও অনু ইঁহারা মহাভারতমতে যযাতির সন্তান। তন্মধ্যে পুরু সর্বকনিষ্ঠ। গুরু শুক্রাচার্যের অভিসম্পাতে রাজা যযাতি অকালে বার্দ্ধক্যদশা

প্রাপ্ত হইলে পুত্রদিগের নিকট তাঁহাদের যৌবন প্রার্থনা করেন। জ্যেষ্ঠপুত্রদিগের মধ্যে কেহই তাঁহাব প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন না। কনিষ্ঠ পুরু পিতাকে নিজের যৌবন অর্পণ করেন। যযাতি অপর সকল পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তদবধি যদু প্রভৃতি অপর পুত্রদিগের বংশধরগণ সমাজে অপেক্ষাকৃত লঘুস্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ক্ষত্রিয়সমাজে তাঁহাদের স্থানও পুরু-বংশীয়দিগের নীচে নির্দ্দিষ্ট হয়। উপরিচর পুরুবংশীয় নরপতি ছিলেন। তিনি অহিংসামূলক ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও তাহা ত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞে পশুছেদনের পক্ষে মত দিয়া দেবতাদিগের প্রীতি-ভাজন হন। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য কি ? এবং ইহার সহিত যযাতির উপাখ্যানের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা বিবেচনার বিষয়। তুর্বাসা, যদু, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু এই সকল শাখার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ ঋগ্বেদের নানাস্থানে রহিয়াছে। সপ্তসিন্ধু প্রদেশে অবস্থান কালে আর্য্যগণ প্রধানতঃ পাঁচক্ষিতি বা জনপদে বিভক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে তুর্বাসা ও যদুবংশীয়েরা এক জনপদ, অনু ও দ্রুহ্যু এক জনপদ এবং পুরুবংশীয়েরা তৃতীয় জনপদবাসী, ত্রিৎসু ও ভরত-বংশীয়েরা অপর দুই জনপদের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহাদিগকে পঞ্চকৃষ্টিও বলা হইত। সর্ব বিষয়ে তাঁহারা একই ভাবাপন্ন ছিলেন। যজ্ঞ তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। সেজন্য তাঁহাদিগকে "জনাঃ পঞ্চ যজ্ঞাঃ"ও বলা হইত।

যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের যে সকল বিধি ছিল, তাহা যাহাতে যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল। ত্রিৎসু শাখা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিপত্তিশালী ছিল। আচার অনুষ্ঠানের কোথাও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে নির্ম্মমভাবে তাহার প্রতিকার করিতে তাঁহারা কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিতেন না। ত্রিৎসুশাখার রাজা দিবোদাস প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবনই এইরূপ আচারভ্রষ্টদিগের সহিত

যুদ্ধ করিতে করিতে কাটিয়া ছিল। তুর্বাসা ও যদুশাখার লোকেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। তাঁহার পরবর্ত্তী রাজা সুদাসের সঙ্গে যুদ্ধে দ্রুহ্যু ও অনুবংশীয়েরাও একপ্রকার সমূলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। যজ্ঞে পশুবধ আর্য্যদিগের এক চিরন্তন প্রথা ছিল। ত্রিৎসু ও ভরতবংশীয়েরা ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে প্রধান ও সমধিক প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। যযাতি-বংশীয়েরা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালের আগন্তুক। তন্মধ্যে পুরুশাখার রাজা উপরিচর যখন অহিংসামূলক যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করেন, সম্ভবতঃ এই তিন শাখাই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দারা গোড়া সনাতন পন্থীদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ পুরুবংশীয়েরা চাপে পড়িয়া পুনর্বার প্রাচীনমতের অনুবর্ত্তন করেন। অপর দুই শাখার লোকেরা কিছুতেই তাহাদের অনুকরণ করিতে সম্মত হন না। এবং ইহা আশ্চর্য্য নহে যে তুর্বাসা ও যদুশাখার লোকগণ বরং যুদ্ধ করিয়া পরাভূত হইলে দেশ ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে রাজি হইলেন তথাপি তাঁহাদের অহিংসামূলক ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। দেখা যায় বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা আর্য্যসমাজ হইতে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিলেন। কালসহকারে আর্য্যদিগের সমাজের এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে, তখন ইন্দ্রের অধিনায়কত্বে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার অভিষেক করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনা হয়। ঋগ্বেদে নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্র হইতে তাহা বুঝা যায়।

যথা—

"যজ্ঞপতি ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্বসু ও যদুবংশীয়দিগকে অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন।" (৪-৩০-১৭)

"যে ইন্দ্র উত্তমনীতি অবলম্বনক্রমে তুর্বসু ও যদুকে দূরদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র যেন আমাদের সখা হন।"

"য আনয়ৎ পরাবতঃ স্থনীতী তুর্বশং যদুং
ইংদ্রঃ স নো যুবা সখা ॥" ৬-৪৫-১

যযাতির উপাখ্যানে পুরুর অভ্যুদয় এবং তুর্বাসা যদু প্রভৃতি অপর সন্তানদিগের নির্য্যাতনের যে কাহিনী তাহার সহিত এই সকল ঘটনার সংশ্রব থাকা বিচিত্র নহে।

সাত্বতগণ যাদবদিগেরই এক শাখা। শ্রীকৃষ্ণ এই শাখাতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাগবতে (১০ম ৫৮-৪২) তাঁহাকে সাত্বতার্ষভ বলা হইয়াছে।

নারায়ণী উপাখ্যানে সপ্তম মনুর অধিকারকালে এই ধর্ম্ম ত্রেতাযুগে প্রকাশিত হইয়া অবশেষে সাত্বতদিগেরমধ্যে আবদ্ধ থাকিবার যে উক্তি তাহার ইহাই তত্ত্ব।

নারায়ণ শ্বেতদ্বীপে আবির্ভূত রহিয়াছেন এই উক্তির তাৎপর্য্য কি? এই শ্বেতদ্বীপই বা কোথায়?

কথা-সরিৎসাগরে (৫৪-১৯,২১,২৩) এক গল্প আছে। নরবাহন দত্ত নামক কোন ব্যক্তি দেব-সিদ্ধি-প্রভাবে শ্বেতদ্বীপে উপনীত হন এবং তথায় হরি শেষনাগের উপর শায়িত রহিয়াছেন এবং নারদ ও অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার চরণ সেবায় নিমগ্ন রহিয়াছেন দেখিতে পান।

হরিবংশে (১৪-৩৮৪) উক্ত হইয়াছে, মোক্ষাভিলাষী যোগী ও কপিল সাংখ্যরা বলি রচিত স্তব ও প্রার্থনা উচ্চারণ করিতে করিতে শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া থাকেন।

এই সকল হইতে ডাঃ ভাণ্ডারকার মন্তব্য করেন ;—

"Evidently, therefore, Svetadwipa or the white island is the heaven in which Narayana, spoken of sometime as Hari, dwells. It corresponds to the Vaikuntha of Vishnu, the Kailash of Siva, and the

Golaka of Gopalkrishna"; and to that heaven of Narayana it was that Narada went and saw him and learned from him the monotheistic religion of Vasudeva. There is therefore no need to suppose that the white island was a Christian country peopled by white races.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শ্বেতদ্বীপকে য়ুরোপের অন্তর্গত কোন স্থান এরূপ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

ডাঃ ভাণ্ডারকারের মতে ইহা বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠ, শিবের কৈলাস ও গোপালকৃষ্ণের গোলকের ন্যায় কোন কল্পিত স্থান হইবে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা কোন স্থান হওয়া বিচিত্র নহে।

আখ্যায়িকা মতে—

শ্বেতদ্বীপ ক্ষীরোদ সাগরের পর পারে অবস্থিত। আকাশমার্গে সূর্য্যরশ্মিতে অবস্থিত বাষ্পরাশিকে সমুদ্ররূপে কল্পনা করা এবং এই বাষ্প হইতে উৎপন্ন বারিধারাকে ক্ষীর, মধু ইত্যাদি নামে অভিহিত করার অনেক দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদে রহিয়াছে। এই বাষ্পরূপী আকাশ স্বর্গে অবস্থিত, সমুদ্রের উপরে ভাসমান সূর্য্যমণ্ডল এই শ্বেতদ্বীপ কিনা তাহা বিবেচনার বিষয়। মহাভারতের যে স্থানেই সূর্য্যের প্রসঙ্গ, তথায়ই ইহা নারায়ণের ভূমি এরূপ বর্ণনা আছে (যথা শান্তিপর্ব্বের ৩৬৩ অঃ)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গায়ত্রীতত্ত্বের যে ব্যাখ্যা আছে তাহা হইতে বুঝা যায় এই মন্ত্রের ধ্যান ও জপের দেবতা, স্বরূপে আদিত্য মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণ। ইহার পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণে বলা হইয়াছে, অগ্নি গায়ত্রীর মুখ। অগ্নি যেমন কাষ্ঠ-খণ্ডকে নিঃশেষে দগ্ধ করে সেইরূপ গায়ত্রী-বিজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষেরও

সকল পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। এইরূপ বিজ্ঞানবান্ পুরুষ দেহান্ত-কাল উপস্থিত হইলে প্রার্থনা করিবেন—

"হে পূষণ! তোমার যে সমুজ্জ্বল তেজোমণ্ডলরূপ পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহা অপসারণ কর, যেহেতু সেই সত্যই আমার একমাত্র ধর্ম্ম, আমি যেন সেই সত্যকে দর্শন করিতে পারি। হে পূষণ! হে একর্ষি! হে যম! হে সূর্য্য! হে প্রাজাপত্য! তোমার রশ্মি সরাইয়া লও, তোমার তেজ সঙ্কুচিত কর। তোমার অতিশয় কল্যাণময় যে রূপ সেই রূপটি দর্শন করি।" যিনি এই পুরুষ আমিও তাহাই।(১)

এই মন্ত্রের পূষণ একর্ষি যম প্রভৃতি সকলই সূর্য্যের প্রতিশব্দ, তিনি জগতের পোষণ কর্ত্তা, তিনি জগদ্বাসীর চক্ষুর অনুগ্রাহক দেবতা সমস্ত জগতের প্রাণ ও চক্ষুস্বরূপ হইয়া সব দেখেন, তিনি সমস্ত জগতের সংযমন কর্ত্তা, তিনি জগতের রস রশ্মি ও প্রাণের নিয়ামক, ও প্রজাপতি কর্ত্তৃক জগৎ প্রকাশ ব্যাপারে তিনিই প্রথম সৃষ্টি এবং প্রজাপতির প্রথম সন্তান।

হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সূর্য্যের অত্যুগ্র তেজোমণ্ডলকে নির্দ্দেশ করিতেছে। এই তেজ রজোগুণ সমুদ্ভূত আদিত্য মণ্ডলের জড়-পিণ্ডের তেজ। ঋষি অন্যত্র গায়ত্রীকে চারিপদ বিশিষ্টা বলিয়াছেন এবং চতুর্থ পদকে "পরোরজা" পদ নাম দিয়াছেন এবং ইনি রজোগণ সমুদ্ভূত এই সমস্ত জগতের উপরে অধিপতিরূপে অবস্থান করতঃ তাপ দিতেছেন এরূপ বলিয়াছেন। এই পদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছেন।

ঋষি এই পদকে পুরুষ আখ্যা দিয়াছেন—তিনি সেই পুরুষ যিনি আদিত্যমণ্ডলের পশ্চাতে থাকিয়া ইহাকে তাপ প্রদান

(১) "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং, তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু, সত্য ধর্ম্মায়, দৃষ্টয়ে, পুষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং, তত্তে পশ্যামি।" (যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি) এই সম্বন্ধে "ওঙ্কার ও গায়ত্রীতত্ত্ব" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

করিতেছেন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পুরুষই আদিত্য-মণ্ডলে অবস্থিত নারায়ণ। একত দ্বিত ত্রিতের শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ-মাত্রই চক্ষু অন্ধ হইবার যে উল্লেখ আছে তাহা সূর্য্যের প্রখর তেজকে নির্দ্দেশ করে। নারদের শ্বেতদ্বীপে গমনের আখ্যানের মূল ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে সূর্য্য সম্বন্ধে আর একটি আখ্যানের বর্ণনা এরূপ মনে হয়। ইহা মাধুবিদ্যা বিষয়ক। তথায় বলা হইয়াছে সূর্য্যদেব প্রাণীগণের প্রতি ভোগ সাধনকার্য্য সম্পাদনের পর তদূর্দ্ধগত হইয়া যে উদিত হইলেন আর তিনি উদিতও হন না অস্তও যান না। একাকী আপনি আপনাতে অবস্থিতি করেন। এই উদয়াস্ত বিবর্জ্জিত লোক ব্রহ্মলোক।

দিবারাত্রি হইতে আয়ুক্ষয়ের হেতু কালের উদ্ভব হয়। যেখানে সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই সেখানে দিবারাত্রিও নাই। সুতরাং তদ্দেশবাসীগণের আয়ুক্ষয়েরও কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা ঠিক কিনা তাহা জানিবার জন্য শ্রুতি বলিতেছেন কোন যোগী পুরুষ এক মন্ত্র বলে ব্রহ্মলোক দর্শন করিয়া তথা হইতে প্রত্যাগমনের পর অপর কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন নিশ্চয়ই সেখানে দিবারাত্রি নাই, সূর্য্য কখনও অস্তমিত হন না বা কোন স্থান হইতে কখনও উদিতও হন না। এই আখ্যায়িকাটি ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসা-সূচক, ব্রহ্মবিদের উদ্দেশ্যে সর্বদাই দিবালোক প্রকাশমান থাকে, কারণ তিনি নিজেই জ্যোতির্ম্ময় হন। সেই বিদ্বান পুরুষ উদয়াস্ত কালদ্বারা অপরিচ্ছেদ্য হইয়া নিত্য ও জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ হন। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্ যোগবলে ব্রহ্মলোক দর্শন করিয়া আসিয়া ঐ লোক সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। নারদ ঐকান্তিক ভক্তিপ্রভাবে নারায়ণের অধিষ্ঠান ভূমি শ্বেতদ্বীপে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আখ্যায়িকায় নারদ কর্ত্তৃক শ্বেতদ্বীপবাসী-দিগের বিষয়েও বর্ণনা আছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাসুদেব।

শ্বেতদ্বীপে নারায়ণ নারদকে যে উপদেশ দেন তাহার মর্ম্ম,—যিনি চতুর্বিংশ তত্ত্বাতীত অজ নিত্য নিরাকার সনাতন পরমাত্মা তিনি বাসুদেব। তথা হইতে বদরিকাশ্রমে প্রত্যাগত হইলে নর-নারায়ণ এই বাসুদেব তত্ত্বের আরো বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন পাপপুণ্য বিবর্জ্জিত মুমুক্ষু ব্যক্তিরা সর্বাগ্রে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করতঃ আদিত্য কর্ত্তৃক দগ্ধদেহ ও পরমাণু স্বরূপ হইয়া সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে তৎপর মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। এই বাসুদেবই পরমাত্মা—সকল আত্মার আশ্রয় ও সৃষ্টির মূলাধার।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোকে "বাসুদেবঃ সর্বমিতি" এই সমুদয় যাহা কিছু সবই বাসুদেব, এরূপ বলা হইয়াছে। ভগবান্ বলিতেছেন যে সকল সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার ভজনা করেন, তাঁহারা চতুর্বিধ, আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু (আত্মজ্ঞানেচ্ছু), অর্থার্থী (অভ্যুদয়াভিলাষী) এবং জ্ঞানী অর্থাৎ আত্মবিৎ ব্যক্তি। এই চারি শ্রেণীর ভজনাকারিদিগের মধ্যে নিত্যযুক্ত একভক্তি-বিশিষ্ট অর্থাৎ এক আমাতে অনুরক্ত তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, তিনি জানেন যাহা কিছু সমুদয়ই বাসুদেব।

এই গ্রন্থের ১০ম অধ্যায় যাহার নাম বিভূতিযোগ—তথায় অর্জ্জুন তাঁহার যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতির বিষয় বিস্তারিতভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে তিনি বলিলেন তাঁহার বিভূতির অন্ত

নাই, যাহা যাহা প্রধান তৎসমুদয় তাঁহার বিভূতির কলা মাত্র। যথা,—আদিত্যগণের মধ্যে তিনি বিষ্ণু, পুরোহিতদিগের মধ্যে বৃহস্পতি, বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দৈত্যদিগের মধ্যে প্রহ্লাদ, বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিদিগের মধ্যে তিনি বেদব্যাস ইত্যাদি। এখানে বাসুদেব শব্দদ্বারা যাদবদিগের বৃষ্ণিশাখায় আবির্ভূত নরবিশেষকে যে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা সুস্পষ্ট। সুতরাং বাসুদেব শব্দ যে দুই বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়।

পাণিনিকৃত ব্যাকরণের সন্ধি সমাসাদিতে দৃষ্টান্তস্বরূপ বাসুদেব যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনাদি শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ইহার ৪র্থ অধ্যায়ের ৩য় প্রকরণের ৯৮ সূত্র "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুন্"। পরবর্ত্তী নামধেয় ব্যক্তি পূর্বোক্ত ব্যক্তির অনুরক্ত ভক্ত এই অর্থে বুন্প্রত্যয়ের প্রয়োগ। ইহা হইতে বুঝা যায় অর্জ্জুন বাসুদেবের ভক্ত ছিলেন। পতঞ্জলিকৃত মহাভাষ্যে এখানে বাসুদেব অর্থে পূজার্হ স্বয়ং নারায়ণ, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। স্বামী মহাদেবানন্দগিরি তাঁহার রচিত "বৈদিকযুগে" ইহার অর্থ করিয়াছেন, ইন্দ্র সখা আঙ্গিরস কুৎস অর্জ্জুন। ইন্দ্রই বাসু বা বাসুদেব। পাণিনির সূত্রদ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্র কুৎসের সখ্যতা গ্রহণে দোষ হয় না। বসতি সর্বদেহে ইতি বাসু অথবা বাসয়তি ইতি বাসু।

পাণিনি কি অর্থে বাসুদেব শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং পতঞ্জলের ব্যাখ্যারই বা মর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইলে তাঁহাদের আবির্ভাব কাল জানা প্রয়োজন। পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণ বেদের অন্যতম অঙ্গ। বৈদিক সাহিত্যের ইহা প্রাচীনতম ব্যাকরণ। কাত্যায়ন অষ্টাধ্যায়ীর বার্ত্তিকা রচনা করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই বার্ত্তিকার উপর রচিত।

ডাঃ গোল্ডষ্টুকার মহাভাষ্যের আভ্যন্তরীন্ প্রমাণ হইতে খৃষ্ট জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্বে পতঞ্জলের সময় নিরূপণ করিয়াছেন,

অদ্যাপি এই মত খণ্ডিত হয় নাই। পতঞ্জল কাত্যায়নের বহু পরবর্ত্তী কালের লোক, কারণ দেখা যায় পতঞ্জলের সময় কাত্যায়নের বার্ত্তিকার অনেক টীকা হইয়াছে। টীকাকারগণ অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। পতঞ্জলের ভাষ্যে ইঁহাদিগের উল্লেখ রহিয়াছে। এই সব কারণে বার্ত্তিকা রচনার কাল মহাভাষ্য রচনার দুইশত বৎসর পূর্ববর্ত্তী এরূপ মনে করা অসঙ্গত নহে। কাত্যায়ন নন্দবংশের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন, ইহা সাধারণ অভিমত। অষ্টাধ্যায়ী ও বার্ত্তিকার ভাষাতে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। যে ভাষার উপর পাণিনির ব্যাকরণ রচিত তাহা বৈদিক ভাষার শেষ পরিণতাবস্থা। ডাঃ ভাণ্ডারকার ইহাকে মধ্য সংস্কৃত (Middle Sanskrit) আখ্যা দিয়াছেন। কাত্যায়নের সময়ের ভাষা শ্লোকের ভাষা (Classical Sanskrit)। পতঞ্জলের সময়ের ভাষা ও কাত্যায়নের সময়ের ভাষার মধ্যে পার্থক্য একপ্রকার নাই, থাকিলেও অতি সামান্য। অতঃপর ইহাই আদর্শ ভাষারূপে গৃহীত হইয়া আসিতেছে (১)।

পতঞ্জল মহাভাষ্যে পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকে বেদাঙ্গগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছেন এবং বেদপাঠের সঙ্গে এই ব্যাকরণ পাঠও অবশ্য কর্ত্তব্য এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,

---

(১) Paninis work contains the grammar of Middle Sanskrit, while Katyayana's that of Classical Sanskrit, though he gives his sanction to the archaic forms of the former on the principle, as he himself has stated, on which the authors of the sacrificial sutras teach the rituals of long sacrificial seasons, though they had ceased to be held in their time.

Patanjala gives but few forms, which differ from Katyayana's, and in no way do they indicate a different stage in the growth of the language ; hence this work is to be referred to the same period. The form which the language assumed at this time became the standard for later writers to

এবং যথোচিত ভাষার প্রয়োগ অভিষ্ট সিদ্ধিলাভের দ্বার এরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর প্রতি এরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ এবং ইহাকে প্রায় বেদের তুল্যাসন প্রদান এই সকল ও অন্যান্য কারণে পাণিনি কাত্যায়নেরও চারিশত বৎসর পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন, অর্থাৎ তিনি আটশত খৃঃ পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং যাস্কের নিরুক্ত রচনার কাল ইহার অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী, ডাক্তার ভাণ্ডারকার এরূপ মন্তব্য করেন।

পাণিনির সময় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারো কাহারো মতে তিনি ৫০০ খৃঃ পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রোঃ ম্যাক্ডোনেল মতে যাস্ক ৫০০ খৃঃ পূর্বে নিরুক্ত রচনা করেন, পাণিনি তাঁহার পরবর্ত্তী। বুলার (Buhler) মতে তিনি ৪০০ খৃঃ পূর্বের ও পরবর্ত্তী কালের লোক। তাঁহার যুক্তি আপস্তম্ভের ধর্ম্মসূত্র রচনার কাল ৪০০ খৃঃ পূর্ব এবং ইহার ভাষা পাণিনির ভাষা হইতে পুরাতন। কিন্তু আপস্তম্ভ যে চারি শত খৃঃ পূর্বের লোক হইতে পারেন না সে সম্বন্ধে কোন যুক্তি প্রদর্শন করা হয় নাই। যাস্ক যে ৫০০ খৃঃ পূর্বের পরিবর্ত্তে তৎপূর্ববর্ত্তী

---

follow, and Katyayana and Patanjala are now generally acknowledged authorities on all points concerning the correctness of Sanskrit speech.

Wilson's Philological Lectures—1 Development of Language.

ডাঃ ভাণ্ডারকার মতে সংস্কৃত ভাষা রচনার বিভিন্ন কাল বা অবস্থা এইরূপ :—

প্রথম বৈদিক সময়—সমগ্র ঋগ্বেদ, যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ এবং অথর্ব বেদের প্রাচীন অংশগুলি এই সময়ের রচনা, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণভাগ রচনার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আরণ্যক ও উপনিষদ্ রচনার কাল, তৃতীয় যাস্ক ও পাণিনির সময়। এই কালকে তিনি (Middle Sanskrit) কাল বলিয়াছেন এবং ইহার পরবর্ত্তী কালকে মহাকাব্যাদি রচনার কাল বা Classical period বলা হয়।

কোন সময়ের লোক হইতে পারেন না সে সম্বন্ধেও যুক্তির অভাব রহিয়াছে। সুতরাং ডাক্তার ভাণ্ডারকারের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করার পক্ষেও কোন যুক্তি নাই। সে যাহাই হউক, পাণিনি যে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই এবং পাণিনি ও পতঞ্জলের মধ্যে অন্ততঃ যে চারিশত বৎসরের ব্যবধান তাহা ধরিয়া নিতে পারা যায়।

মন্তব্য ঃ—ইহা পূর্ববর্ত্তী ৮০ পৃষ্ঠার প্রথম লাইনের টীকা।

(১) কাত্যায়ন পাণিনি সূত্রের যে টীকা রচনা করেন পতঞ্জল তাহার উপর মহাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। যাহা স্থাপন করিতে হইবে তাহার বিরুদ্ধে যত সকল আপত্তি হইতে পারে এই সকল প্রথম উপস্থাপিত করিয়া বিচার পূর্বক তাহা খণ্ডন করতঃ সত্য নির্দ্ধারণ করা মহাভাষ্যের পদ্ধতি। বিরুদ্ধবাদী পূর্বপক্ষ এবং যিনি তাহার যুক্তি খণ্ডন পূর্বক স্বীয় মত স্থাপন করিবেন তিনি সিদ্ধান্ত। একটী দৃষ্টান্ত :—

পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—

ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল শব্দের যথাযথ অর্থ জ্ঞান অথবা তাহার ব্যবহার ইহাদের কোনটার উপর নির্ভর করে ?

প্রশ্নের উপর উভয় পক্ষের অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য স্বর্গ সুখ কামনা। অর্থ ভাবনা সহকারে শব্দের যথাযথ শুদ্ধ ব্যবহার হইতে এই ফল লাভ হইতে পারে এবং একমাত্র ব্যাকরণই (শব্দানুশাসন) শব্দশুদ্ধিতত্ত্ব অবগত হইবার উপায়। বস্তুতঃ বার্ত্তিকার সূত্র "সিদ্ধি শব্দার্থ সম্বন্ধে" ইহার ব্যাখ্যায় শব্দের গভীর দার্শনিক তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। শব্দতত্ত্বের প্রকৃত অনুশীলন হইতে যে ফল লাভের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, মোক্ষমূলরের ভাষায় তাহা এই।

"The means of final beatitude, the door of emancipation, the medecine of the diseases of language, the purifier of all sciences, the science of sciences, it is the first rung of the ladder, that leads up to final bliss, and straight Royal Road, among all the roads that lead to Emancipation.

বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার নাম সূত্তপিটক। ইহা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, ইহারা যথাক্রমে (১) দীর্ঘনিকায়, (২) মাধ্যমনিকায়, (৩) সংযুক্তনিকায়, (৪) অঙ্গোত্তর-নিকায়, (৫) ক্ষুদ্রকনিকায়।

মহাপরিনির্বান সূত্ত দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত। নিদ্দেশ, ধম্মপদ, জাতক, থেরাগাথা, থেরীগাথা, অপদান (অর্হৎ চরিত্র) ক্ষুদ্রক-নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল সঙ্কলনের সময় চারিশত খৃষ্ট পূর্ব। নিদ্দেশে তৎকালে দেশে বিভিন্নস্তরের লোকের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল তাহার বর্ণনা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে, যাহারা আজিবকপন্থী তাহাদের উপাস্য দেবতা আজিবক, তদ্রূপ নির্গ্রন্থদিগের দেবতা নির্গ্রন্থ, জটাধারী জটিলাদিগের দেবতা জটিলা, পরিব্রাজকদিগের দেবতা পরিব্রাজক, অবরুদ্ধদিগের দেবতা অবরুদ্ধক এবং যাহারা হাতি, ঘোড়া, গরু, কুকুর, কাক, বাসুদেব, বলদেব পুন্নভদ্ধ, মণিভদ্ধ, অগ্‌গি, নাগ, সুপন্ন, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, কণ্ড, সুরিয়, ইন্দ্র, ব্রহ্মা দেবদিগের উপাসক তাহাদের দেবতা যথাক্রমে হাতি, ঘোড়া, বাসুদেব, বলদেব ইত্যাদি।

নিদ্দেশের এই উক্তির মধ্যে এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা সুস্পষ্ট, তথাপি সে সময়ই বাসুদেব বলদেব সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

চারিশত খৃঃ পূর্বের শেষ চতুর্থভাগে মৌর্য্যবংশীয় মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেসিডনের যবন রাজদূত মেগাস্থিনিস যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মথুরার (Methora) প্রথম নামোল্লেখ দেখা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, ইহা ও ক্লেইসবরা (Kleisbora) নামক অপর একটী নগর সৌরসেনী নামক এক ক্ষত্রিয় জাতির শাসনান্তর্গত ছিল, এবং এই প্রদেশ দিয়া যমুনা নদী (Jobaris) প্রবাহিত হইত। সৌরসেনীরা হরিকৃষ্ণ

(Herakletis) দেবতার পূজা করে। সৌরসেনীরা যাদবদিগের সাত্বতশাখার অন্তর্গত, ইহারা হরিকৃষ্ণের উপাসক। এই হরিকৃষ্ণ এবং নিদ্দেশের বাসুদেব বলদেব একই দেবতা বলিয়া মনে হয়। ইহার পর মহারাজা অশোকের রাজত্বকাল ও তৎপরবর্ত্তী প্রায় একশত বৎসরকাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতিপত্তি; উত্তরভারতে সে সময় অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির পরম নিষ্প্রভাবস্থা।

ইহার পর পতঞ্জলির মহাভাষ্যে বাসুদেব বলদেবের উল্লেখ দেখা যায়। পাণিনির (৪র্থ, ১, ১১৪) সূত্রের এক ব্যাখ্যায় তিনি লিখিয়াছেন, বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের অপত্য এই অর্থে বাসুদেব ও বালদেব শব্দ সাধিত হইয়াছে। কাশিকাতে প্রদত্ত আর একটি দৃষ্টান্ত, যথা—"বাসুদেব আনিরুদ্ধ", এখানে আনিরুদ্ধ বলিতে অনিরুদ্ধের অপত্য বুঝায়, সুতরাং বাসুদেব শব্দও বাসুদেবের অপত্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কাশিকাতেই পাণিনীর ৬, ২, ৩৪ সূত্রের ব্যাখ্যায় দ্বন্দ্ব সমাসের বহুবচনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৃষ্ণিরাজবংশীয়দিগের নাম "সিনি-বাসুদেবাঃ" এবং দ্বিবচনে দ্বন্দ্ব সমাস "সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবৌ" উল্লেখ রহিয়াছে—এখানে প্রথম দৃষ্টান্তে বাসুদেবাঃ শব্দ দ্বারা বাসুদেবের বংশধরদিগকে বুঝায়, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে স্বয়ং বাসুদেবকে বুঝায়। ইহাদিগের কোন দৃষ্টান্তেই বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব নহে।

রাজপুতনায় ঘুসণ্ডি নামক স্থানে প্রায় দুইশত খৃঃ পূর্বে খোদিত একটী লিপি হইতে জানা যায় উহা সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজা মন্দির সংক্রান্ত।

নানাঘাটে এক গহ্বরগাত্রে খোদিত এক লিপিতে অন্যান্য দেবতার স্তুতির সঙ্গে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত নামোল্লেখ রহিয়াছে। এখানেও তাঁহারা দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

বেসনগরে প্রাপ্ত আর একটী লিপি হইতে দেখা যায় হেলিওডরা নামক কোন এক ব্যক্তি পূর্ব মালবদেশের রাজা ভগভদ্রের সভায় আন্তলিকিত নামক যবন রাজার দূত ছিলেন। তিনি নিজকে ভাগবর্ত নামে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার আরাধ্য দেবতা বাসুদেবের উদ্দেশ্যে এক গরুড়ধ্বজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। হেলিওডোরা তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন। আন্তলিকিত দ্বারা এনটিয়াল্‌কিডিস্‌কে বুঝায়—এই নামের বেক্‌ট্রো গ্রীক মুদ্রা হইতে জানা যায় তিনি খৃষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ সময়ে এক সম্প্রদায়ে বাসুদেব সকল দেবতার পরম দেবতারূপে পূজিত হইতেন এবং তাঁহার উপাসকগণ নিজদিগকে ভাগবত নামে পরিচয় দিতেন। সে সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, যবন গ্রীকদিগের মধ্যে অনেকে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পতঞ্জলির সময় বাসুদেব সকল দেবতার উপর পরম দেবতারূপে পূজিত হইতে-ছিলেন—সুতরাং তিনি 'বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুণ'—পাণিনির এই সূত্রে বাসুদেব শব্দকে নারায়ণ বা ঈশ্বররূপে পরম দেবতার অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু নিদ্দেশে উপাস্য দেবতাদিগের মধ্যে বাসুদেব বলদেবের উল্লেখ—এবং প্রস্তর লিপিগুলিতে সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের এক সঙ্গে নামোল্লেখ ও দ্বন্দ্ব সমাসরূপে ব্যবহার হইতে ইহা বুঝা যায় এই বাসুদেব ও বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব এবং 'বাসু-দেবার্জ্জুনাভ্যাংবুণ' এই সূত্রের বাসুদেব একই ব্যক্তি। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে তিনি উপাস্য দেবতা নারায়ণের স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৬৫ অধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা আছে তথায় ব্রহ্মদেব পুরুষপরমেশ্বরের নিকট যদুবংশের বৃদ্ধিকামনা করিয়া বলিতেছেন—"হে বাসুদেব! তোমার কৃপায় আমি পুরাকালের এক রহস্য অবগত আছি। তুমি নিজকে সঙ্কর্ষণরূপে

সৃষ্টি করিয়া তদনন্তর তোমার পুত্ররূপে প্রদ্যুম্নকে উৎপন্ন করিয়াছিলে, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনিরুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণু, তাহা হইতে আমার উৎপত্তি হইয়াছিল; এইরূপে বাসুদেব হইতে আমার উদ্ভব। এইবারও নিজকে বিভক্ত করিয়া তুমি নররূপে অবতীর্ণ হও।"

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রজাপতির উক্তি—পুরুষপরমেশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেব নামে পরিচিত হইবেন।

উক্তিগুলির মর্ম্ম এই—পূর্বকল্পে পুরুষপরমেশ্বর নারায়ণ যেরূপ সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও ব্রহ্মদেবকে সৃষ্টি করিয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ এইবারও তাঁহাকে যদুবংশে বাসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া চারি অংশে অবতরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইতেছে। শান্তিপর্বে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষি নারদকে বলিয়াছিলেন "বাসুদেবই পরমাত্মা ও সকল আত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার, জীবরূপী সঙ্কর্ষণ, মনোরূপী প্রদ্যুম্ন এবং অহঙ্কাররূপী অনিরুদ্ধ, ইঁহারা সকলেই তাঁহার এক একটী ব্যূহ বা প্রতিমূর্ত্তি। এখানেও প্রকারান্তরে এই তত্ত্বই জ্ঞাপন করা হইয়াছে। অপিচ, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই ধর্ম্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে, এবং ভূভার হরণের জন্য তিনি যুগে যুগে নানা অবতারে অবতীর্ণ হইবেন এবং পরিশেষে কংস ও অন্যান্য দানবদিগকে বিনাশ করিয়া নিজের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, পুত্র প্রদ্যুম্ন ও পৌত্র অনিরুদ্ধের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ম্মূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ সাত্বতগণসহ ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন। এখানেও যাদবদিগের মধ্যে তাঁহার অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ব্রহ্মদেব প্রার্থনা করিতেছেন। সাত্বতরা যাদবদিগেরই এক শাখা।

গীতাশাস্ত্রে এই চতুর্ব্যূহতত্ত্ব কিম্বা সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ এই সকল কোন নামের উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু ইহার সপ্তম

অধ্যায়ের চতুর্থ হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত চারি শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহাতে এই চতুর্ব্যূহতত্ত্বেরই আভাস পাওয়া যায়। তথায় ভগবান বলিতেছেন ;—

"আমার পরা ও অপরা দুই প্রকৃতি। তন্মধ্যে অপরা প্রকৃতি—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত। যাহা পরাপ্রকৃতি তাহা জীবস্বরূপিণী। ইহা কর্ত্তৃক এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে।"

ভূত সকল ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপিণী এই প্রকৃতিদ্বয়জাত; জড়প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হইয়া ক্ষেত্র হন। ক্ষেত্রজ্ঞ চেতন প্রকৃতি আমার অংশভূতা। ইহাই ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মদ্বারা দেহাদি ধারণ করে। এই প্রকৃতিদ্বয় আমা হইতে উপজাত। এইজন্য আমি এই সপ্রকৃতিক সমুদয় জগতের উৎপত্তি এবং প্রলয় স্থান। আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই। সূত্রে গ্রথিত মণিগণের ন্যায় এই সমগ্র জগৎ আমাতে আশ্রিত রহিয়াছে।

নারায়ণী উপাখ্যানে বলা হইয়াছে যে হরিগীতাতে পূর্বে যাহা সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে পঞ্চরাত্রে তাহারই বিশদ বর্ণনা করা হইয়াছে। চতুর্ব্যূহতত্ত্ব পঞ্চরাত্রের পরমগুহ্য ঐকান্তিক ধর্ম্ম, ইহা হইতে বুঝা যায় ভগবদ্‌গীতাই সেই হরিগীতা। সুতরাং বদরিকাশ্রমে নর-নারায়ণ ঋষি নারদকে যে পুরুষপরমেশ্বর বাসুদেবের কংসাদি দৈত্যগণের বধের জন্য অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তিনিই নররূপী নারায়ণ। তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সারথি, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুণ" সূত্রের বাসুদেবও তিনিই।

বৈষ্ণবধর্ম্মে ভগবদুপাসনার বীজমন্ত্র বাসুদেব, যথা—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

তথাপি যিনি হরিকৃষ্ণ বা কৃষ্ণ, বৈষ্ণবদিগের তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পরম আরাধ্য দেবতা, এবং তাঁহার নাম জপই শ্রেষ্ঠ সাধনা।

এই নামের মধ্যে নামীর প্রকাশ। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।"

বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমবিকাশের পথে বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেব তত্ত্বের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়া পরিশেষে কৃষ্ণতত্ত্বে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ কে? মহাভারতের নারায়ণী পর্বাধ্যায়ে বর্ণিত আখ্যান মতে প্রথম মনু স্বায়ম্ভুবের অধিকার কালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ ধর্ম্মের পুত্র হইয়া নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হন। তন্মধ্যে নর নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হন।

এদেশীয় শাস্ত্রগুলির মধ্যে অবতারবাদের এই প্রথম উল্লেখ। হরি কৃষ্ণ সম্বন্ধে আর কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ্ যবনদূত মেগাস্থেনীস তৎকালের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে যমুনানদীর তীরবর্ত্তী মথুরা (মেথুরা) নগরীতে সোরসেনী সম্প্রদায়ের মধ্যে হরিকৃষ্ণ (Hirakletis) দেবতার পূজার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা চতুর্থ খৃষ্টপূর্ব সময়ের বর্ণনা। মথুরা নগরীরও এই প্রথম উল্লেখ। এই হিরাক্লিটীস (হরিকৃষ্ণ) এবং নারায়ণী আখ্যায়িকায় বর্ণিত হরিকৃষ্ণ উভয়ই যে এক তাহা স্থির করা সুকঠিন, কারণ বিশ্বাত্মা নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রথম মনুর অধিকারকালে, আর মিগাস্থেনীসের বর্ণিত মথুরানগরী ও তাহাতে হরি কৃষ্ণ দেবতার পূজার প্রথা বর্ত্তমান সপ্তম মনুর সময়ের। ইহাদিগের মধ্যে আরো পাঁচজন মনু আবির্ভূত হইয়াছেন এবং পাঁচবার মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়াছে।

নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়ও প্রথম মনুর অধিকারকালে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি নারদের তাঁহাদিগের নিকট আগমন এবং তাঁহাদের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্বেতদ্বীপে আদিনারায়ণের

নিকট গমন ও তাঁহার নিকট হইতে চতুর্ব্যূহাত্মক ঐকান্তিক ধর্ম্মোপদেশ লাভ ও ঐ সময়ের ঘটনা। এই ধর্ম্মোপদেশ প্রসঙ্গে নারায়ণ নারদকে আরো বলিয়াছিলেন যে, সপ্তম মনুর যুগে এই ধর্ম্ম সাত্বতদিগের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে এবং ভূভার হরণের জন্য নারায়ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইবেন এবং অবশেষে দ্বারকাতে আপন ভ্রাতা পুত্র ও পৌত্রের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ম্মূর্ত্তির কার্য্যসকল সম্পাদনান্তে সাত্বতবংশ নির্ম্মূল ও দ্বারকাপুরী ধ্বংশ করিয়া লীলার অবসান করিবেন। নর নারায়ণ হরি কৃষ্ণ এই চারি অবতারের মধ্যে যিনি নারায়ণ তিনিই যে দ্বারকাপুরীতে এই লীলা করিয়া গিয়াছেন, পরবর্ত্তীকালে রচিত শাস্ত্রসকল হইতে তাহা অনুমিত হয়।

নারদ ব্যাসের নিকট ঐকান্তিক ধর্ম্মব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, সপ্তমবার নারায়ণের নাভিমূল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইলে নারায়ণ ব্রহ্মার নিকট এই ধর্ম্ম প্রকাশ করেন এবং ত্রেতাযুগের আরম্ভে বিবস্বান্ মনুকে, মনু ইক্ষ্বাকুকে ইহা প্রদান করেন। গীতাশাস্ত্রে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—পুরাকালে আমি সূর্য্যকে ইহা বলিয়াছিলাম, সূর্য্য আপন পুত্র মনুকে বলিয়াছেন এবং মনু ইক্ষ্বাকুর নিকট বলিয়াছেন—

> "ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
> বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥"
>
> ৪ অঃ ১ শ্লোক।

অর্জ্জুন এবং এই উক্তি যাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে তাঁহারা উভয়ই বর্ত্তমান কল্পের দ্বাপর যুগের শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই তাহার বহু পূর্ব্বেকার ত্রেতাযুগের ঘটনা ভগবান্ কৃষ্ণের পক্ষে জানা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে অর্জ্জুন এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন,—

"বহূণি মে ব্যতীতানি জন্মানিতবচার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ॥"

৪ অ; ৫ শ্লোক।

"হে পরন্তপ! (অর্জ্জুন) আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে। আমি তাহা সকলই অবগত আছি, তুমি জান না।"

ইহা দ্বারা তাঁহারা উভয়ই যে সেই প্রথম মনুর অধিকার কালে বদরিকাশ্রমে তপোনিরত নর নারায়ণ ঋষি ছিলেন, ইহার আভাষ প্রদান করা হইয়াছে।

মহাভারত বনপর্বে দ্বাদশ অধ্যায়ের ৪৬, ৪৭, শ্লোকে জনার্দ্দন অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুমি নর, আমি হরি নারায়ণ। আমরা নর নারায়ণ ঋষি যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়াছি।" ঐ পর্বের ৩০ অধ্যায়ে আরো পরিষ্কার ভাষায় শিব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "পূর্বজন্মে তুমি নর ছিলে এবং নারায়ণ তোমার সখা ছিলেন, তোমরা একযোগে বদরিতে বহুসহস্র বৎসরব্যাপী কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলে। এই গ্রন্থের উদ্‌যোগপর্বে (৪৯ অঃ ১৯ শ্লোকে) বলা হইয়াছে "এরূপ জনশ্রুতি যে যুদ্ধশ্রেষ্ঠ এই দুই বীর বাসুদেব ও অর্জ্জুন, ইহারাই পুরাকালের নর নারায়ণ।

এই সকল উক্তি হইতে বুঝা যায় যিনি গীতার উপদেষ্টা ভগবান্ তিনি বাসুদেব, এবং তিনিই জনার্দ্দন। গীতাশাস্ত্রের উপসংহারে সঞ্জয় তাঁহাকে কেশব এবং যোগেশ্বর কৃষ্ণ নামেও অভিহিত করিয়াছেন। তিনি পুরাকল্পে বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষিরূপে তপস্যা করিয়াছিলেন এবং পুনর্বার ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় তাঁহার দেহ সৃষ্টি করিয়া অবতীর্ণ হওয়ার কারণ। দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণদ্বারা ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

শ্বেতদ্বীপে নারায়ণ নারদের নিকট পর পর এইরূপ ছয় বার অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলিয়াছিলেন—তাঁহারা যথাক্রমে বরাহ,

নৃসিংহ, বামন, ভৃগুবংশোৎপন্ন রাম, দাশরথি রাম এবং মথুরার কংস নিধনকারী যিনি দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়া অবশেষে দ্বারকাতে বসতি স্থাপন করিবেন। কংসনিধনকারীর নাম যে কি এখানে তাহার উল্লেখ নাই। এই নারায়ণী উপাখ্যানেরই অন্যত্র বরাহ অবতারের পূর্বে যথাক্রমে হংস, কূর্ম্ম, মৎস্য এই তিন অবতার এবং সর্বশেষ বা দশম কল্কি অবতার হওয়ার উল্লেখ আছে। কল্কি অবতারের পূর্ববর্ত্তী অবতারকে সাত্বত বলা হইয়াছে। এই সাত্বত আখ্যানদ্বারা বাসুদেব কৃষ্ণকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে বুঝা যায়।

হরিবংশ, বায়ুপুরাণ, বরাহপুরাণ, শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রে অবতারদিগের বর্ণনা আছে। এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে অবতার সংখ্যার পার্থক্য রহিয়াছে। ভাগবতের কোনস্থানে (প্রথমস্কন্ধ ৩য় অধ্যায়) অবতার সংখ্যা ২২, অন্যত্র (২য় স্কন্ধের ৭ অ) ২৩, অপর স্থানে (একাদশ স্কন্ধ ৪ অ) ১৬। ব্যাস, নারদ, দত্তাত্রেয় কপিল, ঋষভ (জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক প্রথম তীর্থঙ্কর), এবং ধন্বন্তরি অবতারদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন। তথাপি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন রাম, রাম, কংসারি (কৃষ্ণ), বুদ্ধ ও কল্কি এই দশজন অবতার মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি কংসারি তাঁহারই প্রাধান্য।

বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, হরিবংশ, শ্রীমদ্‌ভাগবত, নারদপঞ্চরাত্র ও তদন্তর্গত জ্ঞানামৃতসার সংহিতায় কৃষ্ণের অবতার সম্বন্ধে বিবরণ রহিয়াছে। গীতাতে ভগবান অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন ;—"তোমার আমার অনেক জন্ম হইয়া গিয়াছে।"

যিনি ঈশ্বর এবং পাপ-পুণ্যের অতীত, সাধারণ জীবের ন্যায় তাঁহার কিরূপে জন্ম সম্ভব? এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বলিলেন ;—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"

আমি জন্মরহিত অব্যয় ভূতগণের ঈশ্বর হইয়াও নিজেরই প্রকৃতিতে অধিষ্ঠানপূর্বক আত্মমায়ায় জন্মগ্রহণ করি।"

গীতাশাস্ত্র পুরাণাদি অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, সম্ভবতঃ এই শাস্ত্রেই অবতারবাদের প্রথম অবতারণা হইয়াছে। শ্রীধর-স্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—ভগবান্ কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য-রহিত, অর্থাৎ তিনি কর্ম্মের অধীন নহেন, তথাপি নিজ মায়াদ্বারা উৎপন্ন হন।" ইহাতে যদি প্রশ্ন উঠে, যিনি ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহশূন্য, তাঁহার আবার কি করিয়া জন্ম সম্ভব? উত্তরে বলা হইয়াছে ;—

"স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিত সত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামি"।

তিনি স্বকীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তিতে স্বেচ্ছায় অবতীর্ণ হন।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য অবতার তত্ত্ববিষয়ক এই শ্লোকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তৎকৃত গীতাভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ,—প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম এবং জ্ঞানবৈরাগ্য-লক্ষণযুক্ত নিবৃত্তিমার্গ ধর্ম্ম। প্রবৃত্তিলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম অভ্যুদয়ের হেতু। জগতের আদিকর্ত্তা "জ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তি বল বীর্য্য তেজঃ" এই ষড়ৈশ্বর্য্য শালী ভগবান্ নারায়ণাখ্য বিষ্ণু নিজের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে স্ববশে আনিয়া নিজ মায়া দ্বারা যেন দেহী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অজ (জন্মরহিত), অব্যয় সর্বলোকের অধীশ্বর, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব। তাঁহার নিজের কোন প্রয়োজন নাই। জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এইরূপ অবতার স্বীকার করেন।

মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা—"যিনি ভগবান্, নিত্য, বিভু, সচ্চিদানন্দঘন, নির্গুণ পরমাত্মা, তাঁহার কোনরূপ ভৌতিক কি মায়িক দেহ সম্ভবে না, অবতারকালে প্রাকৃতজনের ন্যায় তাঁহাকে যে দেহধারী বলিয়া প্রতীত হয়—তাহা মায়া মাত্র।

"তিনি স্বয়ং নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়া লৌকিক ভাবে নিজে ভ্রাতা-পুত্র-পৌত্ররূপে প্রকটলীলা দ্বারা মায়াপ্রপঞ্চে চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের অভিনয় করিয়া গিয়াছেন।" [হরিবংশ]

"ভগবান্ পরমেশ্বর দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ তুলিয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—এই আমার কেশদ্বয় পৃথিবীতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর ভার ও ক্লেশ ক্ষয় করিবে।"

বিষ্ণুপুরাণ (৫খ-১অ ৫৯, ৬০ শ্লোক)

"হে দেবগণ! আমার এই কেশ বসুদেবের দেবোপমা পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মিবে"। ঐ ৬৩ শ্লোক।

"অসুরগণের সৈন্যদ্বারা বিমর্দিতা পৃথিবীর ক্লেশভার দূর করিবার জন্য (ভগবৎ) কলাতে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ জন্মিয়াছেন। সাধারণ লোক তাঁহার কার্য্য-প্রণালী বুঝিবার শক্তি রাখে না। নিজের মহিমা হইতে যে সকল কর্ম্ম হয় তিনি তাহা করিবেন।"

(ভাগবত ২স্ক—৭ অ-২৬ শ্লোক।)

"ভগবানের অভয়প্রদ বিশ্বাত্মা অংশভাবে বসুদেবের মনে প্রবেশ করিলেন।"

(ঐ ১৫ স্ক ২ অ-১৬ শ্লোক)।

ব্রহ্মসংহিতায় স্পষ্টতর ভাষায় লিখিত হইয়াছে ;

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ"

পুরাণাদি গ্রন্থনিচয়মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত কৃষ্ণাবতারের লীলা-বিষয়ক ভক্তিতত্ত্বের শিরোমণি গ্রন্থ। ইহাতে বর্ণনা আছে নৈমিষারণ্য নামক বিষ্ণুক্ষেত্রে শৌণকাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক সহস্র বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠিত যজ্ঞভূমিতে সূত সমাগত হইলে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া ঋষিগণ বলিলেন,—"হে সূত! যে প্রয়োজন সাধন জন্য সাত্বতদিগের পতি ভগবান্ বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে

আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যাঁহার অবতার জীবগণের মঙ্গল ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে, আমরা সেই বাসুদেবের অবতার লীলাসমূহ শুনিতে ইচ্ছা করি। আপনি তাহা সম্যক্ অবগত আছেন, আমাদের নিকট কীৰ্ত্তন করুন।"

(১ স্ক—১ অ—১২।১৩ শ্লোক)।

ভগবান কর্ত্তৃক লীলাচ্ছলে পুরুষাবতার প্রভৃতি কলা ধারণের উল্লেখ করিয়া ১৭শ শ্লোকে বলা হইয়াছে "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান"।

ইহার পরবর্ত্তী বিংশ শ্লোক—

"কৃতবান্ কিল কর্ম্মাণি সহ রামেন কেশবঃ।
অতিমর্ত্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ॥

"কপটমানুষঃ" নিত্যঃ অপ্রাকৃতঃ সন্নপি প্রপঞ্চাতিক দর্শনযোগ্য মনুষ্যরূপধৃক্।

শ্লোকের অর্থ—নিত্য অপ্রাকৃত বস্তু হইয়াও পাঞ্চভৌতিক জড়দেহ-বিশিষ্ট মনুষ্যরূপধারী, অতএব গূঢ় অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে যিনি পরব্রহ্ম সেই কৃষ্ণ বলরামের সহিত যে সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করুন।

এই গ্রন্থের ১০ম স্কন্ধের ৩৭ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে নারদ কৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন,—"তুমি ঈশ্বর, তুমি নিজেই তোমার আশ্রয়, তুমি আত্মাধীন মায়া দ্বারা অশেষ কল্পনা বিশেষ রচনা কর, এবং ক্রীড়ার নিমিত্ত মনুষ্য দেহ ধারণ কর।"

ঋগ্বেদে বিষ্ণুকে "ঋতস্য গর্ভং" বলা হইয়াছে। জগৎকে কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য যত নিয়ম তাঁহা হইতে সে সকল প্রবৰ্ত্তিত হইয়াছে। মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গফলপ্রদ শব্দ অর্থ ও হেতুগর্ভ নিয়মাবলী তাঁহারই অনুমোদিত। এই সকল নিয়মের কোনরূপ ব্যতিক্রম হইলে ধর্ম্মের গ্লানি এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত

হওয়া অনিবার্য্য। এইরূপ অবস্থার যখন উদ্ভব হয় তখন তিনি অবতীর্ণ হন। ইহা কি পর্য্যাপ্ত কারণ? স্বভাবতঃই মনে এ প্রশ্ন উদয় হয়।

যাঁহার ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কার্য্য সাধিত হইতেছে —যাঁহার প্রশাসনে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদি নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করিতেছে—যাঁহার ইচ্ছার অন্যথা করিবার ক্ষমতা কেহই রাখে না, সেই সর্বময় কর্ত্তা ও নিয়ন্তার মনুষ্য শরীর ধারণের প্রয়োজন কি?

ভাগবতে প্রশ্নের এরূপ সমাধান করা হইয়াছে ;—

নূনাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥ ২৯ অঃ ১৪ শ্লোক।

হে নৃপ! জীবমাত্রের ভক্তি ও মুক্তি প্রদানার্থই অব্যয়, অপ্রমেয় (অপরিসীম), নির্গুণ (মায়াতীত) ও গুণাত্মা (মায়াময় গুণসমষ্টির প্রবর্ত্তক) শ্রীভগবানের প্রকাশ হইয়া থাকে।

গীতাতে বলা হইয়াছে দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, কিন্তু যিনি ভ্রূ-বিজৃম্ভণমাত্র কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সংহার করিতে পারেন তিনি কেবল যে কংসাদি নিধনদ্বারা ভূভার-হরণ জন্যই আবির্ভূত হন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; (ভ্রূ-বিজৃম্ভণমাত্রেন ব্রহ্মাণ্ডকোটি সংহার-সমর্থস্য ভূভারভূত কংসাদিবধার্থমেব ব্যক্তিরন্যথা নোপপদ্যতে—প্রাণতোষণী); জীবের মঙ্গল করাই পৃথিবীতে ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার মুখ্য কারণ।

. ৩য় স্কন্ধের ২অ, পঞ্চদশ শ্লোকে উদ্ধব বিদূরকে বলিতেছেন—

"স্বশান্তরূপেম্বিতরৈঃ স্বরূপৈ-রভ্যর্দ্দ্যমানেম্বকম্পিতাত্মা।
পরাবরেশো মহদংশযুক্তো হ্যজোঽপি জাতো ভগবান্ যথাগ্নিঃ॥

ভগবানের কৃষ্ণরূপে আবির্ভাবের কারণ—

শান্ত ও অশান্তভেদে দুইরূপ। যখন তাঁহার অশান্তমূর্ত্তি দুষ্টগণ তাঁহার শান্তমূর্ত্তিশিষ্টগণকে প্রপীড়িত করিতেছিল তখন দয়ার্দ্রচিত্ত ভগবান্ স্বয়ং দেহধারীর ন্যায় জন্মশূন্য হইলেও মহৎ (সঙ্কর্ষণ) অংশযুক্ত হইয়া, নিত্যসিদ্ধ অগ্নি যেমন কাষ্ঠে উৎপন্ন হয় তদ্রূপ অবতীর্ণ হইলেন।

পূর্বে বলা হইয়াছে নিত্য অপ্রাকৃত বস্তু হইয়াও ভগবান্ পাঞ্চভৌতিক জড়দেহবিশিষ্ট মনুষ্যরূপধারী হইয়া অবতীর্ণ হন। তাঁহার এরূপ আত্মসঙ্কোচের প্রয়োজন কি?

গীতাতে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের আখ্যায়িকার মধ্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়—। অর্জ্জুন সাধারণ মানব হইতে অনেক উন্নত স্তরের অতি মানব ছিলেন, অধিকন্তু ভগবান্ তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন যেন তিনি ঐশ্বর্য্যের সম্যক্ বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারেন।

অন্যান্য ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অর্জ্জুন যখন তাঁহার নভঃস্পর্শী বহু ভয়ঙ্কর প্রদীপ্ত বর্ণ, বিবৃতানন প্রজ্বলিত বিশাল নেত্র ও করালদংষ্ট্র সমন্বিত কালানলসন্নিভ মুখ দর্শন করিলেন তখন তিনি ভয়ে বিহ্বলচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না, শান্তিলাভ করিতেছি না, সুখলাভ করিতেছি না, দিক্‌হারা হইয়া গিয়াছি, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তোমার এই 'ভয়ানাং ভয়ং'রূপ সম্বরণ কর, তুমি প্রসন্ন হও।"

"নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশাল নেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো॥ ২৪
দংষ্ট্রা করালানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস॥ ২৫

বস্তুতঃ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ব্যাপারে যাঁহার মাত্র আংশিক শক্তির প্রকাশ তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ মানবের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব নহে, সেজন্য নিজকে সঙ্কোচিত করিয়া নরদেহের আবরণের মধ্য দিয়া তাঁহার অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। তিনি স্বয়ং অরূপী হইয়াও কেবল মানবের হিতসাধনের জন্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। তিনি একদিকে যেমন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ভগবান্, অপর দিকে তেমনই অনন্ত কল্যাণগুণনিধি, পরম কারুণিক, আশ্রিত বৎসল, সখা ও জীবন সংগ্রামে সারথী। বিশ্বরূপ প্রকটিত হইবার পূর্বে অর্জ্জুন যাঁহাকে পরম হিতৈষী সখা বলিয়া জানিতেন এখন তাঁহার এই রূপ দর্শনে ভয়ে থর থর কম্পমান হইতে লাগিলেন, তাঁহার সকল প্রকার মধুর ভাব তিরোহিত হইয়া গেল এবং অবশেষে করজোরে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখেতি!
অজানতা মহিমানং তবেদং,
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহা সার্থমসৎকৃতোঽসি,
বিহার শয্যাসন ভোজনেষু।
একোঽথ বাপ্যচ্যুত! তৎসমক্ষং
তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥ ১১ অ ৪১।৪২॥

হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! অজ্ঞানতাবশতঃ সখা মনে করিয়া তোমার প্রতি এই সকল যে অবিনয়সূচক কথা ব্যবহার করিয়াছি, তাহা তোমার মহত্ত্ব ও এই বিশ্বরূপ না জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ বলিয়াছি। বিহার শয্যা এবং আসন ভোজনেতে একা অথবা জনসমক্ষে পরিহাস করিয়া তোমার যে অমর্য্যাদা

করিয়াছি, হে অচ্যুত! হে অপ্রমেয়! তোমার নিকট সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ভয়বিহ্বল চিত্ত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বাসুদেব তাঁহার বিশ্বরূপ সংবরণ করিয়া মনুষ্যরূপ ধারণ করিলেন। তাহা দেখিয়া অর্জ্জুন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন!।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ॥ ৫১

হে জনার্দ্দন! তোমার এই সৌম্য মনুষ্যরূপ দর্শন করিয়া এখন প্রসন্নচিত্ত হইলাম, প্রকৃতিস্থ হইলাম।

অর্জ্জুনের এই সকল উক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইল যিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, ভূতবর্গের অধীশ্বর তাঁহার এইরূপে আত্মভাব সঙ্কোচন দ্বারা পরিচ্ছন্ন ভাবে অবতীর্ণ হওয়ার মূলে রহিয়াছে জীবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম করুণা ও আশ্রিত-বাৎসল্য ভাব। এই তত্ত্বটি স্থূলভাবে পৃথিবীবক্ষে নিপতিত সূর্য্যমণ্ডলের তাপ ও আলোকরশ্মির ন্যায়। সূর্য্যের যে পরিমাণ তাপ ও আলোকরশ্মি পৃথিবীর দিকে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে, তাহার সামান্য অংশই পৃথিবী বক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছায়। যদি সূর্য্যের সমগ্র আলো পৃথিবীর উপর পতিত হইত তবে কোন প্রাণীরই জীবনধারণ সম্ভবপর হইত না, এবং এক বিন্দু জলেরও অস্তিত্ব থাকিত না। সাগরগর্ভ এক অখণ্ড বালুকা সমুদ্রে পরিণত হইত, প্রত্যেক বালুকাকণা এক একটি জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার ধারণ করিত। এইরূপ হইতে পারে না, কারণ পৃথিবীর উপরিভাগস্থ বিভিন্ন বায়ুস্তর ও তাহাদিগের মধ্যে ভাসমান বাষ্পের যে সকল আবরণ রহিয়াছে ঐ সকল আবরণ-স্তর বহুল পরিমাণে সূর্য্যের তাপ ও আলোকরশ্মিকে বাধাপ্রদান করে। ফলে আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে যতটা মঙ্গলপ্রদ সেই পরিমাণ আলোক ও তাপ পৃথিবীবক্ষ পর্য্যন্ত পৌঁছায়; অধিক

ভাগই বিভিন্ন বায়ুস্তরে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আট্‌কাইয়া যায়। সেইরূপ যিনি অনন্ত বৈভবসম্পন্ন সর্বশক্তিমান্ সর্বেশ্বর পরমেশ্বর, তাঁহার অনাবৃত ঐশ্বর্য্য মানবের পক্ষে ধারণা করা কিছুতেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং পরম কারুণিক পরমেশ্বর দেহরূপ আবরণ দ্বারা নিজের তেজকে সংবৃত করিয়া প্রকাশিত হন। তিনি স্বয়ং অরূপ হইয়াও কেবল মানবের হিতসাধনের জন্যই এই রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। (১)।

বস্তুতঃ বর্ত্তমানে জ্যোতির্বিদ্‌দিগের নিকট গগনমণ্ডলের যে সকল নব নব তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শরৎকালে মেঘশূন্য অন্ধকার রাত্রে পরিষ্কার আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষীণোজ্জ্বল যে ছায়াপথ দেখা যায়, ইহা এক সময়ে স্বর্গে দেবগণের গমনাগমনের পথরূপে কল্পিত হইত। প্রকৃতপক্ষে নব নির্ম্মিত বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে, ইহা অসংখ্য তারকামণ্ডিত। জ্যোতির্বিদরা মোটামুটিভাবে গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ইহাতে অন্ততঃ বিশ সহস্র কোটি নক্ষত্র বিরাজমান

---

(১) খৃষ্ট ধর্ম্মমতে যীশুও পাপীদিগকে ত্রাণ করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই মতের বিরুদ্ধে Hall Cainএর যুক্তি :—

No one can suppose that the Ruler of the universe, the maker of Heaven and Earth, and of all things visible and invisible, no one who has formed any conception of the infinite depth of space, and thousands and millions of worlds which it contains—no one who has saturated himself with the intricacies and beauties, and incomprehensible magnitude of creation can suppose that the Regulator of all these can be incarnate in totality in the matter of any single planet.

Life of Christ.

রহিয়াছে। এই সকল তারকার মধ্যে এমন সব তারকাও বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহাদের তুলনায় আমাদের সূর্য্য অতীব ক্ষুদ্রকায়। এই সকল তারকাসমষ্টি লইয়া এক বিশ্বলোকের সৃষ্টি। ইহার বহির্ভূত আরও যে বিশ্বলোক মহাকাশে ভাসমান রহিয়াছে তাহাদেরও সন্ধান মিলিয়াছে,—যথা উত্তর ভাদ্রপদা নীহারিকা (Andromeda nebula); ইহা এই বিশ্বের বহির্ভূত আর একটি বিশ্বলোক। বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদগণ এরূপ অনুমান করেন যে, উত্তর ভাদ্রপদার গঠন কুণ্ডলাকার (spiral) এবং ছায়া-পথটাও তেমনি কুণ্ডলাকারে অবস্থিত একটি নীহারিকা পুঞ্জ।

কালপুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের (Belt of Orion) অন্তর্গত উজ্জ্বল আর্দ্রা নক্ষত্র (Betelguese) একটি বিশালকায় তারকা। ইহার ব্যাস সূর্য্যের ব্যাসের ৩৬০ গুণ। ইহার সমান এবং ইহা হইতেও অধিকতর বৃহৎকায় কত নক্ষত্র আকাশ-সমুদ্রে ভাসমান রহিয়াছে কে বলিতে পারে? আবার আমাদের সূর্য্য হইতে আয়তনে ছোটও যে কত নক্ষত্র রহিয়াছে, তাহারও ইয়ত্তা করা যায় না। সূর্য্যকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র বলিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করেন। এই মহাবিশ্বগুলির সমষ্টির তুলনায় আমাদের পৃথিবী সমুদ্রের বেলাভূমির একটি বালুকাকণাসদৃশ। এই সকল অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধিপতি, তিনি যে পৃথিবীতে নরদেহে অবতীর্ণ হইবেন, জ্ঞান ও যুক্তিবিচারে এবম্বিধ উক্তির স্থান থাকিতে পারে না সত্য, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটি বিষয় বিশেষভাবে ভাবিবার আছে।

আমাদের পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমন্বিত এই সৌরজগতের সৃষ্টি এক আকস্মিক ব্যাপার। অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে ক্বচিৎ কখনও একের সহিত অপরের সংঘাত সম্ভবপর হয়। এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভবও এক রোমাঞ্চকর ব্যাপার। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আকাশে একটি ধূমকেতু যাহা হেইলেস্ কমেট (Hayley's

comet) নামে খ্যাত, আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ পৃথিবীর সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ইহার পুচ্ছের সঙ্গে পৃথিবীর যে সংঘর্ষ ঘটিবে জ্যোতির্বিদগণ তাহা পূর্ব হইতে গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে পৃথিবী-বক্ষে যে এক প্রলয় কাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কাও করিয়াছিলেন। ধূমকেতুর পুচ্ছদেশ পৃথিবী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিল বটে, কিন্তু দেখা গেল ইহা আমাদের বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্ম। যদিচ প্রচণ্ডবেগে ইহা পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া চলিয়া গেল, তবু এতদ্দ্বারা পৃথিবী-বক্ষে কোন রেক্ষাপাত হইল না। ধূমকেতু নিজেই অতিশয় উজ্জ্বল সূক্ষ্ম পদার্থবিশিষ্ট ছিল এবং ইহার পুচ্ছদেশ সূর্য্যালোকের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিল। তাহা না হইয়া ইহা যদি আমাদের পৃথিবীর ন্যায় স্থূলদেহ-বিশিষ্ট হইত তবে পৃথিবী-বক্ষের সহিত ইহার সংঘর্ষ হইতে কি যে অবস্থা ঘটিত তাহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আমরা আকাশমার্গে সময় সময় উল্কা বর্ষণ হইতে দেখি। পৃথিবী কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এমন এক স্থানে আসিয়া উপনীত হয়, যথায় এই উল্কাপিণ্ডসকল অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করিতেছে। যে সকল উল্কা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তির মধ্যে আসিয়া পড়ে, তাহারা পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয়। বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত—আকাশপথে ভ্রাম্যমান দুইটি জড়পিণ্ডের সংঘর্ষ হইতেই এই সকল উল্কার সৃষ্টি হইয়াছে। উভয় জড়পিণ্ডই এই সংঘর্ষের ফলে চূরমার হইয়া উল্কাগুলির সৃষ্টি করিয়াছে।

জ্যোতির্বিদ্গণ গণনা দ্বারা স্থির করিরাছেন যে, অনুমান দুইশত কোটি বৎসর পূর্বে আমাদের সূর্য্য-মণ্ডল সম্বন্ধে এরূপ এক পরিস্থিতির সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। সূর্য্য একটি তারকা—মহাকাশে আপনার পথে ছুটিয়াছে, এইরূপ ছুটিতে ছুটিতে আর একটি তারকা সূর্য্যের গতিপথের নিকট আসিয়া পড়ে। ইহারা উভয়ে পরস্পর যতই নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে পরস্পরের

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ততই বাড়িতে থাকে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্রের সান্নিধ্যবশতঃ সমুদ্রের জল যেমন সাগরবক্ষে স্ফীত হইয়া উঠে, তদ্রূপ ঐ নক্ষত্রের আকর্ষণ ফলে সূর্য্যের উপরিভাগের বাষ্প তরঙ্গায়িত হইয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। সূর্য্য ও নক্ষত্রটি পরস্পর যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ঐ বাষ্পপ্রবাহটি ততই একটি জলস্তম্ভের আকারে সূর্য্যবক্ষ হইতে বাহুবিস্তারের ন্যায় ঐ নক্ষত্রের দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ নক্ষত্রটা সূর্য্যের সঙ্গে সংস্পর্শে না আসিয়া ক্রমে দূরবর্ত্তী পথ অবলম্বন করিয়া সরিয়া গেল। যদি পরস্পরের সংঘর্ষ হইত তবে নক্ষত্র ও সূর্য্য উভয়ই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গগনমার্গে সে সংঘাতস্থানে উল্কারাশির সৃষ্টি করিত। নক্ষত্রটি ক্রমে যতই দূরবর্ত্তী হইতে লাগিল, বাষ্প বাহুটির উপর ইহার আকর্ষণ শক্তি ততই হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং অবশেষে যখন ঐ আকর্ষণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইল তখন ইহা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বর্ত্তুলাকারে আবর্ত্তন করিতে লাগিল; এবং তৎপর ইহা সূর্য্য দেহ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া নিজের কেন্দ্রাপসারিণী (centri fugal) এবং সূর্য্যের মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রাভিসারিণী (centri-petal) এই উভয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন পুঞ্জীভূত এই বাষ্প খণ্ডগুলি ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া গ্রহে পরিণত হইয়াছে। একটি ক্ষুদ্র খণ্ড পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে পড়িয়া ইহার উপগ্রহ চন্দ্রের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভাবে অপর কোন কোন গ্রহের, যথা শুক্র গ্রহের এক বা ততোধিক উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টিটাই এক অলৌকিক ব্যাপার এবং ইহা নিতান্ত অভাবনীয় এক আকস্মিক ঘটনাপ্রসূত। মহাকাশের বিশালত্ব মানবের ধারণাশক্তির অগম্য। অনন্ত কোটি তারকা-

রাজির অবাধ গতিসত্ত্বেও ইহাদের জন্য এত স্থান রহিয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এডিংটন মনে করেন যে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে সংঘর্ষের সম্ভাবনা ষাইট হাজার কোটি বৎসরের (৬×১০^{১১}) মধ্যে একবার। দুইটি নক্ষত্র পরস্পর সংঘর্ষের অভিমুখী হইয়া এ ভাবে এড়াইয়া যাওয়া আরও বিস্মরকর ব্যাপার। ইহার ফলে আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি। আমরা কিন্তু ইহা ভাবিবারও শক্তি রাখি না।

আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার—মহাকাশে অনন্ত কোটি তারকারাজি বিরাজ করিতেছে—ইহাদের কোনটিরই তাপের পরিমাণ পৃথিবীবক্ষে সঞ্চরণশীল জীবদিগের বাসের উপযোগী নহে। দুইটি নক্ষত্রের মধ্যবর্ত্তী যে মহাকাশ তাহারও শীতোষ্ণতা সমানাকার নহে। গগনমার্গের চক্রপথের ইহাও এক বৈশিষ্ট্য যে, আমাদের পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ কালে মহাকাশের যে অংশকে অতিক্রম করে তাহার তাপমান পৃথিবী-বক্ষস্থ জীবদিগের জীবনধারণের অনুকূল।

বিষয়টি যদি আরেক ভাবে আলোচনা করা যায় তবে দেখা যাইবে এই অনন্ত বিশ্বজগৎ যেন ব্রহ্মাণ্ডপতির এক বৃহৎ পরীক্ষাগার। আমাদের পৃথিবীবক্ষস্থ জলের ঘনত্বকে পরিমাপক রূপে গ্রহণ করিলে, আর্দ্রা নক্ষত্রের ঘনত্ব ইহার পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়। আবার আকাশ মার্গে আমাদের চক্ষুর নিকট সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল লুব্ধক (serius) নক্ষত্রের যুগ্ম নক্ষত্রটির ঘনত্ব জলের ঘনত্বের পঞ্চাশ সহস্র গুণ। তাপ সম্বন্ধেও এইরূপ বৈসাদৃশ্য রহিয়াছে। আমাদের সূর্য্যের উপরিতলের তাপমাত্রা পাঁচ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। এমন কোন কোন নক্ষত্র আছে যাহার বিকীরণশক্তি ও তাপমাত্রা সূর্য্যের বিকীরণ শক্তি ও তাপমাত্রা অপেক্ষা দশ সহস্র গুণ অধিক, আবার কোন কোন নক্ষত্রের বেলা ইহা সূর্য্যের তাপমাত্রা ও বিকীরণ শক্তির শত

ভাগের এক ভাগ মাত্র। এত সব বিভিন্ন শ্রেণীর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ে পরীক্ষার পর যেন নিতান্ত অতর্কিত ভাবে এক বিস্ময়কররূপে আমাদের এই পৃথিবীর সৃষ্টি। বিধাতা-পুরুষের এই যে পরীক্ষাগার, দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যাহার সীমানা, তাহাতে যে মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অনধিগম্য কত সব অদ্ভুত উপায়ে পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে আমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি আমরা তাহার কতক আভাষ পাইলাম। পৃথিবী বক্ষকে জীববাসের উপযোগী করিতে ৪০ কোটি বৎসরের প্রয়োজন হইয়াছিল। তদনন্তর সমুদ্রের তীরবর্ত্তী সেঁতসেঁতে স্থানে প্রথম এককোষবিশিষ্ট জীবাণুর সৃষ্টি। ইহার পর ধাপে ধাপে ক্রমশঃ উন্নতির দিকে আরোহণ ক্রমে অবশেষে মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে ১৬০ কোটি বৎসরের পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন রহিয়াছে। স্তন্যপায়ী চতুস্পদী জন্তুদিগের মধ্যে কাঙ্গারু প্রথম সৃষ্টি। ইহার পর বানরজাতীয় জন্তুর আবির্ভাব হইতে ১০ কোটি বৎসর লাগিয়াছিল। বানর জাতীয় জন্তু ও মানব সৃষ্টির মধ্যে এক কোটি বৎসরের ব্যবধান। জীবন তরুতে ধাপের পর ধাপে যে সকল নূতন সৃষ্টির প্রকাশ পাইয়াছে তাহার প্রথম ধাপ বা শাখা এমিবা প্রভৃতি এক কোষবিশিষ্ট জীব হইতে আরম্ভ করিয়া, সপ্তম ধাপ বা শাখা পক্ষসঞ্চালনকারী বিমানবিহারী জীব ও প্রথম স্তন্যপায়ী জীবের সৃষ্টিতে অবশিষ্ট দেড় শত কোটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। মানবের শরীরের গঠন অস্থিগুলির সংস্থিতি, মস্তিষ্ক কোঠরের শয্যা ও স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদির সংস্থান হইতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন, মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবিকাশের ধারা ইহার শেষ সীমানায় উপনীত হইয়াছে(১)। অতঃপর মানব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর পাঞ্চভৌতিক

---

(১) এ সম্বন্ধে বৈদিকযুগে জাতিভেদ ও ইহার মূলতত্ত্ব গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

দেহসম্পন্ন কোন উৎকৃষ্টতর জীবের আগমন সম্ভবপর হইবে না। একমাত্র মানবই তাহার আধ্যাত্মিক ও মানসিক সম্পদে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর ভূমিতে আরোহণ করিতে থাকিবে। জ্ঞানের পথে মানবের এই যে অভিযান আরম্ভ হইয়াছে তাহার কোন সীমানা আছে কি না কে বলিতে পারে? কি ভাবে মানব প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিজের আয়ত্বাধীন করিয়া অত্যাশ্চর্য্য নূতন নূতন ব্যাপার সকলের সৃষ্টি করিতেছে তাহার চিন্তা করিলে স্বতঃই বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। এ স্থলে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে, যেমন বেতারবার্ত্তা- ইহা স্থানের দূরত্বকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্বাধীন করিয়াছে। পৃথিবীর এক প্রান্তে যাহা ঘটিতেছে মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সংবাদ পৃথিবীর অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বেতার বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে মানবের অপরিসীম ধীশক্তির পরিচয় পাইতেছি সত্য কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর ব্যাপার সে সকল অপূর্ব কৌশল যদ্দ্বারা প্রকৃতি পৃথিবীবক্ষে সেই বার্ত্তা বহনের জন্য উপায়ের বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। ইহা আমরা সকলেই জানি সমতল ভূমি যথা কলিকাতা, হইতে দার্জিলিংএর উষ্ণতা অনেক কম—ভূপৃষ্ঠ হইতে যতই উপরের দিকে উঠা যায় বায়ুর উষ্ণতা ক্রমেই হ্রাস পায়। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫০০০ ফিট উপরে বায়ুর উষ্ণতা প্রায় ৯ সেন্টিগ্রেড্ কম। যতই উপরের দিকে উঠা যায় এই উষ্ণতা ও সঙ্গে সঙ্গে কমিতে থাকে, কিন্তু অবশেষে এমন এক বায়ুস্তর পাওয়া যায় যে স্থানের উষ্ণতায় হ্রাসবৃদ্ধি নাই। প্রথম স্তর যাহাতে ক্রমশঃ উপরের দিকে উষ্ণতার হ্রাস অনুভব করা যায় তাহা পৃথিবীর বিষুব রেখা হইতে উর্দ্ধদিকে প্রায় দশ মাইল এবং মেঘের উপরে সাত মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি ডিম্বাকৃতি স্তর। ঝড়ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়ের যত কিছু উপদ্রব (meteorological disturbance) সকলই এই স্তরে সংঘটিত হইয়া থাকে।

ইহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে আর একটি বায়ুস্তরের সন্ধান পাওয়া যায় যথায় বায়ুর উষ্ণতার ভূপৃষ্ঠের ঊর্দ্ধদিকে প্রায় ত্রিশ মাইল পর্য্যন্ত কোনরূপ হ্রাস বৃদ্ধি অনুভূত হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ প্রথম স্তরকে ট্রপোস্ফীয়ার (Trophosphere) ও দ্বিতীয় স্তরকে ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার (Stratosphere) নাম দিয়েছেন, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের শেষ সীমানার কাছাকাছি পৌছিলে বায়ুস্তরের উষ্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে দেখা যায়, ক্রমে এই তাপ পরিমাণ পৃথিবীবক্ষ হইতে এক শত মাইলের উপরে ১০০০° সেন্টিগ্রেড্ কিম্বা তাহারও অধিক হইয়া থাকে।

ষ্ট্রেটস্ফীয়ারের উপরে প্রায় দশ মাইল ব্যাপিয়া ওজন গ্যাসের আর একটি স্তর পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সূর্য্য হইতে নানা শ্রেণীর তরঙ্গরশ্মি অবিশ্রান্ত বিকীর্ণ হইতেছে। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম অতিবেগুনি রশ্মি (ultra violet rays) ও রহিয়াছে। এই আলোক তরঙ্গ পৃথিবীবক্ষ পর্য্যন্ত পৌছিলে কোন জীবই রক্ষা পাইত না, জীবকুল সমূলে বিনষ্ট হইত। বিশ্বনিয়ন্তার অপূর্ব বিধানে পৃথিবীবক্ষকে এই ওজন স্ফীয়ার (ozone sphere) বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহা ঐ মারাত্মক রশ্মিকে শোষণ করিয়া লয়—তাই জীবকুল রক্ষা পায়। এই সকল বেষ্টনীকে অতিক্রম করিলে মহাকাশ। বেতার তরঙ্গ ঐ মহাকাশের সংস্পর্শে আসিলে তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেশদেশান্তরে ছড়াইয়া যায়, এই জন্যই পৃথিবীর যে কোন স্থান হইতে তাহা শুনা যায়—আকাশচুম্বী উচ্চ গিরিশৃঙ্গ অথবা অপর যে কোন বাধাকেই ইহা সহজে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হয়।

এই সকল হইতে সহজেই মনে হয় মানবের মস্তিষ্করূপ যন্ত্রের নিকট যে সকল সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর জাগতিক তত্ত্ব ধরা পড়িবে বিধাতা পুরুষ পূর্ব হইতে তাহার ক্ষেত্র রচনা করিয়া রাখিয়াছেন। মানবের অন্তর্নিহিত এত সব শক্তি এবং তাহার

পরিচালনার সহায়ক পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন ক্ষেত্র, এই সকলের বিষয় ভাবিলে যাঁহা হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে মানবের নিকট তাঁহার আত্মপ্রকাশ একেবারেই সম্ভাবনার অতীত তাহা নাও হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে অবতার তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যা উপেক্ষণীয় নহে, অন্ততঃ এতটা বলা যাইতে পারে।

ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ ৪০—১৫, ১৬) অক্রূর মুখে তাঁহার স্তুতিপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে –

যেরূপ, জলে জলচর, উড়ুম্বর ফলের কেশরে মশকাদি ক্ষুদ্র কীটসমূহে বিচরণ করে, সেইরূপ বহু জীবসঙ্কুল লোকপালসহ লোকসকল আপনাতে বিচরণ করিতেছে। কিন্তু আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে বড়ই দুর্ঘট ব্যাপার, তাই আপনি ক্রীড়ার নিমিত্ত যে যে রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন সাধুগণ আপনার সে সকল অবতার কথামৃত সেবন দ্বারা সন্তাপ অপনোদন পূর্ব্বক আনন্দে আপনার যশ-গান করিয়া থাকে (১)।

এই স্তুতিপ্রসঙ্গে তাঁহার পূর্ব অবতারগুলির বর্ণনা,—

প্রলয়জলধি জলে আদি **মৎস্য**রূপী প্রথম অবতার।
মধুকৈটভ হন্তা **হয়গ্রীব** রূপে দ্বিতীয় অবতার।
কূর্ম্মরূপে মন্দার পর্বত ধারণরূপী তৃতীয় অবতার
পৃথিবী উদ্ধারার্থ চতুর্থ **বরাহ** অবতার।
নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, অপর কয়েক অবতার।

---

(১) ত্বয়্যব্যয়াত্মন্! পুরুষে প্রকল্পিতা লোকাঃ সপালা বহু জীবসঙ্কুলা।
যথা জলে সঞ্জিহতে জলৌকাসাঽপ্যুড়ুম্বরে বা মশকা মনোময়ে ॥ ১৫
যানি যানীহ রূপানি ক্রীড়নার্থং বিভর্ষি হি।
তৈরামৃষ্ট শুচো লোকামুদা গায়ন্তি তে যশঃ ॥ ১৬

সাত্বতগণের পতি **বাসুদেব** রূপে তাঁহার এই অবতার।
তিনিই **সঙ্কর্ষণ**, তিনিই **প্রদ্যুম্ন**, তিনিই **অনিরুদ্ধ**।
দৈত্য দানবদিগের মোহনকারী তিনি **বুদ্ধ** অবতার।
ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তিনি **কল্কি**রূপে অবতীর্ণ হন।

সনাতন গোস্বামী বৈষ্ণব তোষণি টীকায় উপরে উদ্ধৃত শ্লোক দ্বয়ের (১০-৪০-১৪,১৬) ব্যাখ্যায় অবতার গ্রহণের কারণ কি তাহা বলিতেছেন :—

"এই শ্লোকনিচয়ে অব্যয়াত্মন্ পুরুষরূপে যাঁহার স্বরূপের বর্ণনায় 'এবম্ভূতস্য তৎস্বরূপস্য জ্ঞানং দুর্ঘটং' তেন ফল বিশেষোঽপি ন দৃশ্যতে ত্বদবতার লীলা গানাচ্চ সর্বশোক নিবৃত্তি পরমানন্দ-লব্ধিশ্চেতি" বলিয়া যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা মানবের প্রতি কৃপা প্রদর্শনার্থ তাঁহার যত সব অবতার লীলা। তাঁহার গুণগান সর্বশোক নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভের হেতু।

এখানে যাঁহাকে অব্যয়াত্মন্ পুরুষ বলা হইয়াছে, এই ভাগবতে অন্যত্র (১স্ক-২-১১) বলা হইয়াছে, বেদে যিনি ব্রহ্ম, উপনিষদে তিনি পরমাত্মা, পুরাণে তিনি ভগবান (১)। এই যে ভগবান্, তিনি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন সাধন জন্য প্রাকৃতিক বৈভবে অবতীর্ণ হন। শ্রীমদ্ভাগবতে সে সকল প্রয়োজনের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভগবদ্গীতা গ্রন্থে অবতারবাদের প্রথম সুস্পষ্ট উল্লেখ, এই গ্রন্থ বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণগুলির মধ্যবর্ত্তীকালের রচনা। ফলতঃ ইহার মধ্য দিয়া উপনিষদগুলির সহিত পৌরাণিক সাহিত্যসকলের যোগ সাধিত হইয়াছে। উপনিষদের যিনি পরমাত্মা, পুরাণের তিনি ভগবান্ এধং ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে তিনি পুরুষোত্তম। গীতাশাস্ত্রে

---

(১) বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

ভগবানের অবতীর্ণ হওয়ার পুরাণোল্লিখিত যে সকল কারণ নির্দ্দেশ আছে, তদ্ভিন্ন অপর একটি বিশেষ কারণেরও ইঙ্গিত রহিয়াছে দেখা যায়। তাহা হইতেছে উপাসক উপাস্য মধ্যে যখন ভক্ত ভগবান্ সম্বন্ধ উপলব্ধির বিষয় হয়, তখন পরস্পরের মধ্যে যে কি নিগূঢ় প্রেমের সম্বন্ধ উপজাত হয় তাহা প্রদর্শন করা। বেদে আধ্যাত্মিক জীবনের নৈতিকরাজ্যে দেবতা বরুণের প্রাধান্য, পাপমোচনের জন্য তাঁহার নিকট নানারূপ কবিত্বের ভাষায় অনেক প্রার্থনা রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিধি অলঙ্ঘনীয়, ইহার ব্যতিক্রম করিলে দণ্ডভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু অতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও যদি অনন্যচিত্তে গীতার পুরুষোত্তমকে ডাকিতে পারে, তিনি তাহার সকল পাপ মার্জ্জনা করিয়া নিজের চরণে আশ্রয় প্রদান করেন, এবং তাহাতে সেই দুরাচার ব্যক্তিও অচিরে ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করে।

(অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্, সাধুরেব স মন্তব্যঃ, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।

তিনি যে পাপের মোচয়িতা ও পাপীর ত্রাণকর্ত্তা, তারস্বরে তাহা ঘোষণা করিবার জন্য অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।

(৯ম অঃ, ৩১।)

আরও বলিতেছেন, তিনি আর্ত্তজনের বন্ধু এবং সে পাপজন্মাই হউক কিম্বা আচারবিহীন স্ত্রী শূদ্র বৈশ্য যাহাই হউক না কেন, তাঁহাকে আশ্রয় করিলে সকলেই পরাগতি প্রাপ্ত হয়।

অপিচ, গীতাশাস্ত্রমতে অবতারতত্ত্বের আর একটি বড় কথা,—

"অনন্যকাম হইয়া যে সকল ব্যক্তি আমার ভজনা করে ও আমাতে নিত্যযুক্ত থাকে, আমি তাহাদিগের যোগক্ষেম বহন করি অর্থাৎ আমি তাহাদিগের ধনাদি লাভ ও রক্ষার ভার গ্রহণ করি।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯ম-২২

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ"।

তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া ভাগবতাদি পুরাণগ্রন্থগুলিতে এবং মহাভারতের (১) কোন কোন স্থানে অবতারবাদের পুষ্টিসাধিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই ঐশীশক্তির অবতীর্ণ হওয়ার আভাষ প্রাচীন ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে অবতারতত্ত্বের ক্রমবিকাশ এরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ;—

অল্প শক্তির প্রভাব হইলে বিভূতি, মহাশক্তির প্রকাশ আবেশ, আর প্রাকৃতিক বৈভবে অর্থাৎ স্থূলচক্ষুর বিষয়ভূত হইয়া পাঞ্চভৌতিক জগতে অবতরণ করিলে অবতার।

ঋগ্বেদে আবেশের দৃষ্টান্ত—

ঋষি বামদেব বলিতেছেন,—

আমি মনু, আমি সূর্য্য······আমি কবি উশনা। আমাকে দর্শন কর। ৪র্থ মণ্ডল, ২৬ সূ—১ ঋক্।

ইন্দ্র শক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া বলিতেছেন,—

আমি আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি, আমি শব্দায়মান জল আনয়ন করিয়াছি,······ঐ ২য় ঋক্।

(১) অরণ্যকাণ্ড ৪৭ সর্গ ৩১ শ্লোক—

যে যে কারণে অবতারগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে, সে সকল নাম তাঁহাতে পাওয়া যায় এবং তিনি অজ্ঞানধর্ম্মের অনেক অভিনয় করিয়াছেন। শঙ্খ চক্রাদি তাঁহাতে প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছে।

ঋষি বশিষ্ঠ বাস্তোস্পতি (গৃহরক্ষক) দেবতাকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—

তুমি রোগসকলের বিনাশক হইয়া সর্বপ্রকার রূপ মধ্যে (দেহে) প্রবেশ করিয়া আমাদের সখা হও, অতীব সুখকর হও।

৭ মণ্ডল, ৫৫ সূ, ১ ঋক্।

পুরাণশাস্ত্রগুলির মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ সমধিক প্রাচীন। ইহার চতুর্থ খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে বিষ্ণুর অবতরণ, ও পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে পরমেশ্বরের কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হওয়ার দুইটি আখ্যায়িকা আছে, তাহারা এই ;—

"ত্রেতাযুগে দেব ও অসুরগণের মধ্যে সংগ্রামে দেবগণ পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলেন ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ পরঞ্জয়ের শরীরে আমি স্বয়ং অংশে অবতরণ করিয়া অসুর-দিগকে বিনাশ করিব। দেবগণ পরঞ্জয়ের নিকট তাহা জ্ঞাপন করিলেন। পরঞ্জয় বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে ইন্দ্র ত্রিলোকের ঈশ্বর, আমি তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া অসুরদের সহিত যুদ্ধ করিব। ইন্দ্র বৃষভরূপ ধারণ করিলেন, পরঞ্জয় তাঁহার উপর উপবেশন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন এবং বিষ্ণুর তেজ দ্বারা পূর্ণ হইয়া যুদ্ধে অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন।

আখ্যায়িকাটি আবেশ ও অবতার উভয়েরই দৃষ্টান্ত।

অপর আখ্যায়িকা ;—

ভগবান্ নারায়ণ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ দুইটী কেশ তুলিয়া দেবগণকে বলিলেন, এই আমার কেশদ্বয় ভূতলে অবতরণ করিয়া ভূমির ভার ও ক্লেশ দূর করিবে (৫০।৬০ শ্লোক)। বসুদেবের দেবোপমা পত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে এই কেশ জন্মিবে (৬৩ শ্লোক)।

ভগবানের যে সকল কিরণ প্রকাশ পায় তাহা কেশ, এই জন্য তাঁহার এক নাম কেশব। শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভে নৃসিংহ পুরাণ হইতে উদ্ধৃত একটি বচনে কেশ শব্দের স্থলে শক্তি শব্দ ব্যবহার করিয়া বলা হইয়াছে, "শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ আমার শক্তি যদুকুলে বসুদেব হইতে দেবকীতে অবতরণ করিয়া কংসাদিকে বিনাশ করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবতে (২স্ক-১৬-১৮) উক্ত হইয়াছে—ভগবানের অভয়প্রদ বিশ্বাত্মা অংশভাবে প্রথম বসুদেবের মনে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

প্রথমোক্ত আখ্যায়িকাতে পরঞ্জয়ের শরীরে ভগবানের শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল; দ্বিতীয়টিতে তাহা বসুদেবের মনে প্রবেশ করিয়াছিল, দেবকীও মন দ্বারা তাহা ধারণ করিয়াছিলেন।

তিনি নিজের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি অশেষ ঐশ্বর্য্য বৈভব দ্বারা জগতের চিত্ত আকর্ষণ করেন এজন্য তাঁহার নাম কৃষ্ণ (শ্রীমদ্ভাগবত ৫অ ১৩ শ্লোক)। সনাতন গোস্বামী ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি অশেষ ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিয়া জগচ্চিত্তকে আকর্ষণ করেন। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু সমস্তই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট, এইজন্য তাঁহাকে কৃষ্ণ নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মহাভারত শান্তি পর্বের ৩৪৩ অঃ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেন;—আমি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করি, এবং আমার বর্ণও কৃষ্ণ, এই জন্য আমি কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছি।

দেখা যায় অতি প্রাচীন কালে অনার্য্য আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যেও এই নাম প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে এই নামীয় একজন অনার্য্য নরপতির সঙ্গে আর্য্যদিগের সংঘর্ষের বিবরণ পাওয়া যায়। এই বীর যে কিরূপ পরাক্রমশালী ছিলেন সূক্তের ১৩, ১৪, ১৫ মন্ত্র হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইন্দ্র সংগ্রামে আর্য্যদিগের পরম সহায় ও নেতা; কিন্তু

এই অনার্য্য নরপতির সঙ্গে তিনিও আটিয়া উঠিতে না পারিয়া মরুৎগণের অর্থাৎ দৈবদুর্য্যোগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। চতুর্দ্দশ মন্ত্রে তিনি বলিতেছেন ;—

"কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর তীরস্থ নিভৃত প্রদেশে **সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশালী** হইয়া অবস্থিতি করিতেছে, হে অভিলষিত মরুৎগণ! তোমরা যুদ্ধে সহায় হইয়া তাহাকে সংহার কর।"

কিন্তু মরুৎগণের সাহায্যলাভ সত্ত্বেও তিনি এই বীরকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হইলেন। অবশেষে রণকৌশল ও সুচতুর রাজনীতি এই উভয়ের প্রয়োগ করিয়া ইন্দ্র কৃতকার্য্য হইলেন।

সে যাহাহউক ঋগ্বেদের এই অষ্টম মণ্ডলে কৃষ্ণ নামক একজন আর্য্য ঋষিরও নাম পাওয়া যায়। তিনি এই মণ্ডলের ৮৫ সূক্ত ও দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তের মন্ত্রগুলির ঋষি। অনুক্রমণিতে তাঁহাকে আঙ্গিরস কৃষ্ণ বলা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র বিশ্বকও অষ্টম মণ্ডলের ৮৬ সূক্তের ঋষি। তাঁহাকে কার্ষ্ণি বলা হইয়াছে। কৃষ্ণের পৌত্র এবং বিশ্বকের পুত্র বিষ্ণাপুর নামও পাওয়া যায়, যথা, (১—১১৬—২৩ ; ১—১১৭—৭)। এতদ্‌ভিন্ন বৈদিক সংহিতাগুলির আর কোন স্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ দেখা যায় না।

ইহার পর ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য এক কৃষ্ণের নামোল্লেখ আছে। তিনি তথায় দেবকীনন্দন নামে কথিত হইয়াছেন। বৈদিক সাহিত্যে আর কোথাও কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের উল্লেখ নাই। ইহার পর কৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ মহাভারতে বর্ণিত দ্রুপদ রাজার গৃহে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। মহাভারত গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরে রচিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থ ৮০০০ শ্লোকাত্মক। ইহা প্রথমতঃ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে সুত (ভাট) মুখে কীর্ত্তিত হইত। পিতৃহন্তা তক্ষকের

রাজধানী অবরোধ কালে জন্মেজয়কে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন তাঁহার পিতামহ অভিমন্যু, প্রপিতামহ অর্জ্জুনাদির বীরত্ব কাহিনী বর্ণনা করেন। ইহাই দ্বিতীয় স্তরের রচিত ভারতসংহিতা গ্রন্থ। ইহা চব্বিশ হাজার আট শত শ্লোকপূর্ণ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবনের ঐতিহাসিক বিবরণ সকল মুখ্যতঃ মহাভারতের এই দ্বিতীয় স্তরেই নিবদ্ধ। ইহাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া এক লক্ষ শ্লোকাত্মক বর্ত্তমান মহাভারত ইহার বহু পরবর্ত্তী কালে নৈমিষারণ্যে শৌনকের যজ্ঞের সময় রচিত হইয়াছে। বিশেষ অনুধাবনার সহিত অধ্যয়ন করিলে মহাভারতের এই ত্রিবিধ স্তরকে বিশ্লেষণ করা কষ্টসাধ্য হইলেও একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নহে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় যখন কৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ সে সময় হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের অনেক কাহিনীর ধারাবাহিক বিবরণ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে জানা যায় সেকালে ক্ষত্রিয়দিগের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে গুরুগৃহে গমন করিতে হইত এবং তথায় ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত থাকিয়া চতুর্বিংশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত; কেহ কেহ তাহার ঊর্দ্ধকালও গুরুগৃহে অবস্থান করিতেন। অধ্যয়ন কালে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। কোন কোন শিষ্য আজীবন ব্রহ্মচারী থাকিতেন। তাঁহাদিগকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা হইত। কেবলমাত্র অধ্যয়নার্থ যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করতঃ অধ্যয়নান্তে গৃহে সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিয়া গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করিতেন তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যকে উপকুর্ব্বান ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত করা হইত। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পূর্ব্বেই কৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্য জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। তিনি গৃহে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। দ্বারকা হইতে তিনি যে সময় দ্রুপদ রাজার

সভায় আগমন করেন সে সময় তাঁহার বয়স অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। মহাভারতের আদি পর্বে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণের তিন মাসের ছোট বলা হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্য দ্রুপদ রাজার নিকট অবজ্ঞাত হইয়া বৈরনির্য্যাতন স্পৃহায় ভীষ্মের নিকট আগমনকরতঃ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ, কর্ণ ও পাণ্ডবদিগের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে গুরু-দক্ষিণার সময় আসিলে তিনি দ্রুপদ রাজাকে রণক্ষেত্র হইতে বন্দী করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার দক্ষিণা চাহিলেন। গুরুর পণ রক্ষার জন্য শিষ্যগণ পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দ্রুপদ রাজা পরাভূত হন। ইহার পর পাঞ্চালরাজ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া দ্রোণান্তক পুত্র লাভের জন্য এক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং তাহা হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা দ্রৌপদীকে লাভ করেন। . স্বয়ম্বরকালে দ্রৌপদীর বয়স যদি অন্ততঃ ষোল বৎসর ধরা যায় এবং যে যজ্ঞ হইতে তাঁহার জন্ম, সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যদি আরও দুই বৎসর ধরা যায়, তবে দ্রোণাচার্য্যের প্ররোচনায় ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদিগের পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের অন্ততঃ আঠার বৎসর পূর্বেকার ঘটনা হয়। অর্জ্জুনের বয়স সে সময়ে অন্ততঃ সতের আঠার ছিল এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কারণ পাণ্ডব ও কৌরবরা সকলেই প্রায় সমবয়স্ক ছিল। এই হিসাব হইতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে অর্জ্জুনের বয়ক্রম ৩৬ বৎসর ধরা যাইতে পারে। কৃষ্ণ অর্জ্জুন হইতে মাত্র তিন মাসের বড়, সুতরাং কৃষ্ণের বয়সও সে সময়ে ৩৬ বৎসর ছিল দেখা যায়। সুতরাং দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গুরুগৃহে গমন হইতে তাহার পরবর্ত্তীকালের জীবনের ইতিহাস ছান্দোগ্য উপনিষদ ও মহাভারত হইতে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু ইহার পূর্ববর্ত্তী একাদশ বৎসরের কোন উল্লেখই কোন বৈদিক সাহিত্যে কিম্বা মূল ভারত সংহিতাতে নাই।

মহাভারতের খিল হরিবংশ ও পুরাণাদিতে কৃষ্ণের বাল্য-জীবনের বর্ণনা আছে। ইহাদিগের মধ্যে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রধান বলিয়া গণ্য। কথিত আছে মহাভারতের ন্যায় মহৎ ও বিরাট গ্রন্থ (মহত্বাৎ বৃহত্ত্বাচ মহাভারতঃ স্মৃতঃ) রচনা করিয়াও মহর্ষি বেদব্যাস আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। হিমালয়ে সরস্বতী তীরে আপনার আশ্রমে তিনি বিমর্ষ মনে অবস্থিত রহিয়াছেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের বাল্যলীলাবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিতে আদেশ করেন। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার বাল্যজীবনের লীলাসকলের সবিস্তার বর্ণনা আছে। এই সকল লীলা তাঁহার অবতার গ্রহণ বিষয়ের শ্রেষ্ঠ উপকরণ। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তাঁহার বাল্যলীলা।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে (৩ স্ক, ২ অঃ, ২৬ শ্লোক) বলা হইয়াছে, তিনি ব্রজে বলরামের সহিত একাদশ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার তেজ প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থেই বাল্য-জীবনের নানাপ্রকার অলৌকিক কাহিনীর বর্ণনা রহিয়াছে দেখা যায়। তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হন মাতুল কংসের কারাগারে। কংস নিজের পিতাকে অতিক্রম করিয়া মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অত্যাচারে দেশ যখন বিশেষভাবে সন্ত্রাসিত, তখন তিনি জানিতে পারিলেন তাঁহাব ভগিনী দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তাঁহার নিহন্তা হইবেন। তিনি ভগিনী ও ভগিনীপতি বসুদেব উভয়কেই কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। তথায় দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ হন। প্রসবের পরই পিতা বসুদেব শিশুকে যমুনার অপর পারে ব্রজে বন্ধু নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত করেন। তথায় নন্দপত্নী যশোদার কোলে তিনি বর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

তাঁহার ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই কারাগারের দ্বার আপনা আপনি

খুলিয়া যায়, তাহাতে পিতা তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হন।

যখন তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র তিন মাস তখন একদিন তিনি দধি দুগ্ধাদি নানাবিধ রসসম্ভারপূর্ণ কাংস্যাদি পাত্র বোঝাই শকটকে পদচালনা দ্বারা উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন।

এক বৎসর বয়সে তিনি তৃণাবর্ত্ত কর্ত্তৃক আকাশপথে অপহৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু দানব তাঁহার গুরুভার বহনে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলে তিনি এরূপ সজোরে তাহার কটিদেশ ধারণ করিয়া রহিলেন যে তাহাতেই ঐ দানবের মৃত্যু ঘটিল। পুতনা বধ ও এতাদৃশ অপর একটি দৃষ্টান্ত।

শৈশব বয়সেই একদিন মা যশোদার ক্রোড়ে স্তন্যপান করিতে করিতে শিশু একবার মুখব্যাদন করিলে যশোদা তাঁহার মুখবিবরে আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইয়াছিলেন।

বালক হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে। তাঁহার চঞ্চলতার জন্য গৃহকার্য্যে যাহাতে ব্যাঘাত না ঘটিতে পারে তজ্জন্য যশোদা তাঁহাকে একটা উদূখলের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়া গেলেন। উদূখল তাঁহার উদরের সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ছিল। বালক পশ্চাৎস্থিত উদূখলটি বেগে আকর্ষণকরতঃ দুইটি বৃহৎ যমলার্জ্জুন বৃক্ষকে এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, উভয় বৃক্ষই সমূলে ধরাশায়ী হইল।

একদিন এক ফলবিক্রয়িণীর ফলভাণ্ডে দুইটি কি তিনটি ধান্য অর্পণ করিলে তাহাতেই ঐ ভাণ্ড নানাবিধ রত্নে পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার কিছুকাল পর ব্রজধামে দৈত্য দানবদিগের অত্যাচার হইতে বালককে রক্ষা করিবার জন্য গোপগণ ব্রজধাম পরিত্যাগ-করতঃ স্বাস্থ্যপ্রদ জল ও তৃণলতায় পরিশোভিত গবাদির পরম

হিতকর এবং গোপগোপী সকলের বাসোপযোগী বৃন্দাবনে বসতি নির্ম্মাণ করে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা, গোবর্দ্ধন পাহাড়, যমুনা-পুলিন, প্রভৃতি সকলই পরম মনোরম।

ব্রজধামে কৃষ্ণ ও বলরাম তুই বৎসর তিন মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যেই বহু অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বৃন্দাবনে আসার কয়েক মাস পরে অন্যান্য গোপ বালকেদের সঙ্গে গোচারণের মাঠে খেলা করিতেন ও বৎসদিগকে চরাইতেন। বৎসাসুর ও বকাসুর নামক তুই দৈত্যবধ এই বয়সের ঘটনা। অজগররূপী অঘাসুরের মধ্যে প্রবেশকরতঃ নিজের দেহ বৃদ্ধি করিয়া সর্পের কণ্ঠরোধ পূর্বক ইহাকে বিনাশ করা এবং ইহার উদর হইতে গোপবালকগণ ও গোপালকে রক্ষা করা আর একটি ঘটনা। এই সময় তাঁহার বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি গোচারণে প্রবৃত্ত হন, ইহা হইল তাঁহার রাখাল বালকদের সঙ্গে গোষ্ঠলীলার কাল। এই সময়ের অলৌকিক ঘটনা কালীয়দমন, ধেনুকাসুর বধ ও মুখদ্বারা দাবাগ্নি পান করিয়া তাহা হইতে গোধন ও রাখালদিগকে রক্ষা করা।

ধেনুকাসুর বধের পর সখাগণসহ তিনি যখন মধুর বংশীবাদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন তখন ঐ বংশীরবে আকৃষ্টচিত্ত ব্রজাঙ্গনাগণ তাঁহার মুখনিঃসৃত হাস্য মধু পান করিয়াছিলেন; এবং তিনি নিজেও তাঁহাদিগের "সলজ্জ হাস্য ও বিনয় মধুর কটাক্ষ নিক্ষেপরূপ পূজা গ্রহণ করিতে করিতে ব্রজে প্রবেশ করিয়াছিলেন :—

"তৎসৎকৃতিং সমাধিগম্যবিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড় হাসবিনয়ং যদপাশ মোক্ষম্॥

১০ স্ক ১৫ অ ৪৪ শ্লোক।

এই স্কন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে শরৎকালের বর্ণনা—সরোবর ও নদী সকলের কোলে কোলে জল ছাপিয়া উঠিতেছে, পর্বত সকল নয়নাভিরাম শ্যামল বসনে পরিহিত হইয়াছে, পাদপশ্রেণী বিবিধ পুষ্পসম্ভারে সুশোভিত, মত্তভৃঙ্গ ও বিহঙ্গমগণ মধুপানে উন্মত্ত হইয়া কলধ্বনিতে কাননভূমি মুখরিত করিতেছে, আর প্রকৃতির এই সুমধুর শরৎশ্রীর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও গোপবালকগণ সহ গোচারণে রত থাকিয়া বেণুবাদন করিতেছেন।

ব্রজাঙ্গনাগণ শ্রীকৃষ্ণের সেই মদনোদ্ভবকারী বেণুধ্বনি শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইতেছে, এবং ভাবোন্মত্ত ভাবে পরস্পর আলিঙ্গন এবং কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিতেছে এবং তাঁহার অধর সুধাপানের জন্য "মদনাবেগে ধৈর্য্যচ্যুতা" হইতেছে। 'বেণুগীত' নামক এই অধ্যায়টী মদনশর-প্রপীড়িতা গোপীগণের এরূপ নানারূপ উক্তিতে পূর্ণ। শরৎকালে বংশী-বাদনের পর হেমন্তে গোপীদিগের বস্ত্রহরণ।

ইহার পরবর্ত্তী উল্লেখযোগ্য ঘটনা গোবর্দ্ধন ধারণ, বরুণের নিকট হইতে নন্দরাজকে মোচন ও রাসলীলা।

গোবর্দ্ধন ধারণ করার সময় তাঁহার বয়স মাত্র সাত বৎসর ছিল। তিনি অবলীলাক্রমে পর্বতকে উত্তোলনকরতঃ একমাত্র বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা সাতদিন ইহাকে ছত্রাকারে ধারণ করিয়া ইন্দ্রের কোপ-জনিত বারিবর্ষণ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১। (১০ স্ক ২৫ অ ১৯ শ্লোক।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে কৃষ্ণ সপ্তম বৎসর বয়সে কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যাতে ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া তৎপর দিন গোবর্দ্ধন মহোৎসব করেন। তৃতীয়া হইতে নবমী পর্য্যন্ত গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। তাহার তিন দিন পর দ্বাদশীতে বরুণের নিকট

(১) পুরাণ মতে সে সময় তাহার অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রম ছিল

হইতে পিতা নন্দকে বিমোচন করেন। পৌর্ণমাসীতে গোপগণকে ব্রহ্মলোক প্রদর্শন করান। তাহার পর অষ্টম বর্ষের আশ্বিনী পূর্ণিমায় রাসোৎসব আরম্ভ করেন। কাহারো কাহারো মতে রাসোৎসবের সময় তাঁহার ৯ বৎসর বয়স ছিল। ইহার পরবর্ত্তী বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা অক্রূরসহ তাঁহার গোকুল হইতে মথুরায় আগমন, তথায় ধনুর্ভঙ্গ করণ এবং ভঙ্গ ধনু খণ্ড দ্বারা রক্ষীগণকে বধ, কুবলয়পীড় নামক হস্তী বধ, মল্লদিগকে বধ ও অবশেষে কংস ও তাঁহার ভ্রাতাদিগকে বধ করিয়া পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীকে কারাগার হইতে মোচন। এই সকলের মধ্যেই তাঁহার অলৌকিক শক্তির নিদর্শন রহিয়াছে। মথুরায় গর্গাচার্য্য কর্ত্তৃক তাঁহার উপনয়ন সংস্কার কার্য্য সমাপনান্তে তিনি তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া অবন্তীপুর নিবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট উপনিষদসহ ষড়ঙ্গবেদ, ধনুর্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, বর্ণবিদ্যা, ষড়বিধ রাজনীতি, প্রভৃতি সকল শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ইহার ৪৫ অধ্যায়ের ৩৫।৩৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে কৃষ্ণ বলরাম উভয়ই শ্রুতিধর ছিলেন। তাঁহারা চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা আয়ত্ত করেন এবং প্রভাসতীর্থে সমুদ্রজলে নিমগ্ন মৃত গুরুপুত্রকে উদ্ধার ও তাহাকে পুনর্জীবন দানকরতঃ গুরুর নিকট ফিরাইয়া দিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন। পরবর্ত্তী জীবনে এরূপ অলৌকিক অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। শতাধিক ষোড়শ সহস্র পত্নীর সঙ্গে বিহার এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের গর্ভে দশজন করিয়া পুত্রোৎপাদন ইহাদিগের মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনা তাঁহার নারায়ণ সন্নিধানে গমন ও তথা হইতে জনৈক ব্রাহ্মণের নয়টি মৃত পুত্রকে আনয়ণ করা। দশম স্কন্ধের ৮৯ অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা আছে। ব্রাহ্মণের ক্রমে এক একটি করিয়া ৯টি পুত্রই জন্মমাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। শেষপুত্রের মৃত্যু হইলে ব্রাহ্মণ আক্ষেপ করিয়া বলেন, ক্ষত্রিয়বেশধারী রাজারা নটের সদৃশ,

তাঁহারা প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহে। ইহা শুনিয়া অর্জ্জুন ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া বিদ্যাপ্রভাবে সংযমনীপুরীতে যমের নিকট গমনপূর্ব্বক সেখানে ব্রাহ্মণ পুত্রদিগকে দেখিতে না পাইয়া ক্রমে ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র প্রভৃতি সকলের পুরীই অনুসন্ধান করেন কিন্তু কোথাও ব্রাহ্মণ পুত্রদিগকে পাইলেন না। অর্জ্জুন ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন এবং নিজের এই নিষ্ফল চেষ্টায় ব্যথিতচিত্ত হইয়া অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া দিব্যাশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক পশ্চিমদিকে গমন করেন। ক্রমে সপ্তসমুদ্র বেষ্টিত সপ্তদ্বীপ, সপ্তপর্বত ও লোকালোক সমুদয় অতিক্রম করিয়া নিবিড় অন্ধকারে প্রবেশ করিলেন। অশ্বগণ তথায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না, তখন 'মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ' সহস্রসূর্য্যরশ্মিপ্রভ সুদর্শন চক্রকে সেই নিবিড় তমো মধ্যে প্রয়োগ করিলেন এবং তাঁহার প্রকৃতির পরিণামস্বরূপ অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই অন্ধকারের পশ্চাতে অনন্ত পরম জ্যোতিঃ (পরং জ্যোতিরনন্তপারং) বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। চক্রপথে অন্ধকার অতিক্রমপূর্ব্বক ঐ জ্যোতির সম্মুখীন হওয়ামাত্র অর্জ্জুন প্রতিহতদৃষ্টি হইয়া নেত্র নিমীলিত করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা অতি বেগে বৃহৎ উর্ম্মিসঙ্কুল সলিল মধ্যে প্রবেশ করিলেন; তথায় সহস্রমণিস্তম্ভশোভিত এক অদ্ভুত পুরী দেখিতে পাইলেন। সেই পুরীতে সহস্র মস্তক ও দ্বিসহস্র চক্ষুবিশিষ্ট এবং মস্তকের ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জ্বল এবং স্ফটিক পর্বতবৎ নীলকণ্ঠ, নীলজিহ্ব অদ্ভুত-দর্শন অনন্তকে দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন সেই অনন্তের দেহরূপ আসনে সর্ববব্যাপী তেজঃপূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন প্রভাবসম্পন্ন পুরুষোত্তম হইতেও শ্রেষ্ঠ এক পুরুষ উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

সুনন্দ, নন্দ প্রভৃতি নিজ পার্ষদগণ, মূর্ত্তিমান চক্রাদি নিজ অস্ত্রসকল এবং পুষ্টি, শ্রী, কীর্ত্তি, অজা, বিভূতি প্রভৃতিও সেই ভগবানের সেবা করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সেই অনন্ত আত্মাকে প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। পরমেষ্টি-গণের অধীশ্বর হাস্যপূর্বক তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"হে কৃষ্ণার্জ্জুন! তোমরা আমার অংশ, ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদিগকে দেখিবার জন্য আমি ব্রাহ্মণ পুত্রদিগকে এখানে আনিয়াছি। এইক্ষণে তোমরা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অসুরগণের সংহার করিয়া পুনর্বার শীঘ্র আগমন কর। তোমরা নর-নারায়ণ ঋষি; নিজেরা পূর্ণকাম হইয়াও লোক শিক্ষার জন্য ধর্ম্মাচরণ করিতেছ।"

ভগবান পরমেষ্টিপতি এরূপ বলিলে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন "তাহাই হউক" এরূপ বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং ব্রাহ্মণের পুত্রসকলকে গ্রহণপূর্বক দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলেন ও ব্রাহ্মণহস্তে তাঁহার পুত্রদিগকে সমর্পণ করিলেন। (১)

এই সকল কাহিনী আলোচনা করিবার পূর্বে মহাভারতে কৃষ্ণের জীবন সম্বন্ধে যে সকল ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় মহাভারতে সর্বপ্রথম আমরা কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবদের মাতা কুন্তী তাঁহার পিতৃশ্বসা। জতুগৃহদাহে পাণ্ডবগণ জননী সহ পুড়িয়া মারা গিয়াছেন, ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানেরা এই ভাবিয়া নিজেদের নিরাপদ মনে করিতেছিলেন। এদিকে বিদুর পূর্বেই তাঁহাদিগকে আগুণে পুড়িয়া মারিবার যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্নি-সংযোগের পূর্বে নিরাপদে ঐ গৃহ হইতে বাহির হইয়া ব্রাহ্মণের

(১) ১০ স্কন্ধ, ৮৯ অধ্যায়, ৪৬—৬১ শ্লোক।

ছদ্মবেশ অবলম্বনপূর্বক নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে পাঞ্চাল রাজার রাজধানীতে উপনীত হন। এখানে পাঞ্চাল ও কুরুবংশীয়দিগের সংক্ষেপ বিবরণ প্রয়োজন। উভয় বংশ ঋগ্বেদের পঞ্চ কৃষ্টির অন্যতমকৃষ্টি পুরু শাখার (যাহা সুদাস রাজার সংগ্রামে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই তাহার) অন্তর্গত। সে সময় উভয় রাজ্যই সমৃদ্ধিশালী ছিল।

পুরু হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ অজমির। অজমিরের ছয় পুত্র, তন্মধ্যে তুষ্মন্ত ও পরমেষ্টি হইতে পাঞ্চাল বংশের উদ্ভব। ইহাদিগের অধিকৃত রাজ্যের নাম উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল। দক্ষিণ পাঞ্চাল উত্তরদিকে গঙ্গানদী ও দক্ষিণে চাম্বলনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, উত্তর পাঞ্চাল দক্ষিণে গঙ্গাতীর হইতে উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত।

অজমিরের অপর পুত্র ঋক্ষ হইতে সম্বরণের জন্ম। সম্বরণ পাঞ্চালরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী পার্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। কথিত আছে, তিনি বশিষ্ঠকে পৌরহিত্বে বরণ করেন এবং তাঁহার মন্ত্রণা কৌশলে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন।

সম্বরণের পুত্র কুরু। সম্বরণের সময় হইতে পুরুবংশের এই দুই শাখার মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি। কুরু হইতে অধস্তন দশম পুরুষ ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। দ্রৌপদীর পিতাও সম্ভবতঃ সম্বরণ-বিজেতা পাঞ্চালরাজ হইতে ঐরূপ দশ এগার পুরুষ অধস্তন ছিলেন।

দ্রৌপদীর পিতা ও দ্রোণ মহর্ষি অগ্নিবেশের শিষ্য ছিলেন। উভয়ে তাঁহার নিকট অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেন। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা পরস্পরকে সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না এরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ হন।

দ্রুপদ যথাকালে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দ্রোণও অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তণ করিয়া দারপরিগ্রহ-পূর্ব্বক সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। সময়ে তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করিলেন। কঠিন দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া দ্রোণের জীবন অতিবাহিত হইতেছিল। বহু চেষ্টাতেও পুত্রের জন্য দুগ্ধের সংস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি পূর্ব্ববন্ধু দ্রুপদ রাজার নিকট উপস্থিত হন ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত রাজা পুরাতন বন্ধুকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে চিনিতেই পারিলেন না। পরস্পর যে গুরুগৃহে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হইল না। দ্রোণকে প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। এই অপমান তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিলেন না। কিরূপে ইহার প্রতিশোধ লইবেন, তাহারই উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। অবশেষে ভীষ্মের নিকট আগমনপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ ও দুর্য্যোধন-সখা কর্ণের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন।

শিক্ষা সমাপনান্তে যখন গুরু-দক্ষিণার সময় উপস্থিত হইল, তখন দ্রুপদ রাজাকে রণক্ষেত্র হইতে বন্দী করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, শিষ্যদিগের নিকট এই দক্ষিণা দাবী করিলেন। গুরুর আদেশ রক্ষার জন্য তাঁহারা পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। পাঞ্চালরাজ যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সমগ্র দক্ষিণ পাঞ্চালরাজ্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

রাজা দ্রুপদ প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া মহর্ষি উপযাজের পৌরোহিত্যে দ্রোণান্তক পুত্রলাভের অভিলাষ করিয়া এক পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞবেদি হইতে পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর) জন্ম হয়।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে কৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম সহ স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হন। মহাভারতে এই তাঁহাদের প্রথম উল্লেখ। চতুর্দ্দিক হইতে সব নরপতিগণ দ্রৌপদীর পাণিপ্রার্থী হইয়া

উপস্থিত হইয়াছেন, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতিও আসিয়াছেন। পাণ্ডবগণও ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। এরূপ বর্ণনা আছে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে সভায় উপস্থিত করিয়া ধনু ও তীরের প্রতি উপস্থিত রাজাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক লক্ষ্যভেদের উল্লেখ করিলে, অনেকেই পর পর তাহার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন, তখন কর্ণ ধীরপদে আগমনকরতঃ ধনু গ্রহণপূর্বক শরসন্ধানে উদ্যত হইতেছেন এমন সময় দ্রৌপদী দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সারথিপুত্রকে বিবাহ করিব না।" ইহা শ্রবণ করিয়া কর্ণ নিরস্ত হইলেন এবং একবার উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপূর্বক ধীরপদে পুনর্বার নিজের আসনের দিকে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর ব্রাহ্মণবেশী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন।

এরূপ বর্ণনা আছে কৃষ্ণ উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত ও মালা-চন্দনে বিভূষিত হইয়া স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এদিকে কুন্তী প্রমাদ গণিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার পুত্রদিগের কুমন্ত্রণায় পাণ্ডব-দিগকে বিনাশ করিবার জন্য নানা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন—জতুগৃহ দাহে তাহা প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল—একমাত্র বিদুরের সতর্কবাণীর জন্যই সে যাত্রা তাঁহারা রক্ষা পায়। কৌরবদিগের কিন্তু ধারণা ছিল, মাতাসহ পাঁচ ভাই সকলেই অগ্নিতে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। তদবধি ভিখারী ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তাঁহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদের কোপানল হইতে নিজেদের প্রাণ বাঁচাইয়া আসিতে-ছিলেন। পাণ্ডবরা বাঁচিয়া আছে, বিশেষতঃ অর্জ্জুন স্বয়ম্বর সভায় সমবেত রাজন্যবর্গকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন, এই সংবাদ পাইলে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য আরও কত কিছু উপায় অবলম্বন করিতে পারেন এই চিন্তায় কুন্তী যখন আকুল, তখন কৃষ্ণ তাঁহার নিকট উপস্থিত

হইয়া আত্মপরিচয় দিলেন। (মহাভারতে কুন্তীর সহিত এই তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ)। তিনি দ্বারকা হইতে স্বয়ম্বর সভায় আগমন করিয়াছিলেন। কুন্তী ইহার পূর্বে তাঁহাকে দেখেন ন্যই। তাঁহার পুত্রগণ সঙ্গেও ইতঃপূর্বে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে নাই, কিন্তু দেখা যায় তাঁহার যশঃসৌরভ ইতিমধ্যেই সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। কৃষ্ণ আত্মপয়িচয় প্রদানপূর্বক মূল্যবান উপঢৌকনসহ দ্রৌপদীর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বীর্যবত্তা ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার সংবাদ যে পূর্ব হইতেই কুন্তী রাখিতেন কুন্তীর সে সময়ের আচরণ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি সকল বিষয়ে কৃষ্ণের সহায়তা যাচ্ঞা করিলেন এবং নিজের পুত্রদিগের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

আর একটি প্রমাণ—পাণ্ডবরা বাঁচিয়া আছে এবং কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন এই সংবাদ যখন ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণে পৌঁছিল তখন তিনি বড়ই চিন্তার মধ্যে পড়িলেন। কূটনীতি-বিশারদ চতুর নরপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি নিজের পুত্রদিগের সমতুল্য আদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিদূরকে পাঠাইলেন। কুন্তী কৃষ্ণের পরামর্শে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং কৃষ্ণও তাঁহাদিগের সঙ্গে থাকিবেন, এই ভরসায় ভাবী বিপদের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন। কুন্তীপুত্রগণ কৃষ্ণ সঙ্গে প্রত্যাগমন করিতেছেন জানিতে পারিয়া ধৃতরাষ্ট্র আবায় চিন্তায় আকুল হইলেন, কপট নরপতি বাহ্যিক অপরিসীম স্নেহ দেখাইয়া পাণ্ডবদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। পরম সমাদরের সহিত নববধূকে বরণ করিয়া লইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে খাণ্ডবপ্রস্থ মহাবন নামে প্রসিদ্ধ অর্দ্ধেক রাজ্যভূমি তাহা-দিগকে প্রদান করিলেন। যমুনার পশ্চিম পারে ইহার সামান্য অংশই তখন আবাদের উপযোগী ছিল। প্রায় সমস্তটাই হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ এবং অনার্য্যদিগের অধিকৃত ছিল। আপাতঃ

দৃষ্টিতে এই অরণ্যভূমির বিশেষ মূল্য ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার দূরদৃষ্টিতে ইহার অনেক উন্নতির সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া পাণ্ডবদিগকে প্রস্তাবে সম্মত হইতে পরামর্শ দিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও একটি কারণে কৃষ্ণ প্রস্তাবের অনুমোদন করেন। পাণ্ডবরা চতুর্দ্দিকে প্রবল দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত, ধৃতরাষ্ট্রের অন্তরের কুভাব সকলই কৃষ্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন; পাণ্ডবদিগের আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে হইলে সময়ের প্রয়োজন। সমৃদ্ধিশালী জনপদগুলির সবই যখন নিজের পুত্রদের রহিল, তখন সম্প্রতি কিছুকালের জন্য পাণ্ডবদিগের কোনরূপ অনিষ্ট চেষ্টা প্রয়োজন হইবে না।

অরণ্যভূমিকে আবাদ ও বাসোপযোগী জনপদে পরিণত করা পরিশ্রম ও অর্থসাপেক্ষ হইলেও ইহার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ, বিশেষতঃ নিজের ইচ্ছানুরূপ ইহাতে রাজধানী স্থাপিত হইতে পারে। কার্য্যতঃ ও তাহাই হইল। যমুনার তীরবর্ত্তী ভূমিখণ্ডে রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী প্রতিষ্ঠিত হইল এবং অরণ্যভূমি আবাদ করিয়া তাহাতে সাধারণের বসতি স্থাপিত হইতে লাগিল। একমাত্র কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে এই নূতন রাজ্যের ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। তাঁহার মন্ত্রণা কৌশলে অচিরকাল মধ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ এক সমৃদ্ধিশালী নগরী হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠিরের অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃতি হইয়া পড়িল। নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণ প্রমুখ সকল শ্রেণীর লোক দলে দলে এই নূতন রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। খাণ্ডবপ্রস্থের অরণ্যভূমি এক নয়নাভিরাম জনপদে পরিণত হইল।

প্রজার মনস্তুষ্টিই যে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, কৃষ্ণের মন্ত্রণা কৌশলে এই নূতন রাজ্য তাহা প্রমাণ করিল। এই অরণ্যভূমিতে নাগোপাসক ও দানব (মঙ্গোলীয়) এই দুই অনার্য্য জাতির বসতি ছিল। সমগ্র অরণ্যভূমিকে আগুন দিয়া পুড়াইয়া দেওয়া হইয়া-

ছিল। কথিত আছে এই বেড়া আগুনে পড়িয়া নাগরাজ তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন এবং ময়দানব এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।* নাগরাজ তক্ষক সে সময় কুরুক্ষেত্রে ছিলেন (ক)। ইহা হয়ত অতিরঞ্জিত দোষদুষ্ট বর্ণনা, কারণ নাগরাজ তক্ষক ইহার পর তক্ষশীলাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ইহাও একটী সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তক্ষক খাণ্ডবপ্রস্থ হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার পৌত্র পরীক্ষিতের প্রাণ হরণ করিয়া তিনি তাহার প্রতিশোধ লন। পরীক্ষিৎ-পুত্র জন্মেজয় পিতৃহন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন ও তাহার রাজধানী তক্ষশীলা অবরোধ করেন। ইহাই পুরাণবর্ণিত সর্পযজ্ঞ। এই সময় ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃক ২৪৮০০ শ্লোকাত্মক ভারত উপাখ্যান বর্ণিত হয়। কৃষ্ণজীবনের ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অবগত হইবার ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। দীর্ঘকাল অবরোধের পরও তক্ষশীলার পতন হয় নাই। অবশেষে আস্তিক মুনির মধ্যবর্ত্তিতায় সন্ধি স্থাপিত হয়। আস্তিক নিজে আর্য্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা অনার্য্য-নাগ-দুহিতা ছিলেন।

সম্ভবতঃ খাণ্ডবনিবাসী অনার্য্যদিগের উপদ্রব হইতে নূতন স্থাপিত জনপদকে রক্ষার জন্য অনার্য্যদিগকে বিতাড়ন ভিন্ন আর উপায় ছিল না, এবং সেজন্যই বনভূমিকে পুড়াইয়া দেওয়া সহজ পন্থা বলিয়া তাহা অবলম্বিত হইয়াছিল। অনার্য্যদিগের প্রতি আর্য্যদিগের এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে দেখা যায়; যথা—(১—১৩০—৮)। সুতরাং এই ঘটনা হইতে কৃষ্ণ যে ঋগ্বেদের শেষভাগ রচনার সময়ের অথবা তাহার অনতিদূরবর্ত্তী পরবর্ত্তী কোন সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহা বুঝা যায়।

---

* আদিপর্ব্ব ২২৬ অঃ

(ক) ঐ ২২৮ অঃ

নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের শ্রী ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অনধিক অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে ইহা হস্তিনাপুরকে অতিক্রম করিয়া উঠে। পাণ্ডবরা তখন রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার মনস্থ করেন। সমগ্র রাজন্য-মণ্ডলীর উপর প্রাধান্য স্থাপন না হওয়া পর্য্যন্ত এই যজ্ঞ করিবার কেহ অধিকারী হইতে পারেন না। সেকালে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়রাই সমধিক প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা প্রতিপন্ন করাই ছিল পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণের পরামর্শ চাহিলে তিনি বলিলেন, বর্ত্তমানে হয়ত এই যজ্ঞ সম্পাদনে কোন বাধা উপস্থিত না হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে অনিষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। ইহা দ্বারা অন্যান্য রাজাদিগের অন্তরে হিংসানল প্রজ্জ্বলিত হওয়া অনিবার্য্য, তাহা হইতে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। দুর্য্যোধনকে নত করিতেই হইবে পাণ্ডবরা এ সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প। তাঁহারা কৃষ্ণের এই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিতে দ্বিধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদিগের এই মনোবৃত্তির উপর লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিলেন না। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইল; কৃষ্ণের অলৌকিক বলবীর্য্য ও তীক্ষ্ণ প্রতিভার ভয়ে দুর্য্যোধনকে কোনবাধা প্রদান না করিয়া যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল; তিনি কিন্তু এই অপমান বিস্মৃত হইলেন না। হৃদয়ে যে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিয়া উঠিল, তাহার প্রতিশোধের প্রচেষ্টার ফল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

নবম পরিচ্ছেদ

যথাবিধি যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যজ্ঞ শেষে অবভৃত স্নান, ইহার পর অর্ঘ্য দান। প্রথম অর্ঘ্য কাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে, ভীষ্মের এ বিষয়ে অভিমত কি যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলে ভীষ্ম কৃষ্ণকে দেখাইয়া দিলেন। সহদেবের উপর অর্ঘ্য প্রদানের ভার ছিল। তিনি তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। কৃষ্ণকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন প্রদান করা হইয়াছে দেখিয়া চেদিরাজ শিশুপাল প্রতিবাদ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে ভীষ্মের মতিভ্রম হইয়াছে, তাঁহার প্রতি এরূপ শ্লাঘাব্যঞ্জক উক্তি প্রয়োগ করিলেন। সভায় ব্যাসও উপস্থিত ছিলেন। শিশুপাল বলিলেন, "স্বয়ং ব্যাস যেখানে উপস্থিত রহিয়াছেন, তথায় কৃষ্ণ কিছুতেই প্রধান অর্ঘ্য পাইতে পারে না।" ভীষ্ম তাহার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "সমাগত সভাষদ্‌-দিগের মধ্যে শৌর্য্য, বীর্য্য, বুদ্ধি, পরাক্রম এ সকল বিষয়ে কৃষ্ণের সমকক্ষ আর কেহ নাই, সুতরাং অর্ঘ্য তাঁহারই প্রাপ্য।" সৌপ্তিক পর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের শারীরিক বল সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "বলবান ভীম, শৈল্য ও কীচকের শারীরিক গঠন ও বল সম্বন্ধে বিশেষ খ্যাতি আছে সত্য, কৃষ্ণ তাঁহাদের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।" এরূপও উল্লেখ আছে যে, তিনি পথিমধ্যে বিশ্রাম না করিয়া ক্রমাগত ৭ দিন অশ্বারোহণে দ্বারকা হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিতেন এবং প্রত্যাবর্ত্তনকালেও তদ্রূপ ৭ দিনে দ্বারকায় পঁহুছিতেন।

ইহার পর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা যুধিষ্ঠিরের পাশা খেলা। কৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে ইহার কোন সংস্রব না থাকিলেও এই ঘটনা হইতে তাঁহারা কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পর্য্যন্ত পণ করিয়া পাশা খেলিয়াছিলেন। ঋগ্বেদীয় যুগের শেষভাগে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

১০ মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে পাশা খেলার যে কি ভীষণ পরিণাম তাহার বর্ণনা আছে। দ্যূতকার খেলাতে স্ত্রীকে হারাইয়া বিলাপ করিতেছেন,—

"আমার এই রূপবতী পত্নী কোনদিন আমার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করেন নাই, পত্নী আমার নয়নানন্দদায়িনী, সেবা-সুশ্রূষা-কারিণী ছিলেন। আমার বন্ধুবর্গেরও তিনি সেবাপরায়ণা ছিলেন। পাশার আকর্ষণে আমি তেমন ভার্য্যাকেও হারাইলাম।"

ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা পাণ্ডবদের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও তাহার পর এক বৎসর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস। এই অজ্ঞাতবাসের সময় তিরোহিত হওয়ার অব্যবহিত পরে বিরাটরাজার গোধন অপহরণ করায় কৌরবসেনাদের সঙ্গে বিরাট রাজার যুদ্ধ বাঁধে। অর্জ্জুন বৃহন্নলা ছদ্ম নাম গ্রহণপূর্বক তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি বিরাটপুত্র উত্তরের সারথি হইয়া কৌরবসেনার সম্মুখীন হন ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া অপহৃত গোধন উদ্ধার করেন। বিরাটগৃহে ছদ্মবেশে আশ্রয় গ্রহণকালে এক বৎসর পূর্বে নগরের প্রান্তদেশে এক শমি বৃক্ষে তাঁহার গাণ্ডীব ধনু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তথা হইতে ধনুক আনিবার সময় উত্তরের ভয়-বিহ্বল-চিত্তে বল-সঞ্চারের জন্য বলিলেন, এই ধনু আমি সাড়ে বত্রিশ বৎসর ব্যবহার করিয়াছি।

কথিত আছে, খাণ্ডব দহনকালে তিনি অগ্নির নিকট এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরকালে অর্জ্জুনের বয়স ন্যূনকল্পে ছয়ত্রিশ বৎসর ছিল। বিরাটরাজার গোধন হরণ-ব্যাপারের এক বৎসরের কাছাকাছি সময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, সুতরাং দেখা যায়, সে সময় অর্জ্জুনের বয়স উনসত্তর বৎসর ছয় মাস ছিল।

আর এক দিক হইতেও যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের বয়স নিরূপণ করা যাইতে পারে।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের পর তাঁহারা দেশে প্রত্যাগমন করেন ও ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। পাশা খেলায় রাজ্যচ্যুত হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত যুধিষ্ঠির ২০ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার পর বনবাস ও অজ্ঞাতবাসে ১৩ বৎসর অতিবাহিত হয়, সুতরাং বিরাট-যুদ্ধের সময় অর্জ্জুনের বয়স ৩৬+২০+১৩=৬৯ উনসত্তর বৎসর হয়। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ একবয়সী, সুতরাং যুদ্ধকালে কৃষ্ণের বয়স ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর ছিল।

দুর্য্যোধনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতাই ছিল না। কৌরবরা যে বিনা যুদ্ধে পাণ্ডব-দিগকে সহজে কিছু ছাড়িয়া দিবে না, ইহা একরূপ জানাই ছিল। অবশ্য এখনও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সহায়, এই এক ভাবনার বিষয় ছিল, কিন্তু সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসরকাল পাণ্ডবরা কৃষ্ণের নিকট হইতে কোন বিষয়ে কোনরূপ সাহায্য লাভের সাবকাশ পান নাই, নিজেরা অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিসঞ্চয় করিয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় কৃষ্ণের প্রতিকূলতাতে তত বেশী ভয়ের কারণ নাই, এই তাঁহাদিগের মনোভাব। যুদ্ধ অনিবার্য্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া বিরাট নগর পরিত্যাগের প্রাক্কালে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কৃষ্ণহস্তে সমর্পণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "এইক্ষণ হইতে অর্জ্জুনের জীবনরক্ষার ভার এই তোমার উপর, তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতে হইবে।"

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ প্রভৃতি সকল বীরই প্রতিপক্ষের সহায় সে ক্ষেত্রে যুদ্ধ জয়ের আশা নিতান্তই ক্ষীণ। কৃষ্ণই তাঁহাদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তাঁহারা সর্বতোভাবে কৃষ্ণের সহায়তার অভিলাষী জানিয়া তিনি বলিলেন,—

"পুরুষকার হইতে যাহা কিছু সম্ভবপর তাহার কোনরূপ ত্রুটি হইবে না, দৈবের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই ॥"

শৈল্য পর্ব— ৬২ অঃ।

ঘটনাক্রমে ব্যাস সেই সময় বিরাট নগরে উপস্থিত হন। যুধিষ্ঠির আসন্নযুদ্ধের বিষয়ে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ যে পক্ষে সে পক্ষের জয় অবধারিত।"

কূটবুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদরাজনগরী হইতে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিদুরকে পাঠানের ন্যায় এবার সঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিরের নিকট পাঠাইলেন এবং পাণ্ডবদিগের প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও ভালবাসা জ্ঞাপন করিয়া আত্মীয়-বধরূপ মহা অধর্ম্মের কর্ম্ম হইতে বিরত হইবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, ইহা বৃদ্ধ রাজার এক কূট রাজনৈতিক চাল মাত্র। তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার অনুরোধে রাজ্যের দাবী ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন এরূপ জানাইলেন এবং পাঁচ ভাই-এর জন্য মাত্র পাঁচখানা গ্রাম ভিক্ষা চাহিলেন। সঞ্জয় যথাসময়ে প্রত্যাবৃত্য হইয়া যুধিষ্ঠিরের এই সামান্য প্রার্থনার বিষয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। দুর্য্যোধন ঘৃণার সহিত এই আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন; মনে করিলেন তাঁহার বিপুল সেনাবাহিনীর ভয়ে পাণ্ডবরা এই প্রার্থনা জানাইয়াছে।

এবার স্বয়ং কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের দূত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন। ইহার যে কি ফল হইবে তাহা পূর্বেই জানা ছিল। ধৃতরাষ্ট্র-সন্তানগণ যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমাণ স্থানও ছাড়িয়া দিতে চাহিবেন না, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তথাপি কৌরবদিগের পক্ষ হইতে দূত প্রেরিত হইয়াছে রাজনৈতিক প্রথানুসারে পাণ্ডবদের পক্ষ হইতেও দূত প্রেরণ প্রয়োজন।

এই দৌত্যকার্য্যে বিশেষ বিচক্ষণতাও চাই, স্বয়ং কৃষ্ণ এই ভার গ্রহণ করিলেন। যে ভাবে তিনি এই কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহার চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

কৌরবরা দ্রৌপদীকে প্রকাশ্য সভায় যে অপমান করিয়াছিল ঐ ক্ষোভ তুষানলের ন্যায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল। তিনি কৃষ্ণকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলে কৃষ্ণ বলিলেন, দুর্য্যোধন যদি তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধ অগ্রাহ্য করে তবে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূদিগেরও অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত হইবে।

সে সময় যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ মৎস্য রাজ্যের উপকণ্ঠ উপপ্লব্য নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। কৃষ্ণ তথা হইতে হস্তিনাপুর গমন করেন। তথায় বিদূর-গৃহে রাত্রি যাপন করেন।

কৃষ্ণ হস্তিনাপুর আগমন করিয়াছেন, এ সংবাদে দুর্য্যোধনের আনন্দের সীমা রহিল না। পাণ্ডবদিগের যত বল এক কৃষ্ণই তাহার মূল। কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিতে পারিলে, তাহার সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইয়া পাণ্ডবরা বিষদন্তভগ্ন সর্পতুল্য নিবীর্য্য হইবে। দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিলেন তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, অর্থ, হেতু বা লোভবশতঃ আমি কখনও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না। প্রীতিতে ভোজন বা আপদে অন্ন ভোজন হইয়া থাকে। তুমি আমার প্রীতিও উৎপাদন করিতেছ না, আমি বিপন্নও হই নাই।" তিনি বিদুরের গৃহে গমন করিলেন, তথায় সাত্যকীর নিকট হইতে দুর্য্যোধন যে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন, সেই খবর পাইলেন।* তিনি তাহাতে কোনরূপ বিচলিত না হইয়া পরদিন প্রাতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিলেন। প্রকাশ্য সভায় ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে যে সকল কথোপকথন হয়, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে

* উদ্যোগ পর্ব ৯০ সঃ ২৭ শ্লোক।

তাঁহাকে "বলে বিষ্ণু তুল্য, তেজে ভাস্কর তুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগর তুল্য, সহিষ্ণুতায় ধরা তুল্য" বলিলে বড় বেশী অত্যুক্তি করা হয় না।

অন্ধরাজা, পুত্রগণ ও অন্যান্য সভাসদ্‌বৃন্দ দ্বারা পরিবৃত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সভায় উপস্থিত হইলে তাহারা তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, ইহা যে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল, বিশেষভাবে কৌরবদের পক্ষেই অধিক বাঞ্ছনীয় হইবে, অকাট্য যুক্তিসহকারে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। চতুর ধৃতরাষ্ট্র প্রত্যুত্তরে এমন ভাব প্রকাশ করিলেন, তিনি যেন কৃষ্ণের সব উপদেশই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তিনি দুর্য্যোধনকে রাজি করাইবার জন্য কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন।

দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে কারারুদ্ধ করিবার চেষ্টায় আছেন, কৃষ্ণ তাহা অবগত থাকা সত্ত্বেও নির্ভিকচিত্তে এবং দৃঢ়কণ্ঠে দুর্য্যোধনের অবিমৃশ্যকারিতার উল্লেখ করিয়া এখনও তাঁহাকে সংযত হইয়া চলিতে উপদেশ দিলেন এবং ইহাও বলিলেন যে, একমাত্র তাঁহার আচরণের উপর সহস্র সহস্র লোকের জীবন নির্ভর করিতেছে। দুর্য্যোধন তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার মাত্র কৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া দম্ভভরে সভাগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। তখন কৃষ্ণ অন্ধরাজার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইলেন। এইবার আমরা কৃষ্ণচরিত্রের গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের পূর্ণ পরিচয় পাই। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি সম্মানসূচক 'আপনি' শব্দ পর্য্যন্ত ব্যবহার না করিয়া গুরুগম্ভীরস্বরে বলিলেন,—

"ধৃতরাষ্ট্র! কুরুকুলকে যদি নিশ্চিত ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চাও, তবে তোমার এই মূর্খ দাম্ভিক পুত্রকে কারারুদ্ধ কর, এবং ত্বরায় পাণ্ডবদিগের সহিত সখ্যস্থাপন কর।"

তাঁহার এই উক্তি শ্রবণ করিয়া এবং পর্ব্বতবৎ অটল মূর্ত্তি দেখিয়া সভাসদ্‌বৃন্দ স্তম্ভিত হইল; কাহারও মুখ হইতে বাক্য

নিঃসৃত হইল না। তখন তিনি পুনর্বার বৃদ্ধ রাজার দিকে তাকাইলেন। এবার সম্মানসূচক ভাষায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আপনি অনুমতি দিন্, আমিই আপনার পুত্রকে বন্দী করিব, তাহার সাহস থাকে তো সে আমাকে ধরুক্। আপনার অনুমতি পাইলে এইখানেই আমি ভাবী অমঙ্গলের মূল কারণকে দমন করিয়া যাই।" এইবারও তাঁহার কণ্ঠস্বর দৃঢ় ও অবিচলিত। উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র কেবল বলিলেন, দুর্য্যোধন তাঁহার শাসনের বাহির। কৃষ্ণ তখন ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে আর অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন বুঝিয়া সভাসদ্‌বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"আপনারা দেখিলেন, নির্বোধ দুর্য্যোধন কেমন দাম্ভিকতার সহিত সভাগৃহ হইতে চলিয়া গেল। বুড়ো রাজা বলেন, সে তাঁহার ক্ষমতার বাহির, আচ্ছা, আমি যুধিষ্ঠিরের নিকট চলিলাম।" অতঃপর তিনি কাহারও নিকট হইতে কোন প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া স্থিরপদবিক্ষেপে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নৈতিক বলের নিকট পাশবিক বলের পরাজয়ের এরূপ দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় মিলে না।

কুন্তী বিদুরগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। কৃষ্ণ প্রত্যাবর্ত্তন-কালে পুত্রদের নিকট কোন সংবাদ আছে কিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে পুত্রদিগের বীরধর্ম্মের মর্য্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেই উদ্দেশ্যে যাহা বলিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহারও বুঝি তুলনা নাই।

তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"কৃষ্ণ! বিপুলার পুত্র ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া আসিলে মা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভীরু, কাপুরুষ! তোমার এই আচরণে শত্রুদিগেরই উল্লাস। কাপুরুষের জীবনধারণ বৃথা, যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরিয়া যাও, নিজকে এত

ছোট মনে করিও না, এবং অল্পেতে সন্তুষ্ট হইও না। কুক্কুরের জীবনধারণ অপেক্ষা সর্পের মুখে হস্ত প্রদান শ্রেয়স্কর। ক্ষণকালের জন্য হইলেও তীব্র দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হওয়া বহু বৎসর ব্যাপী লঘু অগ্নির ধূম উদ্গীরণ অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়।"

মার এই ভর্ৎসনা-বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র বলিল, 'তুমি কি ইচ্ছা কর, আমি মরিয়া যাই।' উত্তরে মা বলিলেন,—

"এরূপ হেয় জীবন ধারণ করা মৃত্যু অপেক্ষা অধিক বেদনাদায়ক।" মাতার নিকট এভাবে তিরস্কৃত হইয়া এবং তাঁহার উৎসাহবাণীতে উদ্দীপিত হইয়া পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যাগমন করেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মাতৃসন্নিধানে পুনরাগমন করিয়া মার আনন্দবর্দ্ধন করেন। তুমি যুধিষ্ঠিরকে স্মরণ করাইয়া দিবে, এমন সব পুত্রের মাতা হইয়াও আমি পরের অন্নে জীবন ধারণ করিতেছি, আমার এই দুঃখের সীমা নাই।"

কৃষ্ণ প্রত্যাগমনকালে ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সবই কার্য্যতঃ পরিণত হইল। অপরিণামদর্শী দাম্ভিক দুর্য্যোধন হইতে কুরুকুল সমূলে ধ্বংস হইল। গান্ধারীর পুত্রদিগের মধ্যে কাহারও জীবন রক্ষা পাইল না। কৃষ্ণের সহায়তার জন্যই পাণ্ডবরা তাঁহার পুত্রদিগকে এভাবে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেজন্য কৃষ্ণের প্রতি তিনি নিতান্তই বিরূপ ছিলেন, ইহা জানিয়াও গুরুজন হিসাবে কৃষ্ণ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কৃষ্ণ নিকটে উপস্থিত হওয়ামাত্র তাঁহার শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। এই আদর্শ নারীচিত্তও কোন বাধা মানিল না। তিনি কৃষ্ণের উপর অজস্রধারায় অভিসম্পাৎ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, ৩৬ বৎসর মধ্যে ব্যাধ হস্তে কৃষ্ণকেও দেহত্যাগ করিতে হইবে।* কৃষ্ণ স্থাণুবৎ অটল থাকিয়া

* স্ত্রীপর্ব ২৫ অঃ, ৪৪—৪৯ শ্লোক।

সব শুনিলেন এবং গান্ধারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে কোনরূপ ব্যতিক্রম না করিয়া তাঁহার কোন কোন উক্তির যথোচিত উত্তর প্রদানপূর্বক তথা হইতে চলিয়া আসিলেন।

রাজসূয় যজ্ঞের জন্য যখন যুধিষ্ঠির তাঁহার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে সাবধানবাণী শুনাইয়াছিলেন, তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল।

যুদ্ধকালে অর্জ্জুনের পুত্রবধূ উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন। পাণ্ডবদিগের পাঁচ ভাই ভিন্ন আর কেহই জীবিত নাই, ধৃতরাষ্ট্রেরও পুত্রসন্তান কেহ আর অবশিষ্ট নাই। এই গর্ভস্থ শিশুই কুরুবংশ রক্ষার একমাত্র আশাস্থল। উত্তরা অসময়ে স্পন্দনশক্তিহীন মৃতবৎ পুত্র প্রসব করিলেন। বিষাদপূর্ণ হৃদয়ে তখন সকলে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি শিশুকে কোলে ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"আমি জীবনে কখনও কোনরূপ মিথ্যা আচরণ করি নাই, পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা বলি নাই, যেখানে মিথ্যা বলিতে স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে সেখানেও আমি কখনও মিথ্যা বলি নাই, ইহা হইতে আমার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত আছে, তাহার প্রভাবে প্রার্থনা করি, এই শিশুর দেহে চৈতন্য সঞ্চার হউক।"

"আমি কখনও ধৈর্য্য হইতে বিচ্যুত হই নাই, যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করি নাই, আমি কখনও ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোনরূপ অন্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই, ন্যায়পথে সর্ব্বদা পদচালন করিয়াছি। সত্য ও ধর্ম্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত। এই সব হইতে আমার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার প্রভাবে প্রার্থনা করিতেছি, এই শিশুর দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হউক" (অশ্বমেধ পর্ব্ব ৬৯ অ— ১৮—২৩ শ্লোক) এই সকল প্রার্থনার পর শিশুর জীবনীশক্তি প্রকাশ পাইল।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণের জীবন কাহিনীর এখানেই পরিসমাপ্তি। তাঁহার প্রতি গান্ধারীর যে অভিসম্পাৎ, কার্য্যতঃ তাহাই পূর্ণ হইয়াছিল। যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরকে কৌরবরাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি দ্বারকায় প্রত্যাগমন করেন। তথায় এক ব্যাধ কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্যাধ মৃগভ্রমে ঐ শরনিক্ষেপ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই যদুবংশীয়গণের মধ্যে আত্মকলহ জনিত পরস্পরের মধ্যে এক বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তাহার ফলে তাহারা একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

ভারত যুদ্ধের মূল ঘটনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবনের যে সম্বন্ধ তাহা পূর্ব অধ্যায়ে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, চারিশত খৃষ্টাব্দ পূর্ব হইতে চারি শত খৃষ্টাব্দ, এই আট শত বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে রচিত হইয়া মহাভারত বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষ্ণের জন্মের পরবর্ত্তী দুই হাজার হইতে আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে ইহার রচনা। ইতিপূর্বেই বৈদিক সাহিত্য রচনা শেষ হইয়াছে, রচনা-প্রণালিও কালে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে। ইহাকে মহাকাব্য ভাষা রচনার যুগ বলা যাইতে পারে। ভাষা সম্মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে ইহা সে সময় শিক্ষিত শ্রেণীর কথ্য ভাষার অনুরূপ পদ্যচ্ছন্দে রচিত ভাষা। বস্তুত ও মহাকাব্যগুলির রচনা যেমন সহজবোধ্য তেমনি প্রাঞ্জল, কোথাও কোনরূপ আয়াসের লক্ষণ দেখা যায় না।

সে যাহা হউক, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ যে ইহার বহু পূর্বে রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না।

ইহা সামবেদের অন্তর্গত ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির ন্যায় গদ্যে রচিত। উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উভয় গ্রন্থের রচনা যে সংহিতাভাগ রচনার প্রায় সমসাময়িক ভাষা দৃষ্টে তাহা অনুমান করা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণের ব্রহ্মচর্য্য জীবনে গুরুগৃহে অবস্থান কালে গুরুর নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার কতক আভাষ পাওয়া যায়। এই উপনিষদের যুগে দেখা যায় দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কাল পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অধ্যয়নের সময় ছিল। ঐ গ্রন্থের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে আছে শ্বেতকেতুর পিতা তাঁহাকে উপযুক্ত গুরুর নিকট গিয়া ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থান করিতে আদেশ করিলে, তিনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক চব্বিশ বৎসর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—

"স হ দ্বাদশ বর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ
সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায়"

(তিনি শ্বেতকেতু) দ্বাদশ হইতে চতুর্বিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থানকরতঃ সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিলেন এবং পাণ্ডিত্যাভিমান পূর্ণ অপ্রণতস্বভাব নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ইহা হইতে এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না যে কৃষ্ণ ও দ্বাদশ হইতে অন্ততঃ চতুর্বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুরু আঙ্গিরস ঘোর ঋষির গৃহে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ঘোর ঋষির আখ্যান রহিয়াছে। এই উপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত।

বাহ্যিক উপকরণাদি সহকারে বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা গ্রহণক্রমে সকাম বৈদিক দেবোপাসনা হইতে নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনা যে অধিকতর বাঞ্ছনীয় এই উপনিষদে তাহা

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সামবেদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার জন্য গ্রন্থের আরম্ভে বলা হইয়াছে ;

"পৃথিবী এই সমস্ত ভূতের রস, উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। জলসমূহ পৃথিবীর রস, 'জলে পৃথিবী ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে'। ঔষধি সকল জলের রস (জলের পরিণাম), পুরুষ ঔষধির রস (জীবদেহ অন্নের পরিণাম হেতু) বাক্ পুরুষের রস, বাক্যের রস ঋক্, ঋকের রস সাম, সামের রস উদ্গীথ।

বৈদিক যজ্ঞগুলিতে অন্ততঃ চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়, হোতা উদ্গাথা অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা। হোতা ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলিকে যথাবিধি ছন্দোবন্দ ভাবে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বর সহকারে উচ্চারণ করেন। ইহার নাম শস্ত্র পাঠ। তাহাতে যে যে দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাঁহারা যজ্ঞস্থলে আগমন করেন। ইনি ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক।

ঋগ্বেদ হইতে উদ্ধৃত কতগুলি মন্ত্র গানে পরিণত হইয়া সাম নামে অভিহিত হয়। সামবেদীয় ঋত্বিকের নাম উদ্গাথা। তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে, তান লয় সহকারে এই সামগানে দেবতাদের স্তব স্তুতি ও বন্দনা করা। যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের নাম অধ্বর্য্যু, তিনি উপাসনামূলক প্রার্থনা মন্ত্র সকল অনুচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করেন। যিনি ব্রহ্মা তাঁহার তিন বেদেই বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন ; তিনি প্রধান পুরোহিত। অপর তিন ঋত্বিকের কার্য্যে যেন কোনরূপ ভুল ত্রুটি না থাকে তৎপ্রতি বিশেষভাবে তিনি লক্ষ্য রাখেন।

ঋষি শিষ্য কৃষ্ণকে যজ্ঞ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন. এই শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহার বর্ণনা আছে— উহাতে বলা হইয়াছে মানবের সমগ্র জীবনটাই একটা যজ্ঞানুষ্ঠান। "পুরুষো বাব যজ্ঞঃ" পুরুষ অর্থাৎ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতোৎপন্নদেহ (ইন্দ্রিয়াদি সমন্বিত এই যে জীবনবিশিষ্ট দেহ) ইহা যজ্ঞস্বরূপ।

তস্য যানি চতুর্বিংশতি বর্ষাণি তৎপ্রাতঃসবনং যানিচতুশ্চত্বারিং-শদ্বর্ষাণি তন্মাধ্যান্দিনং সবনং অথ যানি অষ্টচত্বারিংশদ্বর্ষাণি তৎ তৃতীয় সবনং।

ঋগ্বেদের নানাস্থানে মানুষের পরমায়ু এক শত বৎসর এরূপ উল্লেখ আছে।*

ঈশোপনিষদেও ইহার পরিমাণ এক শত বৎসরই বলা হইয়াছে। এই উপনিষদে ইহা এক শত ষোল বৎসর। ইহার প্রথম সবনের কাল ২৪ বৎসর। ইহার মধ্যে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কাল হইতে অবশিষ্ট দ্বাদশ বৎসর কাল গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য জীবন অতিবাহিত করিবার সময়। সূর্য্যের উদীয়মান অবস্থার সঙ্গে ইহার তুলনা – তৎপরবর্ত্তী ৪৪ বৎসর মাধ্যান্দিন সবন। ইহা সূর্য্যের তীব্র দ্যোতনাত্মক অবস্থার ন্যায় মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশের সময়—তৎপরবর্ত্তী ৪৮ বৎসর জীবনের পরিপক্কাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনান্ত কালকে নির্দ্দেশ করে। যজ্ঞের জন্য যজমানের নিষ্ঠার সহিত সমদমাদি সংযম রক্ষা প্রয়োজন। এই সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা কম।

দীক্ষা উপসদ, স্তোত্রগান, শাস্ত্রপাঠ, দক্ষিণা, অবভৃত স্নান—যজ্ঞের এই কয়টি প্রধান অঙ্গ। এই উল্লিখিত জীবন যজ্ঞ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। শৈশবের কুসুমের ন্যায় কোমল পবিত্র জীবনের পানভোজনাদি এই যজ্ঞের দীক্ষা। কৈশোর জীবনে খেলাধূলায় যে আনন্দ, যাহা শরীরকে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ করিয়া গঠন করিবার পক্ষে সহায়—তাহা এই যজ্ঞে উপসদ, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থায় সংসার ধর্ম্মাচরণ এবং দানাদি কর্ম্ম তপস্যা সরলতা সত্যভাষণ অহিংসাচরণ ইহার স্তোত্রগান ও

* ৩য় মণ্ডল ৩৬ সূ—১০ ঋক্; ৬—৫—৩; ৬—১০—৭, ৭—৫৯—১২; ৭—৬৬—১৬, ১০—৮৫—৩৯।

শস্ত্রপাঠ, বার্দ্ধক্যে পরিপক্কাবস্থায় এরূপে নির্বাহিত জীবনের যে শান্তি ও বিমলানন্দ তাহা এই যজ্ঞের দক্ষিণা এবং অবশেষে মৃত্যু ইহার অবভৃত স্নান।

সোমযজ্ঞে সোমরস নিঃসরণের ব্যবস্থা আছে, ইহার নাম সোমাভিষব। যজ্ঞের প্রারম্ভে এই সোমাভিষব যজমানের দীক্ষা, যজ্ঞ সমাপনান্তে স্নানের ব্যবস্থা আছে—তাহাকে অবভৃত স্নান বলে। সোমযজ্ঞের এই বিভিন্ন ক্রমের সঙ্গে এখানে মানব জীবনকে তুলনা করা হইয়াছে। ইহাতে মিতাহারী ও মিতাচারী হইয়া "দানমার্জ্জব মহিংসা সত্য বচনং" পন্থা অবলম্বন দ্বারা জীবন যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এ ভাবে জীবন যাপন করিলে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এই তত্ত্বটির উপর বিশেষ ভাবে মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য শ্রুতি এখানে মহীদাসের আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। মহীদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতা। তাঁহার মাতা ইতরা অর্থাৎ নীচ বংশ সম্ভূতা এই জন্য তাঁহার নাম ঐতরেয় মহীদাস।

আখ্যায়িকাটি এই—

বিদ্বান্ মহীদাস এই প্রকার যজ্ঞদর্শন বলিয়াছিলেন,

হে রোগ! তুমি কেন আমাকে এভাবে সন্তাপ দিতেছ। যজ্ঞরূপী আমি তোমার এইরূপ উপতাপে (সন্তাপে) মরিব না, ইহা তোমার বৃথা প্রয়াস। যে ব্যক্তি এই প্রকার জ্ঞান অবগত হন (অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, জীবনটাকে এভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করেন) সেই বিদ্বান একশত ষোল বৎসর জীবিত থাকেন।*

---

* এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্ বিদ্বানাহ মহীদাস ঐতরেয়ঃ
"স কিং ম এতদুপতপসি, যোঽহমনেন ন প্রেষ্যামীতি ;
স হ ষোড়শং বর্ষশতমজীবৎ,
প্র হ ষোড়শং বর্ষশতং জীবতি য এবং বেদ।"

ঋষিঘোর কৃষ্ণকে উপদেশ দিয়েছিলেন সমগ্র জীবনটাই একটা যজ্ঞ।

যজ্ঞের দুইটা দিক আছে ; যথা,—

দুইটি অরুণীর সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নি, এবং ইহাকে সজীবিত রাখিবার জন্য সমিধ কাষ্ঠ, সোমরস, ঘৃত ও অন্যান্য উপকরণ। ইহাদিগকে ঐ অগ্নিতে আহুতি প্রদান করা যজ্ঞের বাহিরের দিক ; এই সকল যজ্ঞীয় উপকরণকে ব্রহ্মের প্রতীক্ অর্থাৎ ব্রহ্মাবির্ভাবের স্থূলরূপে গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে অগ্নিতে আহুতি দিবার ন্যায় যজ্ঞ কর্ত্তার নিজকে ও উপাস্য দেবতার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আহুতি প্রদান করা যজ্ঞের ভিতরের দিক্ (ক)

বাহ্যিক উপকরণগুলিতে ব্রহ্মদৃষ্টি করা এবং যজ্ঞ কর্ত্তার নিজের আত্মাতে অভিন্ন ভাবে উপাস্য দেবতার দর্শন বৈদিক যজ্ঞ গুলির লক্ষ্য। যজ্ঞ মাত্রেই আত্মত্যাগের ব্যবস্থা। যজ্ঞ সমাপনান্তে যজ্ঞ কর্ত্তার যে হবিঃশেষ ভোজন বিধি আছে, ইহার তাৎপর্য্য ত্যাগান্তে অর্থাৎ জগতের কল্যাণ পরিচর্য্যায় যথা সাধ্য ব্যয় করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সুধু তাহাই নিজের ভোগে আনা। সমষ্টি ভাবে ইহা **পুরুষ যজ্ঞ**, প্রথম পুরুষের আত্ম বলি।

ব্যষ্টিভাবে ইহা প্রত্যেক মানবের কর্ম্ম যজ্ঞ।

যথোচিত ভাবে এই যজ্ঞ প্রতিপালিত হইলে অন্যান্য শ্রেয়ের সঙ্গে আয়ুষ্কালও যে বৃদ্ধি পায়, মহীদাসের উক্তি তাহা প্রকাশ করিতেছে।

গুরুর নিকট এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া শিষ্য কৃষ্ণের অন্তরে অন্য বিদ্যা বিষয়ে বীতস্পৃহার সঞ্চার হইয়াছিল। তখন ঋষি তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন,

"অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণ সংশিতমসি"

(ক) তান্ত্রিক পঞ্চমকার সাধন তত্ত্বের ও এই একই লক্ষ্য—কুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া আত্মাতে পরমাত্মার দর্শন এই সাধনার লক্ষ্য।

প্রাণ সংশিত বলিতে প্রাণের সম্যক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝায়। ইহা 'তত্ত্বমসি' তত্ত্ব, শঙ্করাচার্য্য এরূপ অর্থ করিয়াছেন। *
তুমি অচ্যুত নিজের স্বরূপ হইতে অস্খলিত (স্বরূপাৎ অপ্রচ্যুত)। তুমি অক্ষয়।

এই জীবন যজ্ঞের অবভৃত স্নানরূপ মৃত্যু যখন উপস্থিত হইবে তখন এই তিন মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগের উপদেশ রহিয়াছে (অন্তবেলায়াং এতৎ ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত)।

এইরূপ জীবনযাপনের প্রশংসা জ্ঞাপনার্থে শ্রুতি দুইটি ঋঙমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদিগের একটি মন্ত্র ৮ম মণ্ডলের ৬ষ্ঠ সূক্তের ৩০ ঋক্, অপরটি ১ম মণ্ডলের ৫০শ সূক্তের ১০ম ঋক্। শ্রুতি উভয় মন্ত্রকে কতক ভাষার রূপান্তর করিয়া এক মন্ত্রে সন্নিবেসিত করিয়াছেন, ইহার অর্থ ;—

পুরাতন অর্থাৎ চিরন্তন কাল হইতে প্রবহমান, জগদ্‌বীজের অজ্ঞানাতীত প্রশস্ততর জ্যোতিঃ দর্শন করতঃ এবং নিজের হৃদয়স্থ সেই উৎকৃষ্ট জ্যোতি দর্শন করতঃ রশ্মিমণ্ডল ও সর্ব্ব জগৎ প্রেরক দেবানুগত উৎকৃষ্টতম জ্যোতি (পরব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়াছি।"

মূল মন্ত্র দুইটি—

আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো
জ্যোতিস্পশ্যংতি বাসরং
পরো যদিধ্যতে দিবা

ছন্দ গায়ত্রী ঋষি বৎসঃ কাম্ব; দেবতা ইন্দ্রঃ
৮ম-৬সূ-৩০ ঋক্।

উদ্বয়ং তমস্পরি জ্যোতিস্পশ্যংত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্॥

ছন্দ অনুষ্টুপ ঋষি প্রস্কম্বঃকাম্বঃ দেবতা সূর্য্যঃ
১ম-৫০-১০

* প্রাণস্য সংশিতং সম্যকৃতমুক্তংচ সূক্ষ্মং তত্ত্বমসি শাঙ্করভাষ্য।

মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যা ও ভাবার্থ ঃ—

উদ্বয়ংতমসস্পরি=উৎ বয়ং তমসঃ পরি

তমসঃ পরস্তাৎ দেবত্রা দেবেষু উত্তরং উৎকৃষ্টতমং

'দেবং' দ্যোতনশীলং সূর্য্যং 'পশ্যন্ত' সন্তঃ 'উত্তরং' তদুত্তরং

'প্রত্নস্য' চিরন্তনস্য পুরাণস্য রেতসঃ বীজভূতস্য কারণস্য 'জ্যোতিঃ'

বয়ং উৎপশ্যন্তঃ স্ম,

কিং তৎ জ্যোতিঃ পশ্যন্তি ?

শঙ্করাচার্য্য ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন,—

'বাসরং' অহরহমিব তৎ সর্বতো ব্যাপ্ত ব্রহ্মণো জ্যোতিঃ।

নিবৃত্ত চক্ষু সো ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তি সাধনৈঃ শুদ্ধান্তঃ-করণা আ সমন্ততো জ্যোতিঃ পশ্যন্তী।

বাসরের ন্যায় সর্বব্যাপী সেই ব্রহ্মজ্যোতিঃ যাহা ব্রহ্মচর্য্যাদি নিবৃত্তিমূলক সাধন সাহায্যে শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করেন।

তেন কিমভৎ ?

উত্তমং জ্যোতিঃ জ্ঞানস্বরূপং ব্রহ্ম 'অগন্ম' প্রাপ্তবন্ত স্ম চিরজীবনায়।

মন্ত্র দুইটির শাঙ্করভাষ্যের ভাবার্থ ঃ—

সেই চিরন্তন জগদ্বীজভূত সৎ পদার্থের জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতিঃ এবং যাহা ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা প্রদীপ্ত-জ্ঞানচক্ষু শুদ্ধচিত্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণ সর্বত্র দর্শন করেন; এবং যাহা প্রকাশমান পরব্রহ্মে নিয়ত বর্ত্তমান থাকিয়া সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারকাগণকে উদ্দীপিত করিতেছে এবং বিদ্যুৎকে প্রস্ফুরিত করিতেছে।

অপর ঋষি এই জ্যোতিঃ দর্শন করতঃ বলিতেছেন,—অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত, অথবা অন্ধকারের অপনেতা আদিত্যমণ্ডলস্থ

যে উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ তাহা, এবং আমাদের হৃদয়স্থ জ্যোতিঃ, উভয়ই এক জ্যোতিঃ জানিতে পারিয়া আমরা উন্নত হইয়াছি।

তদনন্তর ঋষি শিষ্য কৃষ্ণকে বলিতেছেন,—

"ইদং তৎ জ্যোতিঃ যদ্ ঋগ্ভ্যাং স্তুতং যদ্ যজুস্ত্রয়েন প্রকাশিতম্"

'অক্ষিতংঅসি, অচ্যুতং অসি, প্রাণসংশিতং অসি' এই তিনটি যজুর্মন্ত্রের সাধনায় যে জ্যোতিঃ প্রকাশিত হয়, এই দুই ঋঙ্মন্ত্রে সেই জ্যোতির স্তুতি।

কৃষ্ণ গুরুর নিকট হইতে যত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিণতি ও সার্থকতা। আত্মতত্ত্ব বিষয়ক যত সাধনা, সকলেরই চরম লক্ষ্য এই স্থানে পোঁছান। ইহার পর শিষ্য যে অন্য সব বিষয়ে বীতস্পৃহ হইবেন তাহা স্বাভাবিক। এই লক্ষ্যে পঁহুছিবার জন্য সাধনার প্রয়োজন; সেই সাধনা ধর্ম্মানুষ্ঠান।

এই শ্রুতির দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ খণ্ডে তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে ও তথায় ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধের বর্ণনা আছে।

১। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান; ২। তপস্যা; ৩। গুরুগৃহে আজীবন বাসপূর্ব্বক দেহপাত পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী জীবনযাপন করা।

এই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, মোক্ষলাভ হয় না, একমাত্র ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন।

"সর্ব এতে পুণ্য লোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি"।

যজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞ।

অধ্যয়ন—নিয়ম পূর্বক ঋক্প্রভৃতি বিদ্যার অভ্যাস।

দান—যজ্ঞ ভিন্ন অন্য সময়ে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে প্রার্থীকে যথাসাধ্য যাহা দেওয়া যায়।

যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমবাসী তাঁহাদের পক্ষে এইগুলি অবশ্য পালনীয় ধর্ম্ম।

তপ-কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি। শঙ্করাচার্য্য ইহার যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে তপঃ দ্বারা নিয়মিত ভাবে আশ্রমধর্ম্মে অবস্থিত তপঃসম্পন্ন তাপস বা পরিব্রাজক বুঝিতে হইবে। ইহা ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থে নহে।

"তপঃ ইতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি, তদ্বান্ তাপসঃ পরিব্রাড় বা, ন ব্রহ্মসংস্থঃ আশ্রমধর্ম্মমাত্র সংস্থঃ।"

তৃতীয় স্কন্ধে যে ব্রহ্মচারীর উল্লেখ তাহা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ১

ছান্দোগ্য উপনিষদ সামবেদের অন্তর্গত। ইহাতে সামগুলির প্রাধান্য। ইহাতে সামকে ঋকের রস বলা হইয়াছে। সামগান-গুলিকে উদ্‌গীত বলা হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্‌গীতের যে মাহাত্ম্য তাহা বুঝাইবার জন্য এই শ্রুতির ২য় অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এই,—

কৌষিতকি পুত্রকে বলিতেছেন, আমি আদিত্যকে রশ্মির সহিত এক করিয়া সম্যক্‌রূপে গান করিয়াছিলাম, তাই তুমি আমার একটি পুত্র হইয়াছ। এই শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ে একটি মধু ব্রাহ্মণ আছে। তথায় আদিত্যের উপাসনা অবলম্বনক্রমে ধর্ম্মের এই ত্রিবিধ স্কন্ধানুযায়ী কর্ম্মাঙ্গ সামোপাসনার ফলাদি এবং কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় তাহার বর্ণনা আছে, এবং দেখান হইয়াছে এই সকলের যথোচিত অনুষ্ঠান হইতে মানব জীবনের যত কিছু প্রার্থনীয়—যশ তেজঃ ইন্দ্রিয় বীর্য্য অন্ন সকলই লাভ হয়। এই অনুষ্ঠানগুলি সকলই বেদের কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী; ফল,

(১) ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, নৈষ্ঠিক ও উপকুর্বাণ। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী গৃহস্থাশ্রমে আর প্রবেশ করেন না। উপকুর্বাণ ব্রহ্মচারী উপনয়নের পর দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাপূর্বক গুরুগৃহে বাসকরতঃ গুরুশুশ্রূষা, বেদ-বিদ্যাদি অধ্যয়ন সমাপনান্তে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি গৃহস্থাশ্রমী হন। তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মের প্রথম স্কন্ধানুযায়ী সকল বিধিই পালন কর্ত্তব্য।

ইহকালে অভ্যুদয় ও দেহান্তে স্বারাজ্য বা স্বর্গলাভ। যে কর্ম্মানুষ্ঠান এত সব আকাঙ্ক্ষনীয় ফললাভের হেতু তাহা নিশ্চয়ই পালনীয়, মধুবিদ্যায় ইহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

ধর্ম্মের এই তিন স্কন্ধ হইতে ভিন্ন আর একটি স্কন্ধ আছে তাহা ব্রহ্মসংস্থ (ব্রহ্মণিসম্যক্স্থিত) অবস্থা—ব্রহ্মনিষ্ঠব্যক্তিই কেবল অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হয়।

মধুবিদ্যায় ধর্ম্মের ত্রিবিধ স্কন্ধের অনুযায়ী কর্ম্মাদি ও সামোপাসনার ফলাদি বর্ণন এবং কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা বলা হইয়াছে।

ইহাতে যজ্ঞাদি বিষয়ক উপাসনার পর যজ্ঞেরই ফলস্বরূপ আদিত্যের উপাসনার বিধান রহিয়াছে এবং বলা হইয়াছে, আদিত্য দেবগণের মধু।

বক্রীকৃত বংশখণ্ডে মধুচক্র যেরূপ ঝুলিয়া থাকে, তদ্রূপ এই যে দ্যুলোক বক্রীভূত বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, অন্তরীক্ষলোকরূপী মধুচক্রও তদ্রূপ এই দ্যুলোকরূপ বংশে সংলগ্ন থাকিয়া ঝুলিতেছে। মধুমক্ষিকার সন্তানগণ যেমন মধুচক্রের নাড়ীসকলের মধ্যে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ আদিত্যের পুত্রস্থানীয় রশ্মিসকল (অর্থাৎ সূর্য্য কর্ত্তৃক আকৃষ্ট পার্থিব জলরাশি) অন্তরীক্ষরূপ মধুচক্রের রশ্মিতে ঝুলিতেছে।

আদিত্যের যে পূর্বদিকস্থ রশ্মিসকল, উহারা ইহার পূর্বদিকস্থ মধুনাড়ী। ঋক্‌সকল মধুকর, ঋগ্বেদ পুষ্প, সেই যজ্ঞীয় অগ্নিতে যে সমস্ত সোমরস ঘৃতাদি অর্পিত হয়, সেই হবণীয় সামগ্রীসকল অমৃতবারি। মধুকররূপী ঋক্‌সকল এই অমৃতবারি গ্রহণকরতঃ ঋগ্বেদকে পরিতৃপ্ত করিল, এবং তাহা হইতে যশ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য ও ভক্ষণীয় অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইল। এইরূপে আদিত্যের দক্ষিণদিকস্থিত রশ্মিগুলিকে মধুনাড়ী কল্পনা করিয়া যজুঃসমূহ মধুকর এবং যজুর্বেদ পুষ্প, তদ্রূপ পশ্চিমদিগস্থিত রশ্মিনিচয়

মধুনাড়ী, সামসমূহ মধুকর, সামবেদ পুষ্প এবং যজ্ঞীয় অগ্নিতে সোমঘৃতাদি যাহা অর্পিত হয় সেই হবণীয় সামগ্রীসকল অমৃত-বারি। মধুকররূপী যজু ও সামসকল সেই সেই অমৃতবারি গ্রহণকরতঃ সেই যজুর্বেদ ও সামবেদকে পরিতৃপ্ত করিলে তাহা হইতে যশ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এইরূপ আদিত্যের উদ্ধগত রশ্মিসকল ইহার উপরিভাগস্থ মধুনাড়ী। গুহ্য (রহস্যময়) আদেশগুলি মধুকর, ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবই পুষ্প এবং সেই হবণীয় সামগ্রীসকল অর্থাৎ ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ যে জলসমূহ তাহা অমৃতস্বরূপ।

সেই গুহ্য আদেশগুলিই সেই প্রণবাত্মা ব্রহ্মকে অভিতপ্ত করিল, তাহা হইতে যশ, তেজঃ, বীর্য্য ও অন্যান্যরূপ রস উৎপন্ন হইল এবং তাহারা ক্ষরিত হইয়া আদিত্যের উর্দ্ধভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল বর্ণনা দ্বারা বৈদিক বিধি অনুষ্ঠিত যাগাদি কর্ম্মের স্তুতি করা হইয়াছে—অর্থাৎ এরূপ বিশেষ অমৃতত্ব যে কর্ম্ম হইতে লাভ হয়, সেই কর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য।

তদনন্তর বলা হইয়াছে এই যজ্ঞরূপী কর্ম্মের প্রাতঃসবন বসু-গণের, মাধ্যন্দিন্ সবন রুদ্রগণের, তৃতীয় সবন আদিত্যগণের, চতুর্থ সবন মরুৎগণের ও পঞ্চম সবন বিশ্বদেবগণের। যে সকল বৈদিক দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়—এখানে তাহার বর্ণনান্তর বলা হইয়াছে যাবৎকাল এই সকল দেবতার ভোগকাল, তাবৎকাল যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বারাজ্য লাভ হয়—এইটি কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল।

তদনন্তর কোন্ দেবতার স্বারাজ্য কতকাল স্থায়ী তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যতকাল পর্য্যন্ত আদিত্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যাইবেন ততকাল বসুদিগের আধিপত্য। যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বারাজ্য প্রাপ্তিও ততকাল স্থায়ী।

রুদ্রগণের আধিপত্যকাল বসুগণের আধিপত্যকালের দ্বিগুণ সময়—যজ্ঞানুষ্ঠাতার স্বারাজ্য ততকাল স্থায়ী। আদিত্যগণের আধিপত্যকাল রুদ্রগণের দ্বিগুণ; মরুৎগণের আধিপত্যকাল রুদ্র-গণের আধিপত্যকালের সমান। সাধ্যগণের আধিপত্যকাল মরুৎ-গণের আধিপত্যকালের দ্বিগুণ। ইহাদিগের প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপ যজমানের স্বারাজ্য লাভ তদনুরূপ কাল স্থায়ী।

এই মধুবিদ্যায় আদিত্যকে সকল প্রাণীর প্রত্যক্ষ কর্ম্মফলের মানদণ্ডরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আদিত্যের বিভিন্ন লোকে উদয়াস্ত কাল পরিমিত সময় এই কর্ম্মফললব্ধ স্বারাজ্যকালের পরিমাণ। কর্ম্মফল অনিত্য, সুতরাং ক্ষয়িষ্ণু। তথাপি ইহার কাল লোক গণনার অতীত বিধায় ইহাকে অমৃত বলা হইয়াছে। বসু-দিগের আধিপত্যকাল ততদিন যে পর্য্যন্ত সূর্য্য পূর্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অস্ত যাইবেন। যে সময়ে সূর্য্য দক্ষিণ দিকে উদিত হইয়া উত্তর দিকে অস্ত যাইবেন সে সময়ে রুদ্রগণের আধিপত্য-কাল। তদ্রূপ পশ্চিমে উদিত হইয়া যতদিন পূর্বদিকে অস্তগমন করিবেন তাহা আদিত্যগণের আধিপত্য কাল। উত্তরে উদিত হইয়া দক্ষিণে অস্ত যাওয়ার কাল মরুৎগণের আধিপত্যের সময়। ঊর্দ্ধে উদিত হইয়া অধোতে অস্তমিত হইবার কাল সাধ্যদিগের আধিপত্যের সময়।

ধর্ম্মের যে ত্রিবিধ স্কন্ধের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাদিগের যথোচিত অনুষ্ঠান হইতে সাধকের কি ফল লাভ হয় এই মাধুবিদ্যায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। যশ, তেজঃ, ইন্দ্রিয়, বীর্য্য, অর্থাৎ, মানবজীবনে যাহা কিছু প্রার্থনীয় সকলই লাভ হয়। এই সকল অনুষ্ঠান বেদের কর্ম্ম কাণ্ডানুযায়ী, ফল ইহকালে অভ্যুদয় ও দেহান্তে স্বারাজ্য বা স্বর্গলাভ।

তদনন্তর বলা হইয়াছে রহস্যময় উপদেশরূপী মধুকর প্রণবরূপী পুষ্প হইতে যে মধু সংগ্রহ করিয়াছিল, সেই অমৃত উর্দ্ধদেশগামী অর্থাৎ সূর্য্য সেই প্রদেশে অবস্থিত হন, যাহার পর আর উদয়ও হন না অস্তও যান না। এই উদয়াস্ত বর্জ্জিত লোকই ব্রহ্মলোক।

শঙ্করাচার্য্য কৃত ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার সারমর্ম্ম এই ঃ—

সূর্য্যদেব এইরূপ উদয় অস্ত দ্বারা প্রাণীগণের নিজ নিজ কর্ম্মফল (অর্থাৎ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানজনিত সুকৃতির ফল) ভোগার্থে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তাহা শেষ হইলে তিনি সেই সমস্ত প্রাণীবর্গকে আপনার মধ্যে সংহৃত করেন। প্রাণীগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নির্দ্দিষ্ট কাল অতীত হওয়ার পর তিনি উর্দ্ধগত হইয়া আপনাতে আপনি অবস্থিত থাকেন।

সূর্য্যদেব প্রাণীগণের প্রতি ভোগ প্রদান কাল শেষ হইবার পর আর উদিত ও অস্তমিত হইবেন না। সুতরাং, দিবা-রাত্রির অভাবে কাল যাহা আয়ুক্ষয়ের কারণ তাহারও আর সত্ত্বা থাকিবে না।

সূর্য্যের উদয় অস্ত দ্বারা দিবারাত্রির উদ্ভব এবং তাহা হইতে কালের গণনা। কাল আয়ুঃক্ষয়ের কারণ। যেস্থানে কালের অস্তিত্ব নাই তথায় আয়ুঃক্ষয়ও হইতে পারে না।

মধুকররূপী রহস্যময় উপদেশ দ্বারা পুষ্পস্থানীয় প্রণবকে উত্তপ্ত করিলে যে মধুনির্য্যাস হয় তাহা সূর্য্যের এই উদয়াস্ত বিবর্জ্জিত ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি। এই যে তত্ত্ব ইহার উপর বিশেষ জোর স্থাপন জন্য শ্রুতি একটি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। তাহা এই ঃ—

কোন এক বিদ্বান পুরুষ যিনি ধর্ম্ম স্কন্ধানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বসু প্রভৃতি দেবতার সমানপদ সম্পন্ন হইয়াছেন, তিনি যোগবলে সমাহিত হইয়া সেই ব্রহ্মলোক দর্শনকরতঃ সমাহিত অবস্থা হইতে উত্থিত হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল সূর্য্য দেব এখানে যেমন উদয় অস্ত দ্বারা জীবের আয়ুঃক্ষয় করিতেছেন,

সেখানেও কি দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয় করিয়া থাকেন।

উত্তরে তিনি বলিলেন,—

সেখানে সূর্য্যদেব কখনও অস্তমিত হন নাই, উদিতও হন নাই। হে দেবগণ! তোমরা সাক্ষী হইয়া শ্রবণ কর (সাক্ষিণো যূয়ং শৃণুত) আমি সেই সত্য বচনের ফলে ব্রহ্মের সহিত বিরুদ্ধ হইব না (আমার ব্রহ্ম প্রাপ্তিতে কোন অন্তরায় ঘটিবে না) কেন? কারণ আমি সত্য কথা বলিতেছি।

মন্ত্রটি এই—

"ন বৈ তত্র ন নিম্লোচ নো দিয়ায় কদাচন।

দেবাস্তেনাহং সত্যেন মা বিরাধিষি ব্রহ্মণেতি।

মন্ত্রে "দেবগণ" শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য, ধর্ম্মাচরণ দ্বারা স্বর্গলাভ হয়, তথাকার অধিবাসীগণ দেব পদবাচ্য। কিন্তু সূর্য্যের উদয়াস্ত কাল দ্বারা সেই স্বর্গভোগও পরিচ্ছেদ্য। যিনি যোগবলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছিলেন, তিনি বসু প্রভৃতি দেবতাদের সমান অধিকারসম্পন্ন স্বর্গলোকের কোন দেবতা।

আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য, বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানরূপ সুকৃতি হইতে পুণ্যলোক লাভ হয়; কিন্তু এই পুণ্যলোকবাস ক্ষয়িষ্ণু। এই পুণ্যলোক লাভের উপায়রূপ যে ত্রিবিধ ধর্ম্ম-স্কন্ধ বর্ণিত পন্থা তাহা হইতে ব্রহ্মসংস্থ অবস্থা অধিক বাঞ্ছনীয়।

যে সকল রহস্যময় আদেশকে মধুকর ও প্রণবকে পুষ্প বলা হইয়াছে, তাহারা উপনিষদ বর্ণিত আত্মতত্ত্ব। এই আত্মজ্ঞান হইতে ব্রহ্মসংস্থ অবস্থা লাভের অধিকার জন্মে।

মধুবিদ্যায় দেবোপাসনার প্রশংসা দ্বারা ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই সকল সাধনা সোপান পরম্পরাক্রমে একের উপর অপরটি প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞ, দান, তপস্যা দ্বারা বাহ্যাভ্যন্তর মার্জ্জিত ও শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রহ্মসংস্থ অবস্থা লাভে অধিকার হয় না।

শ্রুতি এই মধুবিদ্যাকে গুহ্য-ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি এই বিদ্যা অবগত হন, তাঁহার সম্বন্ধে সূর্য্যদেবের উদয়-অস্ত নাই, সেই ব্রহ্মবিদের উদ্দেশ্যে সর্বদাই দিবালোক প্রকাশমান থাকে, কারণ তিনি নিজেই জ্যোতির্ম্ময় হন এবং সেই বিদ্বান পুরুষ উদয়াস্তকাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য, নিত্য ও জন্মরহিত ব্রহ্মস্বরূপ হন। ইহাকে বেদ-গুহ্য-ব্রহ্মোপনিষদ্ও বলা হয়। বেদ-গুহ্য বলার তাৎপর্য্য, যথাবিধি বৈদিক অনুষ্ঠান হইতে ইহা সমুৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রশংসার্থ শ্রুতি বলিতেছেন—

এই মধুবিজ্ঞান সর্বপ্রকার প্রিয় লাভের জন্য জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিবেক, অথবা উপযুক্ত শিষ্যকে বলিবেক, তদ্ভিন্ন অপর কাহাকেও নহে; এমন কি কেহ যদি এই বিদ্যা গ্রহণের মূল্যস্বরূপ সাগর-বেষ্টিতা ও ধনপূর্ণা এই পৃথিবী দান করে, তবুও নহে। ১

“বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ সেবধিস্তেঽস্মি রক্ষমাম্।
অসূয়কায় মাং মাদা স্তথা স্যাং বীর্য্য বত্তমা॥
যমেবতু শুচিং বিদ্যা নিয়ত ব্রহ্মচারিণম্।
তস্মৈ মাং ব্রুহি বিপ্রায় নিধিপায়া প্রমাদিনে॥

মনু ২ অ. ১১৪, ১১৫

বিদ্যা ব্রহ্মবিদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন আমি তোমার অমূল্য নিধি। আমাকে রক্ষা কর। শ্রদ্ধাভক্তি বিহীন ব্যক্তিতে আমাকে প্রদান করিওনা, তাহা হইলে আমার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাঁহাকে তুমি সর্ব্বদা শুচি ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে এবং যিনি ধন রক্ষকের ন্যায় নিরন্তর অপ্রমাদী হইয়া আমাকে রক্ষা করিবেন, তেমন বিপ্র হস্তে আমাকে অর্পণ করিও।

১। এই রহস্যময় ব্রহ্মবিদ্যাকে যে কিরূপ যত্নসহকারে রক্ষা করা হইত, এ সম্বন্ধে দুইটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নত্বে নামিরিণে বপেৎ॥

জিজ্ঞাসা না করিলে কাহাকেও বিদ্যা উপদেশ দিবে না। অন্যায়রূপে যদি কেহ প্রশ্ন করে (অর্থাৎ প্রশ্ন কর্ত্তার হৃদয় যদি শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত না হয়) তাহাকে বিদ্যা উপদেশ দিবে না। মেধাবী ব্যক্তি তেমন স্থলে জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন—মূক হইয়া থাকিবেন। ব্রহ্মবাদী বরং বিদ্যার সহিত মৃত্যুকে বরণ করিবেন, তথাপি ঘোর আপদ কাল উপস্থিত হইলেও ঊষর ভূমিতে (অর্থাৎ অপাত্রে) বিদ্যা বপন করিবেন না।

ছান্দোগ্য উপনিষদের নির্দ্দেশ অনুসারে কৃষ্ণের পরমায়ূ ১১৬ বৎসর হওয়া উচিত ছিল। দেখা যায় মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০৬ ছিল। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ হস্তিনাপুরে পঁহুছার অব্যবহিত পরে পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করেন। মহাভারত আদিপর্ব্বে ১৩৪ অধ্যায়ে কথিত আছে মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠিরের বয়স ১০৮ বৎসর ছিল। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের দুই বৎসরের ছোট। কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মাত্র তিন মাসের বড়। এই হিসাবে গণনা করিলে সে সময় কৃষ্ণের বয়স ১০৬ বৎসর হয়। প্রাস্থানিক পর্বের ২য় অধ্যায় অনুসারেও এই বয়স। আরেক গণনাতেও আমরা দেখিয়াছি তাঁহার এই বয়সই পাওয়া যায়।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের সময় যদি তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর ধরা যায় তবে তাহার পর যুধিষ্ঠিরের ইন্দ্রপ্রস্থ নগরী ও রাজ্যস্থাপন, তথায় ২০ বৎসর রাজত্ব, তদনন্তর ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস, ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হয়।

গান্ধারীর অভিশম্পাৎ অনুসারে এই যুদ্ধের ৩৬ বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইলে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১০৫ বৎসর হয়।

অজ্ঞাতবাসের পর যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে কৃষ্ণের মধ্যবর্ত্তীতায় যে আপোষের কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল তাহাতে এবং যখন আপোষ হইল না তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেও অন্ততঃ আরও ১ বৎসর সময় লাগিয়াছিল। সুতরাং, এই হিসাবেও মৃত্যুকালে কৃষ্ণের বয়স ১০৬ বৎসর ছিল দেখা যায়। ব্যাধশর বিদ্ধ হইয়া তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছিল। ইহাই উপনিষদ নির্দ্দেশিত পূর্ণায়ু না লাভের কারণ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে কৃষ্ণের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির এক ধারাবাহিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা, ইহারা একপ্রকার ঐতিহাসিক স্থির-ভিত্তির উপর স্থাপিত এরূপ মনে করা যাইতে পারে। অদ্যাবধি জগতে যত মহামানবের আবির্ভাব হইয়াছে, তিনি যে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং কেন যে সকলের উপরে তাঁহার আসন, তাহার কারণও প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বৃষ্ণিবংশসম্ভূত এবং কৃষ্ণ নামে কথিত। ইহা কি তাঁহার প্রকৃত নাম, না উত্তরকালে তাঁহার উপর কল্পিত হইয়াছে, অথবা এই নামের সহিত অপর কোন সম্বন্ধ জড়িত রহিয়াছে, এস্থলে তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

গীতাতে তিনি নিজেকে বাসুদেব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—“বৃষ্ণিণাং বাসোদেবোঽস্মি”। পাণিনির সময়ও তিনি বাসুদেব নামে পরিচিত ছিলেন,—“বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুণ”। ভাগবতেও তিনি বাসুদেব, কিন্তু এখানে তিনি বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব।

তদ্রূপ ভাগবতের ভাষ্যকার সনাতন গোস্বামীমতে কৃষ্ণ বিশেষণগত নাম, তিনি জগচ্চিত্ত আকর্ষণ করেন এই অর্থে তাঁহার নাম কৃষ্ণ।

তিনি যে বসুদেবের পুত্র বলিয়া বাসুদেব নহেন, পরন্তু তাঁহার প্রকৃত নামই যে বাসুদেব, তাহা পাণিনি, পতঞ্জলের মহাভাষ্য ও কাত্যায়নের বার্ত্তিকা হইতে পূর্বে দেখান হইয়াছে। ১ এবং তিনি যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে সৌরসেনিদের নিকট দেবতারূপে পূজিত হইতেছিলেন তাহাও দেখিয়াছি। মথুরার এই সৌরসেনী ও বৃষ্ণিরা উভয়ই যদুবংশীয়। ইহার পূর্বে পাণিনির সময়ও যে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে বাসুদেব পূজা প্রচলিত ছিল পাণিনি ব্যাকরণ হইতে তাহা জানা যায়। কর্ত্তৃবাচ্যে পদের অন্তে প্রত্যয় যোগ করিলে ঐ পদ যাহাকে নির্দ্দেশ করে তাহার অনুগত বুঝায়, এই অর্থ জ্ঞাপন করিবার জন্য পাণিনি বাসুদেবকা শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। বাসুদেবকা বলিতে বাসুদেবের অনুরক্ত লোকসকল বুঝায়। এই সকল হইতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত গ্রিয়ারসন (Grierson) মনে করেন পাণিনির পূর্ব হইতে বাসুদেব ভগবতরূপে গৃহীত হইয়াছেন। ২ হফ্‌কিন্‌স্‌ এই মত পোষণ করেন না। তাঁহার মতে "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুণ" হইতে এইমাত্র বুঝায় যে, বাসুদেব অর্জ্জুন তৎকালে অতিমানবরূপে গৃহীত হইতেন। ৩ মৃত্যুর পর বীরদিগের উপর সাধারণতঃ যেরূপ দেবশক্তির আরোপ হইয়া থাকে বাসুদেবে তাহাই অর্পিত হইয়াছিল। অবশ্য পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ীর কোন স্থানেই বাসুদেব যে ভগবান এরূপ উল্লেখ

১। ৮৩ পৃষ্ঠা।

২। Before the time of Panini, the founder of the Bhagabat religion, as has happened after similar cases in India, became deified, and under his patronymic of Vasudev he was identified with the Bhagabat. (Indian Antiquity).

৩। The Great Epic of India.

নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তীকালে তিনি যে ভাগবতরূপে গৃহীত হইয়াছেন পতঞ্জলের মহাভাষ্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

এখানে আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, পাণিনির ২ অঃ ২-২৩ সূত্রে বহুব্রীহি সমাসের সমালোচনায় পতঞ্জল দৃষ্টান্ত দিয়াছেন,—

"সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয়স্য বলং কৃষ্ণস্য বর্দ্ধতাম্"।

পাতঞ্জল ভাষ্যের অনেকস্থলে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ নামের এক সঙ্গে প্রয়োগ আছে, উপরোক্ত স্থানে বাসুদেব স্থানে কৃষ্ণ নামের প্রয়োগ হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যিনি বাসুদেব তিনিই কৃষ্ণরূপে গৃহীত হইয়াছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা গীতার বিষয়।

নারদ পঞ্চরাত্র সংহিতায় নারায়ণ-উপাসনামূলক যে ঐকান্তিক ধর্ম্মের বিস্তৃত বিবরণ, গীতাতে সংক্ষেপে তাহারই সার রহিয়াছে. সুতরাং, গীতার উপদেশ কি তাহা জানা প্রয়োজন এবং এই সকল উপদেশের সারমর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে হইলে প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা গীতোক্ত উপদেশে মূর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে যে সকল প্রণালী অবলম্বন ক্রমে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সহিতও পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গীতা

বরাহ পুরাণে গীতা মাহাত্মের যে বর্ণনা আছে তাহাতে ভগবান্ বলিতেছেন "গীতা আমার ব্রহ্মরূপা পরা বিদ্যা, ইহা আমার উত্তম ভবন, আমি গীতার আশ্রয়ে অবস্থান করি।"

"গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ"
"গীতাশ্রয়োঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্"

অন্যত্র বলা হইয়াছে, উপনিষদগুলিকে গাভী এবং অর্জ্জুনকে বৎস রূপে গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধীদিগের জন্য যে পরম অমৃতরূপ দুগ্ধ দোহন করিয়াছিলেন তাহা গীতা।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দনঃ
পার্থো বৎস সুধীর্ভুক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

বস্তুতঃ আর্ত্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাষু জ্ঞানী, অধিকারীভেদে উত্তম মধ্যম অধম সর্ব শ্রেণীর লোকের জন্যই সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর কাল এই গ্রন্থ অমৃতের ভাণ্ডাররূপে পূজিত হইয়া আসিতেছে।

কথিত আছে যুদ্ধক্ষেত্রে আচার্য্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃব্য, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পূজার্হ ও স্নেহ-ভাজন আত্মীয়দিগকে প্রতিপক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া, এবং তাঁহাদের বধের আশঙ্কায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়া অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে অনিচ্ছা প্রকাশ করতঃ ধনুর্বাণ পরিত্যাগ পূর্বক রথোপরি বসিয়া পড়েন তখন সারথি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন সেই সকল উপদেশই গীতার অধিকৃত বিষয়।

যুদ্ধান্তে যুধিষ্ঠিরকে কৌরব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনান্তে কৃষ্ণ দ্বারকাতে প্রত্যাগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,

অর্জ্জুন নানারূপ ব্যস্ততা বশতঃ উপদেশ গুলি বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া পুনর্বার তাহা শুনিতে চান, তখন কৃষ্ণ তীব্র ভাষায় তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলেন "আমি যোগমগ্ন হইয়া তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, এইক্ষণ আর আমি তাহা কি করিয়া বলিব ? এই ভাবে তিনি যখন নিজের অপারগতা প্রকাশ করেন তখন বেদব্যাস বলিলেন তিনি যোগবলে সে কাল ও স্থানে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে সে সময় যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করিয়া যথাযথভাবে গীতাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা মহাভারত গ্রন্থের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত।

এই আখ্যানগুলির মূলে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে কি না তাহার আলোচনা প্রয়োজন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ৩০০০ খৃঃ পূর্বের কাছাকাছি কোন সময়ের ঘটনা ইতঃপূর্বে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি এবং ইহাও দেখান হইয়াছে তাহার পূর্বে ঋঙ্‌মন্ত্র রচনার কাল অতীত হইয়াছে, এবং সে সময় বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচনার কাল চলিতেছিল। মন্ত্রগুলি গায়ত্রী উষ্ণিক্, অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ, বৃহতী, পংক্তি ও জগতী এই সপ্তছন্দে কবিতায় রচিত, ক্বচিৎ বিরাট নামক অপর একটি ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির ভাষা গদ্য। এই গদ্যও কথ্যভাষার ন্যায় ক্রিয়াবহুল ছোট ছোট পদবিশিষ্ট। সমগ্র বৈদিকসাহিত্যের প্রায় তিন-চতুর্থ অংশ এই ব্রাহ্মণগ্রন্থ। আভ্যন্তরীণ প্রমাণ হইতে জানা যায় সুদীর্ঘকালব্যাপীয়া ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ রচনার যুগ চলিয়াছিল। তাহার পর আরণ্যক ও উপনিষদগুলি রচনার যুগ। উপনিষদগুলির মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান। পূর্বে বলা হইয়াছে ছান্দোগ্য উপনিষদ প্রকৃত প্রস্তাবে সামবেদীয় তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের অন্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের দশ অধ্যায়ের আট অধ্যায়। বৃহদারণ্যক শতপথ ব্রাহ্মণের মাধ্যন্দিন

শাখার শেষ অংশ। এই উভয় গ্রন্থ গদ্যে রচিত, কিন্তু তথাপি প্রাচীন ব্রাহ্মণগুলির ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। তদনন্তর রচিত উপনিষদগুলির ভাষা গদ্য-পদ্যমিশ্রিত। অবশেষে গদ্যভাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া মন্ত্রগুলি পদ্যতেই রচিত হইয়াছে—কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর এই শ্রেণীর গ্রন্থ। দেখা যায় ইহার পর গদ্যে কোন কোন উপনিষদ লেখার প্রয়াস হইয়াছিল, যথা—মাণ্ডুক্য। কিন্তু ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির ভাষা হইতে স্বতন্ত্র। এই পর্য্যন্ত বৈদিক ভাষা। ভাষার এই যে পরিবর্ত্তন তাহা এইখানেই বিরাম লাভ করে নাই, বরং এই পরিবর্ত্তন আরো দ্রুতগতিতে চলিতে থাকে এবং অবশেষে বৈদিক সপ্তছন্দে রচিত মন্ত্রগুলির স্থলে প্রধানতঃ অনুষ্টুভ ছন্দে রচিত শ্লোক-ভাষার সৃষ্টি হয়। মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণসকল এই ভাষায় রচিত।

যাস্কের নিরুক্ত, পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ী, ইহার উপর কাত্যায়ণের বার্ত্তিকা এবং এই বার্ত্তিকার উপর পতঞ্জলের মহাভাষ্যে বাক্য ও শব্দগুলির এই যে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রাচীন বৈদিক মন্ত্র রচনার কাল হইতে মহাকাব্যগুলির কাল পর্য্যন্ত এই ভাষাকে চারি যুগে বিভক্ত করা হয়, যথা—

(১) মন্ত্র রচনার যুগ—ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুর্বেদের মন্ত্রভাগ ও অথর্ববেদের প্রাচীন মন্ত্রগুলি এই যুগের রচনা।

(২) ব্রাহ্মণভাগ রচনার যুগ।

(৩) তৃতীয় যুগ যাস্ক ও পাণিনির সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত, উপনিষদগুলি প্রধানতঃ এই সময়ে রচিত।

(৪) পাণিনির সময় হইতে কাত্যায়নের বার্ত্তিকা রচনার যুগ। ইহা তাহার পরবর্ত্তী পতঞ্জলের সময় পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ডাঃ ভাণ্ডারকার এই তৃতীয় যুগকে Middle Sanskrit এবং কাত্যায়নের যুগকে Classical Sanskrit যুগ বলিয়াছেন (১)। পতঞ্জলের সময়ের ভাষাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী বৈয়াকরণগণের সময় ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহাকে আলঙ্কারিক যুগ বলা যাইতে পারে।

অনুমান ১৫০ খৃঃ পূঃ পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচনার কাল। ইহার পূর্ব্বে কাত্যায়নের বার্ত্তিকার বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যা ও টীকার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা হইতে ডাঃ ভাণ্ডারকার খৃষ্টের জন্মের চতুর্থ শতক পূর্ব্বে কাত্যায়নের সময় নির্ণয় করেন। ইহাই রামায়ণ ও মহাভারতের প্রাচীন অংশগুলি রচনার কাল। পাণিনির আবির্ভাব কাল কাত্যায়নের অনুমান চারিশত বৎসর পূর্ব্বে। যাস্ক পাণিনির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (২)।

---

(১) Panini's Work contains the grammar of Middle Sanskrit, while Katyayana's that of Classical Sanskrit, though he gives his sanction to the archaic forms of the former, on the principle as he himself has stated, on which the authors of the Sacrificial Sutras teach the ritual of long sacrificial sessions though they had ceased to be held at their time. Patanjali gives but few forms, which differ from Katyayana's, and on no way do they indicate a different stage on the growth of the language, hence his work is to be referred to the same period. The form which the language assumed at this time became the standard for later writers to follow, and Katyayana and Patanjali are now generally acknowledged authorities on all points concerning the correctness of Sanskrit speech.

Wilson Lecture.

(২) In the time of this grammarian (Katyayana), the sanskrit language assumed a different form from that it had in that of Panini, and by the time of Patanjali very great reverence had come to be paid to this last author. For in

'মহাকাব্যগুলির বর্ণনার ভাষা (যাহাকে ডাঃ ভাণ্ডারকার Classical Sanskrit আখ্যা দিয়েছেন এবং যাহাকে শ্লোকাত্মক প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বলা হয় তাহা) দেবী সরস্বতীর অনুকম্পায় কবিগুরু বাল্মিকীর মুখে (১) আপনা হইতে প্রথম নির্গত হইয়াছিল', এই যে লোক-প্রবাদ এই সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সম্ভবতঃ রামায়ণ রচয়িতাই লৌকিক ভাষায় প্রথম অনুষ্টুভ (পয়ার) ছন্দ মহাকাব্য রচনায় প্রয়োগ করেন। এই পরিবর্ত্তন কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা নহে। সংস্কৃত জীবন্ত ভাষা ছিল। অন্যান্য প্রাণবন্ত ভাষার ন্যায় ইহারও ক্রমশঃ রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। এই রূপ পরিবর্ত্তন জীবনীশক্তির লক্ষণ। ফলতঃ সেকালে ইহা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত. লৌকিক ভাষা ছিল এই সকল ব্যাকরণের শব্দ বিচার হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ডাঃ ভাণ্ডারকার বলেন,—

"These changes could not have taken place of the language had it been dead or petrified into a merely literary language,"

প্রাচীন ঋগ্বেদ সংহিতার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া যাস্ক ও পাণিনির সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃতকে বৈদিক সংস্কৃত ভাষা বলা হয়।

giving the uses of grammar, the author of the Mahabhashya says that it is the duty of a Brahman to study the Vedas along with their Angas or the illustrative Sastras, and of the six Angas Grammar is the chief............ To account for this and some of the other circumstances noticed by Dr. Gold-Stucker, we must place Panini about four centuries before Katyayana, that is, refer him to about the 8th. century before Christ. Jaska must have flourished a short time before him.

Wilson Lecture.

(১) মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম শাশ্বতী সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

ইহার পরবর্ত্তী কাত্যায়নের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া যে ভাষায় মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ, নাটক ইত্যাদি রচিত হইয়াছে তাহাকে লৌকিক সংস্কৃত বলা হয়। লৌকিক সংস্কৃতে বৈদিক সংস্কৃত কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এস্থলে তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

বেদে দেব শব্দের প্রথমার বহুবচনে "দেবাসঃ" শব্দের প্রয়োগ হয়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহা "দেবাঃ"।

লৌকিক সংস্কৃতে "গৃহ্লামি" শব্দ বেদের "গৃঙ্ণামি" শব্দের রূপান্তর। আত্মন্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনের রূপ বৈদিক সংস্কৃতে "ত্মনা", লৌকিক সংস্কৃতে "আত্মনা"।

ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ যে সময় প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তখন বৈদিক-ভাষা ব্রাহ্মণ-যুগের গদ্য ভাষা ছিল। আমরা সচরাচর কথ্যভাষায় যেরূপ বাক্য ব্যবহার করিয়া থাকি, ইহা তেমনি ক্রিয়াবহুল ছোট ছোট বাক্যযুক্ত ছিল।

(In such books as the Aitareya and Satapatha Brahmans we find short sentences and an abundance of verbal forms.—Bhandarkar)

ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার যুগ দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। তদনন্তর আরণ্যক, উপনিষদ ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রগুলি রচনার যুগ। ইহার পর বৈদিক সংস্কৃত রূপান্তরিত হইয়া লৌকিক সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে। গীতা সেই রূপান্তরিত ভাষার যুগের রচনা। বেদ-সঙ্কলনকর্ত্তা ব্যাস কর্ত্তৃক এই ভাষায় গ্রন্থ রচনা করা ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে যেমন সম্ভবপর হইতে পারে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সময়ের বহুশতাব্দী পরবর্ত্তীকালের রচিত উপনিষদগুলিকে গাভীরূপে গ্রহণ করা কৃষ্ণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। ইহা যেন রাম জন্মিবার পূর্বে রামায়ণ রচনা।

গীতা যদি বেদ-সঙ্কলনকর্ত্তা ব্যাসের রচনা না হয়, ইহার উপদেশগুলিও যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদান করা সম্ভবপর না হয়, তবে কাঁহাদ্বারা কখন কোন্ আবেষ্টনের মধ্যে এই অমৃত-বাণীসকল প্রদত্ত হইয়াছিল ? এই প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। ইহার কোন সদুত্তর পাওয়া যায় কিনা, এস্থলে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকাল দ্বাপরের শেষ ও কলিযুগ আরম্ভের প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে। নারায়ণী উপাখ্যানে আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণের জন্মের বহুপূর্বে সত্যযুগের আরম্ভে রাজা উপরিচর বসু অহিংসামূলক ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। মহাভারতে তাঁহাকে পুরুবংশোদ্ভব বলা হইয়াছে। (আদিপর্ব ৬৩ অধ্যায়) (১)।

ঋগ্বেদ হইতে দেখা যায় আর্য্যগণ দুইটি প্রধান শাখায় প্রথম এদেশে আগমন করেন। এক শাখার অধিনায়ক ছিলেন মনু, অপর শাখার অধিনায়ক নহুষ-পুত্র যযাতি কিম্বা তাঁহার পুত্রগণ। ঋগ্বেদে একাধিক মনুর উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার ৮ম মণ্ডলের ২৭ হইতে ৩১ সূক্ত পর্য্যন্ত ৫ সূক্ত বিবস্বন্-পুত্র আদি মনুর রচনা। ইনি সাবর্ণ্য নামক বিবস্বান্-পুত্র মনুপ্রজাপতি। দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ঋষি ইঁহার প্রবল পরাক্রম ও দানের প্রশংসা করিয়া তাঁহার বংশবৃদ্ধির জন্য বিশ্বেদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। এই ঋষি নিজকে মনুর সন্তান (অর্থাৎ মনুর বংশধর) এই অর্থে **মানব** বলিয়াছেন।

ঐ মণ্ডলেরই ৮০ সূক্তের ৬ষ্ঠ মন্ত্রে বলা হইয়াছে, "মনুষ্য"-জাতীয় প্রজাবর্গ অগ্নিকে স্তব করে, "নহুষের সন্তান মনুষ্যগণ"ও তাহাই করে। এখানে মনুর সন্তান মনুষ্য এবং নহুষের সন্তান

(১) শ্রীমদ্ভাগবত মতে উপরিচর কুরুর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। কুরু-সুধনু-সুহোত্র-চ্যবন-কৃতি-উপরিচর। ইহার সহিত মহাভারতের আখ্যানের কোনরূপ সামঞ্জস্য হয় না।

মনুষ্য যে দুই পৃথক সম্প্রদায় তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। নবম মণ্ডলের ১০১ সূক্তের চারিজন ঋষি। সূক্তে ১৬টি ঋক্। ৪-৬ ঋকের ঋষি "যযাতির্নাহুষঃ",—নহুষের পুত্র যযাতি। ৭—৯ ঋকের ঋষি নহুষোমানবঃ—মনুর অপত্য নহুষ। ১০—১২ ঋকের ঋষি মনুঃ সাংবরণঃ—সংবরণ-পুত্র মনু। ১০—১৬ মন্ত্রের ঋষি প্রজাপতিঃ।

এই সূক্তটিতে নহুষ এবং সংবরণ মনু দুইজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। একের সন্তানগণ মনুর সন্তান বলিয়া মানব, অপরের সন্তানগণ নহুষের বংশধর বলিয়া মনুষ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন।

প্রথম মণ্ডলের ৩১ সূক্তের ১৭ ঋকে অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তুপ ঋষি অঙ্গিরা, মনু ও যযাতির এক সঙ্গে নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে পূর্বপুরুষস্থানীয় বলিয়াছেন। যযাতি নহুষের পুত্র। এখানে যে মনুর উল্লেখ, তিনি সংবরণ মনু। সাবর্ণ্য মনু অথবা তাঁহার বংশধর অপর কোনও মনুর অধিনায়কত্বে একদল আর্য্য প্রথম এদেশে আগমন করেন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্বদিকে সরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত উপনিবেশ বিস্তার করেন। যাঁহারা যযাতি অথবা তাঁহার সন্তানগণের অধীনে আগমন করেন তাঁহারা সংবরণ মনুর বংশধর। ঋষি ভরদ্বাজ সরস্বতী নদীর তীরবাসী অগ্নিউপাসকদিগকে মনুর সন্তান বলিয়াছেন। তাঁহারা ভরত ও তৃৎসু এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ভরতগণ সরস্বতী দৃষদ্বতী ও আপেয়া নদীর উপকূলস্থ জনপদে বসতি স্থাপন করেন, তৃৎসুগণ ইহার পশ্চিমে পরুষ্ণি (বর্ত্তমান নাম রাভি) নদীর উভয় তীর হইতে পূর্বদিকে ভরত জনপদের সীমা পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। অপর দল নহুষ কিম্বা যযাতির অধিনায়কত্বে যে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহাদের

মধ্যে তিনটি শাখার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। যদু ও তুর্বসু শাখা ইহাদের অন্যতম। এই শাখা দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রের উপকূল পর্য্যন্ত বসতি স্থাপন করিয়াছিল। দ্বিতীয় পুরুশাখা এবং ইঁহাদিগের বসতি পশ্চিমপ্রান্তে গান্ধার (বর্ত্তমান আফগানিস্থান)সহ সিন্ধুনদীর উভয় তটপ্রদেশ। তৃতীয় অনু ও দ্রুহ্যু শাখা, কিন্তু এই শাখা সপ্তসিন্ধু-প্রদেশের কোন্ স্থানে যে বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহা জানা যায় না। আর্য্যদিগের এই পাঁচ শাখা দ্বারা প্রথম পাঁচটি রাজ্য বা জনপদ স্থাপিত হয়, সেজন্য ইঁহারা পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চ জনপদ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলেই অগ্নি-উপাসক ছিলেন, এজন্য ঋগ্বেদের স্থানে স্থানে পঞ্চকৃষ্টি নামেও অভিহিত হইয়াছেন।

প্রথমাবস্থায় ভরত ও তৃৎসু শাখাই বিশেষ প্রবল ছিল। অনার্য্যদিগের সঙ্গে অহর্নিশি সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিয়া ইঁহারা ক্রমশঃ পূর্বদিকে উপনিবেশ বিস্তার করিতে থাকেন। সরস্বতী নদীর তীর যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা পরম পবিত্র পুণ্যভূমিতে পরিণত হয়। ভরত শাখার বিশ্বামিত্র এবং তৃৎসু শাখার বশিষ্ঠ দুইজনই বিশেষ প্রসিদ্ধ ঋষি।

এই উভয় শাখা মূলে যে একই ছিল, ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্র হইতে তাহা বুঝা যায়—যথা, এক স্থানে বশিষ্ঠ ভরতবংশীয়-দিগকে "অজ্ঞান তৃৎসু" (৭-১৮-১৫) বলিয়াছেন। এই দুই শাখার নরপতিগণ যজ্ঞের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী তীরে অনেক যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইহাকে পরম পবিত্র ভূমিতে পরিণত করেন, সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদীর মহিমাও বৃদ্ধি পায়। ঋষি বশিষ্ঠ এক স্থানে (৭-৯৫-৪) সরস্বতীর স্তুতি করিতেছেন,—

"সুভগা সরস্বতী প্রীতা হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে স্তুতি শ্রবণ করুন। দেবগণ নতজানু হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করেন।" অন্যত্র (৭-৯৬-১) বলা হইয়াছে,—

"হে বশিষ্ঠ! তুমি নদিগণের মধ্যে বলবতী সরস্বতীর উদ্দেশ্যে বড় বড় স্তোত্র গান কর। দ্যাবা-পৃথিবীতে বর্ত্তমানে সরস্বতীই দোষবর্জ্জিত স্তোত্র দ্বারা পূজার্হা জানিবে।"

এই পঞ্চ শাখাই অগ্নির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদিগের যত সব অভ্যুদয় যজ্ঞ হইতেই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা তাঁহাদের ধারণা ছিল।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তে ঋষি যজ্ঞাগ্নিকে স্তুতি করিতেছেন,—

"অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত, দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক ও প্রভূত রত্নের ধারক।" ইহার ৩১ সূক্তের ১১শ মন্ত্রে ঋষি অগ্নিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হে অগ্নি! দেবগণ তোমাকে প্রথমে মনুষ্যরূপধারী নহুষের সেনাপতি করিয়াছিলেন (দেবা অকৃণ্বন্নহুষস্য বিশ্‌পতিং)ও ইলাকে মনুর ধর্ম্মোপদেষ্টা করিয়াছিলেন (ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং) (১)।

---

(১) ইলা—শতপথ ব্রাহ্মণে মনুর সময়ে এক জলপ্লাবনের উল্লেখ আছে। সমস্ত দেশ যখন জলে নিমগ্ন মনু এক নৌকার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করেন। ঐ নৌকাতেই এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যাহা হইতে ইলা উৎপন্ন হয়। এই ইলা হইতে প্রজা সৃষ্টি। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ২৭ সূক্তের ১৪ মন্ত্রে দক্ষের কন্যা ইলার উল্লেখ আছে। সেখানে ইলা অর্থ বেদিরূপা যজ্ঞভূমি, যাহা হইতে সৃষ্টি। এই মণ্ডলেরই ২৩ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রে ইলা পৃথিবী অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বেদের দশম মণ্ডলে ৯৫ সূক্তে উর্বশী-পুরুরবাকে ইলা-পুত্র বলিয়াছেন। ("ইতি ত্বা দেবা ইম আহুঃ ঐল")। পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ। ঋগ্বেদে যজ্ঞের বেদিরূপা ভূমিকে যে দক্ষ-কন্যা ইলা বলা হইয়াছে, পুরাণে এই ইলাকে চন্দ্রের পত্নীরূপে কল্পনা করিয়া ইলার পুত্র পুরুরবাকে চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ বলা হইয়াছে। ইনি পুরু ও যদু উভয় বংশেরই আদিপুরুষ।

এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রে ঋষি অগ্নিকে স্তুতি করিয়া বলিতেছেন,—হে অগ্নি! তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে, অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা যে স্বর্গলাভ হয় মনুকে তাহা জানিতে দিয়াছিলে। যজ্ঞ সর্বপ্রকার অভ্যুদয়ের কারণ, এমন কি যজ্ঞ হইতেই যে জগৎ-সৃষ্টি ইহা আর্য্যদিগের অন্তরে দৃঢ়প্রতীতি ছিল। সেজন্য যাহাতে যজ্ঞক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, কোনরূপ ভ্রম প্রমাদ না ঘটে সে সম্বন্ধে তাঁহারা বিশেষ সাবধান ছিলেন।

দেখা যায়, ভরত ও তৃৎসুশাখার নরপতিগণ যজ্ঞের প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে তৃৎসুশাখার রাজা দিবোদাস ও সুদাসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিবোদাস অযাজ্ঞিক অনার্য্যদিগের সহিত এবং সনাতন যজ্ঞপদ্ধতি হইতে কোনরূপ বিচ্যুতি ঘটিয়াছে এরূপ আর্য্যশাখার লোকদিগের সঙ্গেও যুদ্ধ করিতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন নাই। ফলতঃ তাঁহার সমগ্র জীবনই এই ভাবে কাটিয়াছিল। পূর্বদিকে সরযূনদীর তীরে এইরূপে আচারভ্রষ্ট আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিবার উল্লেখ আছে (৪-৩০-১৮)। দিবোদাসের রাজত্বকালের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা, পঞ্চকৃষ্টির অন্যতম কৃষ্টি তুর্বসু ও যদুদিগের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ। নবম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে এই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। এই যুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত তুর্বসু ও যদু শাখা যে বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে, কিন্তু এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উক্ত তুর্বসু ও যদুগণ এরূপ হীনবল হইয়া পড়েন যে, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের আর কোন উল্লেখই দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা আর্য্যদিগের গণ্ডী হইতে বহিষ্কৃত ও দেশ হইতে বিতারিত হইয়াছিলেন। ইহার পরবর্ত্তী কালে সুদাস রাজার সঙ্গে এক যুদ্ধে দ্রুহ্যু ও অনুবংশীয়েরাও বিশেষরূপে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিলেন দেখা যায়। যদু ও তুর্বসু শাখার সহিত দিবোদাসের যুদ্ধের প্রকৃত কারণ কি তাহার উল্লেখ না

থাকিলেও যজ্ঞক্রিয়া প্রসঙ্গে কোনরূপ মতানৈক্য যে ইহার মূল কারণ এরূপ অনুমান হয়।

পশুবধ যজ্ঞের এক প্রধান অঙ্গ। আমরা দেখিয়াছি পুরুবংশীয় রাজা উপরিচর বসু পশুবধ প্রথা রহিত করিয়া পৃথিবীজাত বৃহী যবাদি দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। যযাতির বংশধরদিগের তিন শাখা পরবর্ত্তী কালের আগন্তুক। তাঁহারা পরস্পর একই ভাবাপন্ন ছিলেন। এই তিন শাখার মধ্যেই যজ্ঞে এই নূতন প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব এবং এই কারণেই হয়ত অপর দুই প্রাচীন শাখার সঙ্গে তাঁহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। দেখা যায়, ইহাতে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া পুরুবংশীয় শাখা পুনরায় যজ্ঞে পশুবধ প্রথা প্রবর্ত্তন করেন এবং তাঁহারা অপর দুই প্রাচীন শাখার গণ্ডীর মধ্যে পুনরায় স্থান লাভ করেন। তুর্বসু ও যদু এবং অনু ও দ্রুহ্যু শাখার এই যে অবনতি ঘটিল তাহার ফলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ দুই শাখা হীনপ্রভ রহিয়া গেল। উক্ত দুই শাখার প্রাচীনপন্থিগণ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করিয়া লইলেন কিন্তু তথাপি তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিলেন না।

প্রাচীনপন্থীগণ আর্য্যগণের কৃষ্টি অব্যাহত রাখিবার জন্য এইরূপ প্রয়াস সত্ত্বেও অনার্য্যদিগের সংমিশ্রণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। কালসহকারে উভয় জাতির মধ্যে মৈত্রী ও সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল, অনার্য্যগণও আর্য্যগণ্ডীর মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি অনার্য্য নারীগর্ভ-সম্ভূত কোন কোন বড় ঋষিরও উদ্ভব হইয়াছিল, যথা কক্ষীবান্ ও কবস ঋষি। তৃৎসু ও ভরত শাখা সময়ে এক হইয়া যায় এবং তাঁহারা ক্রমশঃ পূর্বদিকে কোশল ও কাশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরুবংশীয়েরাও পূর্বদিকে কুরুক্ষেত্র হস্তিনাপুর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। দেখা যায় এই সময় পুরুবংশীয়েরাই সমধিক পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই বংশসম্ভূত দুষ্মন্ত পুত্র ভরত শৌর্য্য-বীর্য্য-পরাক্রমে

আর সকলকে অতিক্রম করিয়া সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই অভ্যুদয়কালে পুরুবংশীয়গণ তাঁহাদের তুর্বসু ও যদু শাখার যাঁহারা দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনেন ও পুনরায় অভিষিক্ত করিয়া আর্য্যগণ্ডীর মধ্যে স্থান প্রদান করেন। ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৫ সূক্তে দূরদেশ হইতে তাঁহাদিগকে পুনরায় দেশে ফিরাইয়া আনয়ন করিবার উল্লেখ আছে, এবং চতুর্থমণ্ডলের ৩০ সূক্তের ১৭ মন্ত্রে বলা হইয়াছে যজ্ঞপতি ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্বসু ও যদুবংশীয়দিগকে অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদের কৃষ্ণাখ্য ঋষি ইহার দশম মণ্ডলের ৪২, ৪৩ ও ৪৪ সূক্তে ইন্দ্রের স্তবস্তুতি করিতেছেন এবং ইন্দ্রের এই অনুকম্পার বিষয় স্মরণ করিয়া বলিতেছেন :—

"হে ইন্দ্র! আমার মন একমাত্র তোমাতেই নিবদ্ধ রহিয়াছে, ইহা অন্যত্র যায় না। তোমার উপর আমার সমুদয় অভিলাষ স্থাপন করিয়াছি।" ৪৩ সূ—২ ঋক।

"যাঁহারা পূর্বকাল হইতে যজ্ঞে দেবতাদের নিমন্ত্রণ করিতেন, তাঁহারা সে সকল সুকৃতি ফলে স্বতন্ত্র ভাবে সদ্‌গতি লাভ করিয়াছেন; কিন্তু যাহারা যজ্ঞরূপ নৌকা আরোহণ করিতে পারে নাই, তাহারা কুকর্ম্মান্বিত। তাহারা ঋণী রহিয়া গেল এবং সেই অবস্থাতেই তলাইয়া গেল।" ১০-৪৪-৬

"সম্প্রতিও যাহারা সে প্রকার দুর্ম্মতি তাহাদিগের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজিত হইয়াছে, তাহাদেরও অধোগমন হউক! যাঁহারা পূর্বাবধি যজ্ঞাদি উপলক্ষে দান করেন, তাঁহারা যথায় অতি চমৎকার নানাবিধ ভোগের সামগ্রী প্রস্তুত আছে সেইরূপ উত্তম ধাম প্রাপ্ত হন।" (১০-৪৪-৭)

যাঁহার প্রসাদে যদুবংশীয়েরা পুনর্বার আর্য্যসমাজে স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন,তাঁহার প্রতি এরূপ স্তুতি বন্দনা স্বাভাবিক।

অতঃপর আমরা এই সকল আলোক সাহায্যে গীতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কিন্তু তাহার পূর্বে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ প্রয়োজন। মহাভারত শান্তিপর্বের ৩৪২ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তিনিই মানবদের একমাত্র আশ্রয়। বেদাদি শাস্ত্রনিচয়ে তাঁহার প্রভূত নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি কর্ম্মসম্ভূত। আপ্‌ নর হইতে উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নার। ঐ নার পূর্বে তাঁহার অয়ন বা আশ্রয় স্থান ছিল বলিয়া তিনি **নারায়ণ**।

বাসু শব্দের অর্থ নিবাস এবং দেব শব্দের অর্থ প্রকাশক। তিনি সূর্য্য স্বরূপ হইয়া কিরণজাল দ্বারা জগৎসংসার প্রকাশিত করেন, এবং সমুদয় জীবই তাঁহাতে বাস করিয়া থাকে, সে জন্য তাঁহার নাম **বাসুদেব**।

বিষ্ণু শব্দের অর্থ গতি, উৎপাদক, ব্যাপক, দীপ্তিমান এবং প্রবেশ ও নির্গমের স্থান। তিনি জীবগণের একমাত্র গতি ও জনয়িতা, এই বিশ্বসংসারে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার কান্তি সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত জীব উৎপন্ন ও পুনরায় তাঁহাতেই লীন হয় এই জন্য তাঁহার নাম **বিষ্ণু**।

তিনি মন্ত্র কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞ ভাগ হরণ করেন, তাঁহার বর্ণও হরিদ্‌বর্ণের ন্যায় এই নিমিত্ত লোকে তাঁহাকে **হরি** বলে।

তিনি নিরন্তর নিষ্পাপ থাকিয়া সত্ত্বগুণ সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তিরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞান দ্বারাই তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন, এইজন্য তিনি সাত্ত্বত নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ণ কৃষ্ণ অপিচ তিনি লাঙ্গলফলকরূপী হইয়া পৃথিবী কর্ষণ করেন, এইজন্য তিনি কৃষ্ণ নাম ধারণ করিয়াছেন।

এই সকল উক্তি হইতে দেখা যায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষ্ণু, নারায়ণ ও বাসুদেব এই ত্রিবিধ তত্ত্বের সমাধান এই কৃষ্ণ তত্ত্বের মধ্যে করা হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৩৪৯ অধ্যায়ে আর একটি আখ্যায়িকা আছে, তথায় জন্মেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন্ দেবতা বা কোন্ মহর্ষি ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন? উত্তরে বৈশম্পায়ন বলেন, কুরু-পাণ্ডবীয় সমরে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনায়মান হইলে কৃষ্ণ তাঁহার নিকট ইহা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ৩৩৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে হরিগীতাতে এই ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। হরিগীতাই ভগবদ্গীতা।

ঐকান্তিক ধর্ম্ম কি তাহা নারায়ণতত্ত্বের আলোচনায় বলা হইয়াছে। ইহা বৈদিক বহু দেবতার পরিবর্ত্তে অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে নারায়ণরূপী এক দেবতার উপসনামূলক ধর্ম্ম।

ঋগ্বেদের ঋষি কৃষ্ণ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে যে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই সকল উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে তাঁহারা যে এক সময়ের লোক হইতে পারেন না, পূর্ব্বে তাহার কারণ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ঋষির দৃষ্ট ১০ মণ্ডলের ৪৩ সূক্তের ২য় ঋক্ (যাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে) হইতে এই অব্যভিচারিণী ভক্তিতত্ত্বের সুস্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়।

"হে ইন্দ্র! আমার যত কিছু কামনা একমাত্র তোমাতেই সব সংস্থাপিত, আমার মন অচঞ্চল ভাবে একমাত্র তোমাতেই নিবদ্ধ, তোমা হইতে অন্যত্র যায় না।"

মন্ত্রের প্রথম চরণ—"ন ঘা ত্বদ্রিগপ বেত্তি মে মনস্ত্বে ইৎ কামং পুরুহূত শিশ্রয়।"

গীতার আর একটি বাক্য—"ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইহাও এই ঋষির দৃষ্ট আর একটি মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে। মন্ত্রটি ঐ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্।

"বিশং বিশং মঘবা পর্য্যশায়ত জনানাং ধেনা অবচাকশদ্বৃষা।" ধন দাতা ইন্দ্র প্রত্যেক মানুষেব মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

এই বেদমন্ত্রকে অনুসরণ করিয়া ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরি উপনিষদে "দহর বিদ্যা" বিষয়ক যে সকল বর্ণনা, গীতার এই শ্লোকটি বিশেষভাবে তাহা নির্দ্দেশ করে।

গীতার নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোক :—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যাঁহারা অনন্যকাম হইয়া আমার চিন্তা করতঃ ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগের যোগক্ষেম বহন করি অর্থাৎ আমি তাঁহাদিগের (যোগ) ধনাদি লাভ ও (ক্ষেম) সেই অপ্রাপ্য বরণীয় ধনরক্ষার ব্যবস্থা করি।

ইহা ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ঋষি বশিষ্ঠের বাস্তোষ্পদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি মন্ত্র হইতে গৃহীত হইয়াছে।

"বাস্তোষ্পতে
পাহি ক্ষেম উত যোগে বরং নো যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ।"
(৩য় ঋক্)

"হে বাস্তোষ্পতি! তুমি আমাদিগের যোগক্ষেম (প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বরণীয় ধন) রক্ষা কর এবং আমাদিগকে কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া সর্বদা পালন কর।"

যজ্ঞ হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩০ সূক্তে তাহার বর্ণনা আছে। সূক্তের দেবতা প্রজাপতি, ঋষি স্বয়ং যজ্ঞ। যজ্ঞ হইতে আর্য্যদিগের সকল প্রকার জ্ঞান ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, ইহা সে কালে প্রাচীন আর্য্যদিগের দৃঢ় প্রতীতি ছিল। ঋগ্বেদের নানা স্থানে ইহার নিদর্শন রহিয়াছে। যজ্ঞ দ্বারা মনুর বংশবৃদ্ধির জন্য যে প্রার্থনা তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১০ম শ্লোকে এই সকল বিষয়ই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥"

স্বয়ং প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজা সৃষ্টি করতঃ বলিতেছেন, "যজ্ঞ দ্বারা তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হউক, যজ্ঞ তোমাদিগকে অভীষ্ট দান করিবে"।

এমন যে অভীষ্ট-ফলপ্রদ যজ্ঞ, ইহা হইতে বিমুখ যাহারা ঋষি কৃষ্ণ তীব্র ভাষায় তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, তাহারা কুকর্ম্মান্বিত, তাহাদের রথে দুষ্ট অশ্ব যোজিত রহিয়াছে, তাহাদের অধোগতি সুনিশ্চিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদে সমগ্র মানবজীবনকে একটা যজ্ঞ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সে কালে আর্য্যগণ এই ভাবেই জীবনটাকে গ্রহণ করিয়া দৈনন্দিন কার্য্যগুলি নিয়ন্ত্রিত করিতেন। বিশেষ জটিল ও ব্যয়সাধ্য বড় বড় যজ্ঞ ব্যতীত দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠিতব্য কতকগুলি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহাদিগকে পঞ্চ মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। ঐগুলি সকলই সহজসাধ্য। তথায় ইহাদিগকে দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ ও ঋষিযজ্ঞ বলা হইয়াছে।

"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে সততি সন্তিষ্ঠন্তে।"

এই পাঁচটি মহাযজ্ঞ প্রতিদিনই উদ্‌যাপন ও সম্পন্ন করিতে হইবে। তারপর বলা হইয়াছে।—

"যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং তৎ দেবযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে, যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ তৎ পিতৃযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে, যৎ ভূতেভ্যো বলিং হরতি তদ্ ভূতযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে, যৎ স্বাধ্যায়াং অধিয়ীত একমপি ঋচং যজুঃ সাম বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে।

গৃহাগ্নি দেবতার উদ্দেশ্যে একখানা সমিৎকাষ্ঠ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল দিলেও

পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, পশু-পক্ষী ইত্যাদি প্রাণিমাত্রের উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ আহার্য্য প্রদান করিলেও ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, অতিথিকে কিছু অন্ন দিলে মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়, প্রতিদিন বেদ অধ্যয়ন করিলে, নিতান্ত পক্ষে একটি ঋক্, একটি যজুঃ বা একটি সাম অধ্যয়ন করিলেও ঋষি বা দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

সাংসারিক জীবন নির্বাহের জন্যও সে কালে গৃহাগ্নি রক্ষা প্রয়োজন ছিল। সেই অগ্নিতে একখণ্ড সমিৎ কাষ্ঠ প্রদান, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে এক গণ্ডূষ জল অর্পণ, পশুপক্ষীকে সাধ্যানুরূপ কিছু আহার্য্য দান, অতিথি সৎকার এই সকল কার্য্যে গৃহস্থের পক্ষে ত্যাগ খুবই সামান্য, কিন্তু ইহার ভিতর গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রহিয়াছে। জগতে যাহা কিছু সকলই পরস্পরের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বদ্ধ থাকিয়া প্রত্যেক মানব তাহার নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে এক উপকার্য্য উপকারক সম্বন্ধে সকলেই কোন না কোন কারণে পরস্পরের নিকট ঋণী। এই ঋণ স্বীকার করিয়া সাধ্যানুসারে পরোপকারের জন্য আত্মনিয়োগ শিক্ষা এই মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য। ইহারা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ শুচিতা লাভের পরম সহায়।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যেও স্বাধ্যায়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে ইহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হইয়াছে।

"এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্য ইহার জুহূ, মন ইহার উপভৃত, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি; ঋঙ্মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার হোমাহুতি, অথর্বাঙ্গিরসমন্ত্র ইহার মেধাহুতি এবং পুরাণ ইতিহাসাদি ইহার মধু আহুতি।

জল-প্রবাহ, নক্ষত্রের গতি, বায়ু-বেগ ইত্যাদির যে কোনও একটী বন্ধ হইলে জগৎচক্র যেরূপ বিকল হয় সেইরূপ গৃহস্থ যেদিন অধ্যয়ন বিহীন হন, তাঁহার গৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়।

এস্থলে যে সকল আহুতির উল্লেখ করা হইয়াছে, যজ্ঞে তাহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন। কাজেই পূর্ণাঙ্গ সাধ্যায় বা ব্রহ্মযজ্ঞ সুষ্ঠুরূপে নিষ্পন্ন করিতে হইলে গৃহস্থের চারি বেদ, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদি সকল শাস্ত্রই নিত্যপাঠ প্রয়োজন। তাহা না করিলে তাহার অধোগতি হয়।

যজ্ঞ সম্বন্ধে ঋষির উক্তিগুলিকে গীতায় এইভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে :—

"যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব কিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

(৩ অ ১৩)

যে সকল সজ্জন ব্যক্তি যজ্ঞের হবিঃশেষ রূপে ভোগ্য বস্তু উপভোগ করেন, অর্থাৎ পরোপকার সাধনান্তর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই মাত্র নিজের ভোগের প্রয়োজনে গ্রহণ করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা উদর-সর্বস্ব, কেবল নিজের জন্য অন্ন পাক করে তাহারা পাপ আহার করে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যক যে পঞ্চমহাযজ্ঞের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে ইহাদিগের মধ্যে প্রধান স্বাধ্যায়রূপ ঋষি বা ব্রহ্মযজ্ঞের মাহাত্ম্যের যে বর্ণনা আছে, এই সকল তত্ত্ব জ্ঞাপন করিতে গিয়া গীতায় বলা হইয়াছে :—

"কর্ম্মব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্মনিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥

(৩ অ ১৫)

কর্ম্ম বেদ হইতে এবং বেদ পরব্রহ্ম অক্ষর হইতে উদ্ভূত বলিয়া জানিবে। অতএব নিত্য সর্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি॥১৬

এই প্রকার অর্থাৎ জীবগণের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য কর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ইহার অনুবর্ত্তন করে না, তাহার জীবন নিষ্ফল, সেই ইন্দ্রিয়াশক্ত পাপাত্মা পুরুষ বৃথাই জীবনধারণ করে।

জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মকেই এইরূপে যজ্ঞের কর্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে সমগ্র জীবনটা ভগবদুদ্দেশ্যে আহুতি স্বরূপ হইবে। এইরূপে নিয়ন্ত্রিত জীবনের যত কিছু কর্ম্ম—ভোগ, দান, তপস্যা, পূজা, সকলই ভগবদুদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন হইবে। ইহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে ঃ—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ (৯ অঃ ২৭)

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে গীতায় বর্ণিত এই সকল তত্ত্ব উপনিষদযুগের পূর্ববর্ত্তী সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুণ-কর্ম্ম বিভাগানুযায়ী চতুর্বর্ণের সৃষ্টি সম্বন্ধে যে উক্তি, তাহাও উপনিষদের পূর্ববর্ত্তী যজুর্বেদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ৪র্থ ও ৭ম কাণ্ডে (১) এই চারিবর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক দুইটি যজ্ঞের বিবরণ আছে।

উপনিষদ্ যুগে ক্রিয়াবহুল বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ বৈদিক যজ্ঞগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে; দৃষ্টান্তস্বরূপ যথা,—অশ্বমেধ যজ্ঞ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহাতে এই সমগ্র জড়প্রপঞ্চ সৃষ্টিকে অশ্বদেহের ভিন্ন ভিন্ন অংশরূপে কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, প্রাণহীন দেহের ন্যায় ইহা অপবিত্র ও স্ফীত হইতে লাগিল। প্রজাপতি তখন স্বয়ং ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে এই অশ্বদেহ মেধ্য অর্থাৎ

(১) "মানবতার অভিব্যক্তি ও বৈদিক কৃষ্টি" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পবিত্র হইল। পরিশেষে বলা হইয়াছে এই তত্ত্ব যিনি অবগত আছেন, তিনি 'অশ্বমেধস্য মেধ্যত্বং' কি তাহা জানেন।

উপনিষদ যুগেই সাংখ্যতত্ত্বাবলি ও যোগসাধন প্রণালী বৈদিক সাধনায় ক্রমশঃ এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছিল। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মুণ্ডক উপনিষদে এতদুভয়ের আলোচনায় তাহা দেখা যায়। গীতায় সে সকল মত গৃহীত হইয়াছে, অধিকন্তু সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরবাদকে পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে পুরুষোত্তম তত্ত্ব স্থাপন করা হইয়াছে।

উপনিষদ যুগের আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়া এই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ইহাদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঃ—

"দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায় জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥"
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতীরুদ্ধা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি॥

৪ অ ২৮।২৯

যত্নশীল ও তীক্ষ্ণ ব্রতধারী ব্যক্তিদিগের কাহারো নিকট দ্রব্যত্যাগ যজ্ঞ, কাহারো বা তপস্যাই যজ্ঞ, কাহারো বা যোগই যজ্ঞ, আবার কাহারও নিকট বেদাধ্যয়ন এবং জ্ঞানার্জ্জনই যজ্ঞ। কেহ বা অপানে প্রাণকে, প্রাণে অপানকে হবনপূর্বক প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিরা প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। কেহবা রূপরসাদি যাবতীয় ভোগ্যদ্রব্যকে ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি দেন, আবার কেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণকর্ম্মকে আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে আহুতি দেন।

ইহার ভাবার্থ—

রূপরসাদি আমাদিগের যত কিছু জাগতিক ভোগ্যবস্তু আছে সকলই চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে

আহরণ অর্থাৎ আমাদিগের আহারের (ভোগের) বিষয় করা হয়। বিষয় সকলকে যাহার যাহার ইন্দ্রিয়াগ্নিতে আহুতি প্রদান করার তাৎপর্য্য,—বিষয় বাসনার বিনাশ সাধন করা। এইরূপ যেখানে কর্ম্মে ত্যাগ লক্ষিত হয় তাহাই যজ্ঞ। যজ্ঞবিষয়ে ব্রাহ্মণসংহিতা যুগের ভাবধারা এখানে এক সুস্পষ্টরূপে পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করিয়াছে।

এইক্ষণ দেখা যাউক, গীতাশাস্ত্রে ঘোর ঋষির উক্তির কিরূপ প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই ঋষি সমগ্র মানব জীবনকে এক যজ্ঞরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, এই যজ্ঞের দক্ষিণা "তপোদানমার্জ্জবমহিংসা সত্য-বচনম্" তপস্যা, দান, সরলতা, অহিংসা ও সত্যভাষণ। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের ২য় চরণ ও দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম চরণে বলা হইয়াছে,—

"দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্"
"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্"

শিষ্য কৃষ্ণের প্রতি ঋষির শেষ উপদেশ

"অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি।"

মৃত্যুকালে আমি অক্ষিত, আমি অচ্যুত, আমি প্রাণের সূক্ষ্মতম তত্ত্ব অর্থাৎ তিনি যেই আমিও সেই, এই চিন্তা করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলে যে ফল হয়, দুইটি ঋঙ্মন্ত্র দ্বারা তাহা বুঝাইয়াছেন।

মন্ত্র দুইটির ভাবার্থ ;—

অন্ধকারের অতীত, দেবতাগণের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিশীল, সেই সূর্য্যকে সম্যক্ দর্শনপূর্ব্বক তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে চিরন্তন বীজের উৎকৃষ্টতম জ্যোতিঃ, আমরা তাহা দেখিয়াছি এবং সেই উত্তম জ্যোতিঃকে অর্থাৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

গীতায় অষ্টম অধ্যায়ের ৫ম ও ৮ম শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন,—

"অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" (৫)
"অভ্যাস যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥" (৮)

অভ্যাসরূপ যোগ অর্থাৎ সাধনা দ্বারা যে চিত্তের চিন্তাপ্রবাহ অনন্যগামী হইয়াছে, সেই সমাহিত-চিত্তে সেই দিব্য পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাতেই লীন হয়।

পরবর্ত্তী শ্লোকে সেই পরম পুরুষের বর্ণনা রহিয়াছে,—ইহার শেষ চরণ—

"সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

তিনি সকলের বিধাতা, চিন্তার অগোচর, আদিত্যবর্ণ (স্বপ্রকাশ) অন্ধকারের অতীত।

এখানে ঘোর ঋষির উক্তির সহিত যোগমার্গানুযায়ী সাধন সংযোজিত হইয়াছে, এই যাহা প্রভেদ।

কিন্তু যাহা পাঠকমাত্রেরই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া যায় না তাহা—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিংপ্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥
ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। ২ অ, ৪২—৪৫

বেদের অর্থবাদ লইয়া যাঁহারা রত, অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক যজ্ঞাদি বিষয় কথনশীল ব্যক্তি, এই সকলের বহির্ভূত ঈশ্বর-তত্ত্ব বলিয়া আর কিছু নাই—এরূপ বলেন; এবং কামাকুলিতচিত্ত ও

স্বর্গপরায়ণ ব্যক্তিদের জন্ম-কর্ম্ম-ফলপ্রদ এবং ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির লালসা-সম্ভূত আপাত-রমণীয় ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলিয়া থাকেন। তাহা দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত, সুতরাং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের প্রতি যাহাদের মন অভিনিবিষ্ট, ঈশ্বরাভিমুখত্বরূপ সমাধি সম্বন্ধে তাঁহাদের বিষয়াত্মিকা বুদ্ধি জন্মে না অর্থাৎ সেই বিবেকহীন মূঢ় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।

এখানেও উত্তরকালের ক্রিয়াবহুল বৈদিক যজ্ঞাদির উপর কটাক্ষপাত রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই চারিটি শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা গীতাশাস্ত্রে প্রবেশ পথে সতর্কবাণী স্বরূপ। এই শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ কি তাহা বুঝিতে হইলে ইহাকে স্মরণপথে রাখা প্রয়োজন, এবং ভারতীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিকাশ রাজ্যে গীতা শাস্ত্রের স্থান কোথায় তাহা জানাও প্রয়োজন।

বৈদিক দেবোপাসনা প্রধানতঃ প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের উপাসনা, কিন্তু সেই প্রাচীন যুগেই কোন কোন ঋষি এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির অন্তরালে এক নিয়ামক শক্তি যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলেন। সে শক্তি বহির্জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত রহিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ধারণা ছিল। তাঁহারা জীব ও জগতের মধ্যে সেই দেবতার অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তিনি যে কেবল সর্বগত তাহা নহেন, পরন্তু সকল শক্তির নিয়ামক এক অন্তর্যামী পুরুষও বটেন তাহাও জানিতে পারিয়াছিলেন।

সৃষ্টি মাত্রই সীমাবদ্ধ, খণ্ডশঃ আকারে তাহার প্রকাশ; যদি তাহাতেই আবদ্ধ থাকে তবে সেই অন্তর্যামী পুরুষও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। বৈদিক যুগেই ঋষিদিগের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদিগের সময়ে ইহার সমাধান হয় নাই, তাই ঋষি আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, মানুষের অন্তঃকরণ তাঁহাকে জানিবার ক্ষমতা রাখে না। (১)

---

(১) ঋগ্বেদ—১০-৮২-৭

ব্রাহ্মণ্য যুগে যখন একমাত্র যজ্ঞই ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে পশুবধের প্রাবল্য ঘটিতে লাগিল, তখন এক শ্রেণীর চিন্তাশীল মনিষী লৌকিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে বীতস্পৃহ হইয়া এই জটিল প্রশ্নের সমাধানে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা এক অক্ষর-তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। এই অক্ষর-তত্ত্ব আধ্যাত্মিক জগতে আরণ্যক ও উপনিষদ যুগের ঋষিদিগের এক অপূর্ব দান। বৈদিক ঋষিগণ যাঁহাকে সর্বগত ও অন্তর্যামী, সুতরাং জীব ও জগতে সীমাবদ্ধ বস্তুরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, উপনিষদের ঋষি জানিতে পারিলেন, তিনি জীব ও জগতের অতীত এক অখণ্ড পরম বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সর্বগতত্ব, সর্বান্তর্যামীত্ব এবং সর্বাতীতত্ব, একাধারে যুগপৎ এই তিন অবস্থা নিয়ে তিনি অক্ষর পুরুষ। ইহা বেদ ও বেদান্ত বা উপনিষদ যুগের ঋষিদিগের চিন্তাধারার মধ্যে এক বিপুল বিপর্য্যয়ের পার্থক্য সূচনা করে; তথাপি ইহাতে চিন্তাধারার মূল সূত্র ব্যাহত হয় নাই। ঋষিগণ যাহাকে জগতের সঙ্গে অভিন্ন-রূপে গ্রহণ করিয়া ভৌতিক পদার্থের সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বেদান্ত তাঁহাকে প্রধানতঃ জগৎ হইতে ভিন্নরূপে দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে বেদের সর্বগত ও সর্বান্তরভাবক বস্তুকে অতিক্রমপূর্বক সেই অক্ষর পুরুষের সর্বাতীত অবস্থাই উপনিষদ যুগের ঋষিদিগের অধিকতর চিন্তার বিষয় হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক যুগের বাহ্যিক নানা উপচার সহকারে দেবপূজা ও দেবারাধনার পরিবর্ত্তে ধ্যান ও যোগমার্গ অবলম্বনক্রমে সেই পরম বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ হইল পরম পুরুষার্থ।

বাহিরে প্রকৃতিরাজ্যের মধ্যে খণ্ডশঃ আকারে প্রকাশিত দেব-শক্তির চিন্তনের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যাহা কিছু জাগতিক সকলই ক্রমে অন্তশ্চক্ষুর নিকট হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল, এমন কি জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ আসিল। জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন নিয়ে অক্ষর-তত্ত্ব। কোন কোন ঋষি প্রচার করিলেন, জগতের বাস্তব

কোন সত্তা নাই। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যত কিছু ধারণা সকলের মূলে রহিয়াছে অজ্ঞানতা। যতদিন অজ্ঞানতা রহিয়াছে ততদিনই জগতের অস্তিত্ব। এখন প্রশ্ন আসে, এই অজ্ঞানতা কাহার? জগৎ বিষয়-অচিৎধর্ম্মী, জীব বিষয়ী-চিৎধর্ম্মসম্পন্ন, সুতরাং বিষয়ী বা জীবের সম্পর্কে এই অজ্ঞানতা; এবং এইজন্য অলীক বিষয়রাজ্য বাস্তব সত্তারূপে প্রতিভাত হয়।

অক্ষর-তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার জন্য বৈদান্তিক আচার্য্যগণ তিনটি পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে প্রস্থানত্রয় বলা হয়। "শ্রুতি প্রস্থান", "ন্যায় প্রস্থান" ও "স্মৃতি প্রস্থান"। বেদ ও বেদান্ত বা উপনিষদকে শ্রুতি বলে। শুক্ল যজুর্বেদের শতপথ ব্রাহ্মণে (১৪।৫।৪২) ইহাদিগকে ব্রহ্মের নিশ্বাস বলা হইয়াছে। (১) বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।১০) এই মন্ত্রটি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহারা ব্রহ্মের নিঃশ্বাস (যস্য নিঃশ্বসিতং বেদাঃ—সায়ন)। সুতরাং অপৌরুষেয়। শ্রুতির উপনিষদভাগের অধিকৃত বিষয় **ব্রহ্মবাদ**, এইজন্য ইহাদিগকে "শ্রুতি প্রস্থান" বলে।

গীতাশাস্ত্রকে ব্রহ্মবিদ্যোপনিষদ বলা হয়। যে সকল প্রাচীন ও প্রামাণ্য উপনিষদ আছে, প্রধানতঃ ইহাদের সার সঙ্কলনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণমুখে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশচ্ছলে ব্যাস কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা পৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষ বা ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক রচিত গ্রন্থ। এইজন্য ইহা স্মৃতি। ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ইহা "স্মৃতি প্রস্থান"। ব্রহ্মসূত্র তৃতীয় প্রস্থান, ইহাকে ন্যায় বা তর্ক প্রস্থান বলা হয়। এই গ্রন্থ শ্রুতিবাক্য-সহায়ক বিচার ও তর্কপ্রধান।

(১) "এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতৎ খলু ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাস—পুরাণং বিদ্যোপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবেতানি নিশ্বসিতানি।"

পুরাণ ইতিহাস বলিতে বর্ত্তমানে যে সকল গ্রন্থ বুঝায়, এখানে তাহা নহে। এই সকল বহু পরবর্ত্তীকালের রচিত গ্রন্থ।

শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ, ঋষিদিগের দৃষ্ট অবিসম্বাদী সত্য বচন। ইহাদিগের সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক বা বিচারের অবকাশ নাই। কিন্তু দেখা যায় একই বিষয় বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন প্রকারে ব্যবহৃত হইয়াছে। যুক্তি ও বিচার দ্বারা ন্যায় প্রস্থানে ইহাদের সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে এবং ইহাদের সত্যতা নিরূপণ করা হইয়াছে।

"স্মৃতি প্রস্থান" গীতা ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনশাস্ত্র। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ প্রয়াসী সাধকের পক্ষে কি কি উপায় অবলম্বন প্রয়োজন, বিশদভাবে তাহার বর্ণনা আছে। দৈনিক জীবনযাপনের চিন্তা ও কর্ম্মসকলকে কিরূপে নিয়মিত করিতে পারিলে মানবজীবনের পূর্ণ সার্থকতা লাভ হয় এই গ্রন্থে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

শ্রুতি ও স্মৃতির প্রতিপাদ্য বিষয় যুক্তি তর্কের সাহায্যে ব্রহ্মসূত্রে আলোচিত হইয়াছে। প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে গীতার বিশেষত্ব এই যে, উপনিষদগুলির সঙ্গে ইহার যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে, ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গেও তদ্রূপ ঘনিষ্ঠ যোগ রহিয়াছে; সুতরাং ভারতীয় আর্য্য দিগের আধ্যাত্মিক জ্ঞানবিকাশের পক্ষে গীতাশাস্ত্র এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহার প্রশংসায় যে বলা হইয়াছে,—

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥"

ইহা অতিরঞ্জিত বর্ণনা নহে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

অধ্যায় সার সংগ্রহ

গীতা শাস্ত্র অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ; ইহাদিগের সার মর্ম্ম ;—

উষরভূমিতে বীজবপনের ন্যায় অকর্ষিতচিত্তে গভীর তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান বৃথা প্রয়াস। সেজন্য গ্রন্থের আরম্ভে শিক্ষার্থীকে (অর্জ্জুনকে) এমন এক অবস্থার সম্মুখীন্ করা হইয়াছে, যাহাতে তাঁহার হৃদয়ে গভীর বৈরাগ্যভাব উদিত না হইয়াই পারে না।

মনস্তত্ত্বের এরূপ আর একটী দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত মিলে কিনা সন্দেহ।

প্রথম অধ্যায়ে এইরূপে অর্জ্জুনের চিত্তে নির্বেদভাব জাগ্রত করিয়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহার নিকট নিত্যানিত্য বিবেক সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। এই উপদেশ হইতে চিত্তে সংসার বিমুখিতা আসিবার সম্ভাবনাই বেশী, এবং দেখাও যায় উপনিষদ্ যুগ হইতেই সমাজে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিব্রত বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল। গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপনান্তে অনেক শিষ্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য প্রয়াসী হইতেন। সমাজের পক্ষে ইহা অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই গতি প্রতিরোধ জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগের অবতারণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপদিষ্ট বিষয়ের নাম সাংখ্য যোগ। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, সাংখ্য ও কর্ম্ম দৃষ্টতঃ দুইটী স্বতন্ত্র পন্থা হইলেও মূলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

কর্ম্ম করা লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা হইতে কোনরূপেই নিস্তার নাই। কর্ম্ম করিতেই হইবে অথচ কর্ম্ম হইতে বন্ধন। যাহাতে এই বন্ধনের সৃষ্টি না হয় কর্ম্মের সেই কৌশল জানা প্রয়োজন,

পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এই তত্ত্বের আলোচনা রহিয়াছে। ইহার নাম জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগ। নানাদিক হইতে এই অধ্যায়ে কর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কর্ম্ম যখন মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, কর্ম্মের কৌশল কি, কর্ম্ম কি অবস্থায় অকর্ম্ম হয়, কখন বিকর্ম্ম হয়, এই তত্ত্বের বিশদ্ ব্যাখ্যা দ্বারা কর্ম্মকৌশল কি তাহা বলা হইয়াছে।

উপনিষদ্‌গুলিতে কর্ম্মবহুল সকাম যজ্ঞ সকলের যে সকল আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখা যায়, এই অধ্যায়ে সে সকল তত্ত্বের অপূর্ব বিশ্লেষণ রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে আর একটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, যিনি যে ভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করেন ভগবান্ সেই ভাবেই তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ (১১)

সকল ধর্ম্মের মধ্যেই যে কোন না কোন ভাবে সত্য নিহিত রহিয়াছে, সকল পথেরই যে গন্তব্য স্থান এক, এখানে তাহা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

সেই সুদূর অতীতে সর্বধর্ম্মের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় ভারতীয় আর্য্যদিগের আধ্যাত্মিক সম্পদের অপূর্ব নিদর্শন।

কর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিতে গিয়া এই অধ্যায়ে ইহাকে পঞ্চবিধ যজ্ঞরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, যথা :—

(১) দ্রব্যযজ্ঞ অর্থাৎ দান

(২) তপোযজ্ঞ—উপাসনাদি কৃচ্ছ্র সাধন

(৩) যোগযজ্ঞ—আসক্তি ও ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান

(৪) স্বাধ্যায় যজ্ঞ—যথাবিধি বেদপাঠ

(৫) জ্ঞানযজ্ঞ—শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞান।

এই সকল নানা উপায়ে জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের অবতারণা করিয়া

দেখান হইয়াছে, নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হইলে এই উভয় সাধনা দ্বারা একই লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারা যায়। ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্তি অর্থাৎ ব্রহ্মে নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভই উভয়বিধ সাধনার লক্ষ্য।

যাহাদিগের পাপ ক্ষীণ হইয়াছে, সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, আত্মা সংযত হইয়াছে, সেই সকল সম্যক্‌দর্শীগণ এই অবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

কর্ম্মযোগী আত্মশুদ্ধির জন্য কায়-মন-বুদ্ধি এবং কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়যোগে আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া (অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মেতে সমুদয় কর্ম্ম অর্পণ করিয়া) কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিশুদ্ধ সত্ত্ব হন। তখন তাঁহার দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি যাহা কিছু কর্ম্ম তৎসমস্তই তদ্‌তদ্ বিষয় গ্রাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, নিজে কিছু করেন না, স্বয়ং অকর্ত্তা এরূপ জানিতে পারিয়া সর্ব্বভূতের আত্মভূত হইয়া যান এবং কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না।

সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে। (৭)

সন্ন্যাস বা জ্ঞানযজ্ঞ দ্বারা আত্মার অজ্ঞান বিনষ্ট হয়; তখন তাহাদিগের আদিত্যবৎ জ্ঞান পরমজ্ঞানকে প্রকাশ করে। "তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্" (১৬)। এই অবস্থায় তিনিই তাঁহাদিগের বুদ্ধি, তিনিই তাঁহাদিগের আত্মা, তিনিই তাঁহাদিগের পরম আশ্রয় হইয়া যান। জ্ঞানাগ্নিতে তাহাদিগের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। সাধক যখন এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহার চিত্ত হইতে সর্বপ্রকার বৈষম্যভাব বিদূরিত হইয়া তিনি ঈশ্বরের ন্যায় সমদর্শী হন এবং বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি গো, হস্তি, কুক্কুর ইত্যাদি পশুগুলিকে পর্য্যন্ত সমদৃষ্টিতে দেখেন। সন্ন্যাস অর্থাৎ একমাত্র আত্মনিষ্ঠা এই সকল বৈষম্যভাব বিনিবৃত্তির উপায়, সেজন্য এই অধ্যায়ের নাম সন্ন্যাস যোগ। কিন্তু এই সাধন বড়ই কষ্টসাধ্য,

কর্ম্মযোগের পথ অপেক্ষাকৃত সহজ। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানপরায়ণ মননশীল ব্যক্তির আত্মা বিশুদ্ধ হয়। আত্মা বিশুদ্ধ হইলে সহজেই সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও ইন্দ্রিয়গণও বশীভূত হইয়া পড়ে। সাধকের পক্ষে কর্ম্মযোগ যে অপেক্ষাকৃত সহজপন্থা এই অধ্যায়ে তাহা ইঙ্গিত করিয়া পরবর্ত্তী ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যানযোগের অবতারণা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে, কর্ম্মের ফলতৃষ্ণা পরিশূন্য হইয়া যিনি কর্ম্ম করেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী।

এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে যোগ ও তাহার ফলের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ অপেক্ষাকৃত সহজে নিবৃত্ত হয়, সুতরাং ধ্যানযোগে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগ অবশ্য পালনীয়।

তৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে চিত্তে যত কিছু বিক্ষোভের উৎপত্তি, এই বিক্ষোভ বিদূরিত হইয়া চিত্ত যখন প্রশান্ত হয় তখন তাহা সাধকের যোগারূঢ়াবস্থা।

যোগসাধনের নিয়ম ও প্রক্রিয়ার সবিস্তার বর্ণনান্তর এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, যোগাভ্যাসে সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। পরন্তু যোগারূঢ় ব্যক্তির অপরোক্ষ ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে এবং তাহার বলে তিনি সর্বান্তর্যামী ভগবানকে সর্বত্র দর্শন করেন ও তাঁহার মধ্যে সমুদয় দর্শন করেন। ভগবান্ তাঁহার নিকট কখনও অদর্শন হন না।

মন স্বভাবতঃ বড় চঞ্চল, ইহাকে বশীভূত করা সুকঠিন হইলেও একেবারে অসম্ভব নহে, অভ্যাস ও বৈরাগ্যসাধন দ্বারা ইহাকে বশে আনিতে পারা যায়। এ সকল পুরুষকার সাপেক্ষ। কঠোর তপশ্চরণ ও কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা এ অবস্থা লাভ হইতে পারে। পাছে ইহা ভগবদ্‌ভাব বিবর্জ্জিত হয় এই আশঙ্কা করিয়া অধ্যায়ের উপসংহারে বলা হইয়াছে, ভগবানে চিত্ত সমাধান করতঃ শ্রদ্ধাবান্

হইয়া যে ব্যক্তি নিয়ত তাঁহার ভজনা করেন, যোগযুক্তগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ এবং তৎপরবর্ত্তী চারি অধ্যায়ে আত্মজ্ঞান সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ সাধনার উপায় সকলের বর্ণনা রহিয়াছে। জন্মান্তর পরিগ্রহ হইতে মুক্তিলাভ, সাধনার লক্ষ্য হইলেও সঙ্গে সঙ্গে সর্বান্তর্যামী পরমপুরুষের সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজনাদিতে নিমগ্ন থাকাই পরম পুরুষার্থ; কিন্তু তাঁহাকে জানিতে না পারা পর্য্যন্ত তাঁহার ভজন সম্ভবপর নহে। সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত সেই পরমপ্রাপ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ, জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ এবং তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা দ্বারা জীবের পক্ষে তাঁহাকে লাভ করিবার উপায়রূপ জ্ঞানমিশ্র ভক্তি পদবাচ্য তাঁহার উপাসনা কথিত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়ের নাম বিজ্ঞান যোগ—ইহাতে পরমাত্মার সর্বাত্মকতা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতি-বিশেষণ দ্বারা পরমাত্মার সর্বকারণত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। "চতুর্বিধ সুকৃত লোক আমার ভজনা করে, ইহারা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী আমার আত্মা" (অষ্টাদশ শ্লোক); এবং "যে সকল ভক্ত আমাকে জানে তাহারা মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়" (চতুর্দ্দশ শ্লোক); এই দুই উক্তি দ্বারা অধিকারভেদে উত্তম অধিকারীসাধক অর্থাৎ জ্ঞানী ভক্তের জ্ঞেয় ব্রহ্ম এবং অপর সকল শ্রেণীর ভক্তের ধ্যেয় (অর্থাৎ সোপাধিক ঈশ্বর পদবাচ্য) ব্রহ্ম মুখ্য ও লক্ষণাদিযোগে নিরূপিত হইয়াছে।

উপসংহারে অধ্যায়ের শেষ দুই শ্লোকে তিনি নিজকে অধিভূত অধিদৈব ও অধিযজ্ঞরূপে অভিহিত করিয়া জরা-মরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য যাঁহারা তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্যশীল হন তাঁহারাই সেই ব্রহ্মকে জানেন, আত্মতত্ত্ব জানেন, সমুদয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানেন এইরূপ উক্তির পর অক্ষরতত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

পূর্ব অধ্যায়ের উপসংহারে যে ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্ব, অধিভূতাদি বিশেষণ দ্বারা অন্তর্যামী পুরুষ নিজকে বিশেষিত করিয়াছেন, পরবর্ত্তী অষ্টম অধ্যায়ের আরম্ভে শিষ্য (অর্জ্জুন মুখে) ; সেই ব্রহ্মইবা কি, সেই আত্মতত্ত্বইবা কি, সেই অধিভূতইবা কি, অধিদৈবইবা কি এবং কিরূপে তিনি অধিযজ্ঞরূপে দেহে অধিষ্ঠিত থাকেন, এবং অন্তিমকালে কিরূপে মনুষ্যগণ তাঁহাকে জানিতে পারে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া উপনিষদ যাঁহাকে অক্ষর পুরুষ নামে অভিহিত করিয়াছেন সেই তত্ত্বের অবতারণা করা হইয়াছে। অধ্যায়ের নাম তারকব্রহ্ম যোগ।

এই সাতটী প্রশ্নের উত্তরে যাহা কিছু মানবের জ্ঞাতব্য সেই সমগ্র অক্ষরতত্ত্ব ও ইঁহার উপাসনাপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে।

যিনি পরম অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার বিনাশ নাই তিনি অক্ষর, পরমাত্মা যিনি তিনি ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের যে অংশ জীবরূপে দেহ অধিকার করিয়া আছে তাহাকে অধ্যাত্ম বলা যায়। স্বভাব আত্মতত্ত্ব ; স্বভাব—আপনার ভাব বা স্বরূপ, তিনি প্রকৃতির সহিত সংসর্গবশে দেহে ভোক্তৃরূপে প্রকাশিত হন। কর্ম্ম—দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি ক্রিয়া দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধিত হইয়া যদ্দারা স্বভাব প্রাপ্তি ঘটে তাহা কর্ম্ম।

যাহা উৎপত্তি ও বিনাশের অধীন তাহা অধিভূত। প্রাণীসমূহকে আশ্রয় করিয়াই যত কিছু জন্ম ও বিনাশলীলা, এজন্য ইহারা অধিভূত। পুরুষ অর্থাৎ এই সমষ্টি বিরাটকে লইয়া যিনি অবস্থিত তিনি অধিদৈব ; আদিত্যাদি দেবগণকে লইয়া ইনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের অনুগ্রাহক হন, সেইজন্য তিনি অধিদৈবত। ইহার ভাবর্থ,—চক্ষুকর্ণাদি আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রত্যেকেরই এক একজন ভিন্ন ভিন্ন অনুগ্রাহক দেবতা রহিয়াছেন, যথা—চক্ষুর দেবতা সূর্য্য, ত্বকের দেবতা বায়ু। সূর্য্যের অনুগ্রহ অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক প্রকাশ না হইলে চক্ষুর দর্শনশক্তি হয় না সেইরূপ বায়ুর অনুগ্রহ লাভ না হইলে অর্থাৎ বায়ু প্রবাহিত না হইলে ত্বকের

স্পর্শানুভব শক্তি হয় না। যিনি অধিদৈব তিনিই আদিত্যাদি দেবগণসমন্বিত হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত করেন—সেজন্য তিনি অধিদৈবত।

অধিযজ্ঞ—বেদে বিষ্ণুকে যজ্ঞের গর্ভ বলা হইয়াছে, শতপথ ব্রাহ্মণে যজ্ঞই বিষ্ণু এরূপ বলা হইয়াছে (১ম-৯-৩-৯), ছান্দোগ্য উপনিষদে সমগ্র মানবজীবনটাই একটা যজ্ঞ এরূপ উল্লেখ আছে, মনুষ্য দেহে যে দেবতা অবস্থান করতঃ যজ্ঞাদির সহায় হন, তিনি অধিযজ্ঞ। তিনি পরমপুরুষ পদবাচ্য, সেই পুরুষ কবি, পুরাণ, শাস্তা, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম, সকলের ধাতা, অচিন্ত্যরূপ, আদিত্যবর্ণ ও অন্ধকারের অতীত। অন্ধকার শব্দ দ্বারা এখানে অব্যক্ত প্রধান বা প্রকৃতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শাস্তা অর্থাৎ সেই প্রকৃতির নিয়ন্তা, ধাতা অর্থাৎ ধারণ ও পোষণকর্ত্তা।

"তমসঃ পরস্তাৎ" এই বিশেষণের তাৎপর্য্য এই যে, সেই পুরুষ সপ্রপঞ্চ প্রকৃতিকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া অথচ তাহার অতীত হইয়া, তদুপরি বিদ্যমান রহিয়াছেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে ওঙ্কার তত্ত্বের যে বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ ও তুরীয় এই চতুর্বিধ অবস্থার বর্ণনা আছে এস্থলে তাহারই অনুসরণ করা হইয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্‌গণ ওঙ্কারকে অক্ষর বলেন। অন্তকালে যোগধারণা দ্বারা ওঁ এই অক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণসহ সমাহিতচিত্তযোগে অর্থাৎ অনন্যগামী চিত্তযোগে সেই পরম পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সাধনার উপায় ;—প্রথমতঃ যোগবলে ভ্রূমধ্যে প্রাণকে সম্যকরূপে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, তদন্তর ইন্দ্রিয়দ্বারগুলিকে বিষয় হইতে আকর্ষণ এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া নিজের প্রাণকে মূর্দ্ধদেশে আনয়নপূর্বক যোগধারণা অবলম্বন করিতে হইবে, তদনন্তর ভগবানকে স্মরণপূর্বক ওঁ এই একাক্ষরব্রহ্ম উচ্চারণ করিতে

করিতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় তাহার পরম গতি লাভ হয়।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।*

* মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ওঁ এই একাক্ষর মন্ত্র সাধনার কৌশল এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

মুণ্ডক—

ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধীয়ীত।
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্যবিদ্ধি   ২মু ২য় খণ্ড ৩য় শ্লোক

উপনিষৎ সম্ভূত ধনু গ্রহণ পূর্বক উপাসনাযোগে শাণিত শর সন্ধান করিবে। হে সৌম্য! ব্রহ্মে তদ্ভাবগত চিত্ত দ্বারা সেই ধনু আকর্ষণ করতঃ লক্ষ্যরূপ সেই ব্রহ্মকে বিদ্ধ কর।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥   ঐ ৪ শ্লোক

প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার ধনু, আত্মা শর, ব্রহ্ম লক্ষ্য। একাগ্র চিত্ত হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে; শরের ন্যায় তন্ময় হইয়া যাইবে, অর্থাৎ শর যেমন লক্ষ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায় তদ্রূপ সাধককে ব্রহ্মে মগ্ন হইতে হইবে।

শ্বেতাশ্বতর—

স্ব দেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্
ধ্যান নির্ম্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥

নিজ দেহকে অরণি এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া ধ্যানরূপ ঘর্ষণ-অভ্যাস দ্বারা সাধক দেব অর্থাৎ ঈশ্বরকে নিগূঢ়বৎ (অগ্নিবৎ) দর্শন করিবেন।

অরুণি অর্থ যজ্ঞকালে ব্যবহৃত কাষ্ঠবিশেষ। সে কালে দুইটী অরণি কাষ্ঠের ঘর্ষণ দ্বারা যজ্ঞকালে অগ্নি উৎপাদন করিতে হইত। কাষ্ঠে অগ্নি সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, কাষ্ঠমধ্যে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু দুইটী অরুণির পরস্পর ঘর্ষণযোগে ইহাকে দেখিতে হয়, সেইরূপ ওঙ্কার মন্ত্রোচ্চারণ সাধন যোগে দেহকে মন্থন বা ঘর্ষণ দ্বারা দেহে আত্মার উপলব্ধি হয়।

নবম অধ্যায়ে সবিজ্ঞান জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ইহাকে গুহ্যতম রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ অর্থাৎ সমুদয় বিদ্যা ও সমুদয় রহস্যের রাজারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। উপনিষদ্ যোগে দেখা যায় ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মধ্যে এই বিদ্যার বিশেষ আলোচনা ছিল, ঋষিপুত্রগণ শিক্ষার জন্য গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই সকল রাজর্ষির নিকট এই বিদ্যালাভের জন্য আগমন করিতেন। এ প্রসঙ্গে কাশীর রাজা অজাতশত্রু প্রবাহন ও মিথিলার রাজা জনকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেজন্য ইহাকে রাজগুহ্য বলা হইয়া থাকে।

দেহাদি হইতে নিজকে পৃথকরূপে দেখা গুহ্য, কারণ প্রাকৃতজন অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণলোক তাহা অবগত হইতে পারে না। দেহী স্বয়ং দেহ নহে এই জ্ঞান লাভের পর ভগবানের বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মধ্যে যে জ্ঞানের উদ্‌ভব হয় তাহা গুহ্যতর, তদনন্তর যে সাক্ষাৎ পরমাত্মজ্ঞান তাহা গুহ্যতম। এই তত্ত্বটী ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত মধুবিদ্যাকে অনুসরণ করিতেছে; বস্তুতঃ গীতাগ্রন্থের যাহা কিছু প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহার সারতত্ত্ব সমুদয়ই এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়ে যোগবলে ধ্যেয় ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা ধ্যাননিষ্ঠ সাধকের দেহত্যাগের পর যে গতি হয় তাহা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সবিজ্ঞান ব্রহ্ম নিরূপণ দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠের গতি উক্ত হইয়াছে। তিনি অক্ষর পুরুষ, অব্যক্ত মূর্ত্তিতে সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, সমুদয় ভূত তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে, তিনি ভূতগণেতে স্থিতি করিতেছেন না, ইহার পরেই আবার বলা হইয়াছে, ভূতগণ তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে না। আপাতঃ দৃষ্টিতে এক সঙ্গে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার স্থিতি, ইহা তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ। তিনি ভূতগণকে ধারণ করেন, অথচ ভূতসংযুক্ত নহেন। বায়ু যেমন নিত্য আকাশস্থিত, ভূতসমূহও তাঁহাতে সেইরূপ অবস্থিত। তিনিই ক্রতু,

তিনিই যজ্ঞ, তিনিই স্বর্গ, তিনিই ঔষধ, তিনিই মন্ত্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই হোম। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু সবই তিনি। জগৎব্যাপারে যত কিছু সবই সেই ব্যাপক, ধারক ও নিয়ামক অন্তর্যামীতে অবস্থিত রহিয়াছে; এতদ্‌ব্যতীত জগতের সঙ্গে আরো নিগূঢ় সম্বন্ধ এই যে, তিনি জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, গতি, স্বামী, প্রভু, নিবাস, শরণ, সুহৃদ্‌, স্রষ্টা ও অবিনাশী কারণ। এই সকল সম্বন্ধবশতঃ তিনি সোপাধিক ঈশ্বররূপে জীবের সম্পূজনীয় ও ভজনীয়। উপনিষদে যিনি শ্রবণ মনন ও চিন্তনের বিষয়রূপ পরমাত্মা—এখানে তিনি উপাসকের নিকট পরম সুহৃদ ও পরমাশ্রয় ভগবান্‌। সম্বন্ধ আরো ঘনিষ্ঠ ও মধুর, তিনি পরম কারুণিক আশ্রিতবৎসল এবং তাঁহার নিরন্তর অনন্যচিন্ত্যভক্তের যোগক্ষেম বহনকারী ভৃত্য। জননী যেমন শিশু সন্তানের যখন যাহা প্রয়োজন অনুক্ষণ তাহার ব্যবস্থায় ব্যাপৃতা থাকেন, তিনিও অনুক্ষণ তাঁহার অনন্যচিন্ত্যভক্ত উপাসকের যখন যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করেন। তিনি চির ক্ষমাশীল, সকল ভূতের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁহার দ্বেষ্য কেহ নাই। স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি জাতিবর্ণনির্বিশেষে তাঁহাকে আশ্রয় করিলে সকলেরই উত্তম গতি হয়; এমন কি নিতান্ত দুরাচার ব্যক্তিও তাঁহার ভজনপরায়ণ হইলে ত্বরায় সদাচারনিষ্ঠ হইয়া নিত্য শান্তি লাভ করে। পাপাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া সদ্‌গতি লাভ ভগবৎ-কৃপাসাপেক্ষ। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া তাই বলিতেছেন,—

"হে কৌন্তেয়! জনসমাজে তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বল, আমার ভক্ত বিনাশ পায় না।"

অধ্যায় সমাপ্তিতে বলা হইয়াছে—

"মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।"

এখানে গীতার সাধনা ও সিদ্ধির এক প্রকার শেষ কথা বলা হইল ; গ্রন্থের উপসংহারেও "সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ" এই বলিয়া পূর্বোক্ত শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।

দশম অধ্যায়ের নাম বিভূতি যোগ ;—অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে ভগবানের দিব্য বিভূতিসকলের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন, তিনি সর্বভূতের অন্তঃকরণে আত্মা হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, তিনিই ভূতগণের আদি, মধ্য ও অন্ত ; চরাচর যাহা কিছু সকল ভূতের তিনিই বীজ, তাঁহার দিব্য বিভূতিনিচয়ের অন্ত নাই, মানবের পক্ষে এ সকল জানার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই। অব্যক্ত মূর্ত্তিতে তিনি সমূদয়জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনিই একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

এই সকল নানাবিধ বিভূতির উপদেশ দ্বারা অন্তর্যামী হৃদয়স্থ ঈশ্বর যে জ্ঞেয় ও ধ্যেয়রূপে উপাস্য, এখানে এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। "একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" এই উক্তি দ্বারা যে শক্তিপ্রভাবে এই প্রপঞ্চাত্মক বিভূতি-সকলের প্রকাশ, সে শক্তির চিন্তনরূপ সগুণ ধ্যান কথিত হইয়াছে। "একাংশ" এই উক্তি দ্বারা অপরাংশও সূচিত হইতেছে। ইহা ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তের একটী মন্ত্রের ("ইহার অপর ত্রিপাদ দিব্য-ধামে") পুনরাবৃত্তি। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম যে জ্ঞেয়রূপে উপাস্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের সাধক ধ্যানযোগে প্রপঞ্চাতীতনির্বিশেষ ব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন এই তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব অধ্যায়ে "আমিই একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি" ইহা দ্বারা তাঁহার বিরাট রূপের সূচনা করিয়া একাদশ অধ্যায়ে তিনি যে সর্বাধার ভগবান্ তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য বিশ্বরূপ যে তাঁহারই রূপ তাহা বলা হইয়াছে এবং জাগতিক যাহা কিছু তৎসমুদয়ের তাঁহাতে এক সঙ্গে প্রকাশ ও এক সঙ্গে সকলের লয় প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাও ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের

৮১ সূক্তের ৩য় মন্ত্র—"সর্বত্র যাঁহার চক্ষু, সর্বত্র যাঁহার মুখ, সর্বত্র যাঁহার বাহু, সর্বত্র যাঁহার পাদ, সেই একমাত্র দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া (মনুষ্যের) বাহু ও (পক্ষী আদির) পক্ষ সংযোগ করেন।*

দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া দশম অধ্যায় পর্য্যন্ত তত্ত্বতঃ সমুদয় উপাধি বিবর্জ্জিত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে। একাদশ অধ্যায় সোপাধিক ব্রহ্মোপাসনার বিষয়। সোপাধিক ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম উভয়ই উপাস্যরূপে সিদ্ধ হইতেছেন। এই দুইএর মধ্যে কোন্‌টীর উপাসনা শ্রেয়ঃ দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে অর্জ্জুনমুখে এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া উত্তরে যাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই,—

ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্তি হইতে ভগবানের জ্ঞান ও ভগবদ্দর্শন অপেক্ষাকৃত সহজ লভ্য ;—এজন্য আত্মপ্রাপ্তির সাধন আত্মোপাসনা বা অক্ষর পরব্রহ্ম-উপাসনা হইতে ভক্তিরূপ ভগবানের উপাসনা প্রশস্ততর।

অব্যক্তে (অর্থাৎ অক্ষর পরব্রহ্মে) আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর ক্লেশ হয়, দেহধারীর পক্ষে অব্যক্ত বিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখে লাভ হইয়া থাকে। ৫ম শ্লোক।

অপর পক্ষে ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্য ও পরমশ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ উপায় (২য় শ্লোক)।

৮ম হইতে ১১শ শ্লোকে সাধনার পন্থা এরূপ উক্ত হইয়াছে।

১ম উপায়—সর্বান্তর্যামীতে মন স্থাপন ও বুদ্ধিনিবিষ্ট করা। মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, ইহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিতে না পারিলে তাঁহাতে মন স্থাপন করা যাইতে পারে না। কিন্তু বায়ুকে নিরোধ

---

* বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
সং বাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈর্দ্যাবাভূমী জনয়ন্দেব এক॥

করার ন্যায় মনকে শাসন করা সুদুষ্কর। বুদ্ধির একাগ্রতা লাভ, কঠিন তপস্যা ও যোগসাধন ভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং এই উপায় অবলম্বনে যাঁহারা অসক্ত, তাঁহাদিগের জন্য—

দ্বিতীয় উপায়—অভ্যাসযোগে তাঁহাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করা। মন স্বভাবতঃ বহির্মুখী, পুনঃ পুনঃ যে চেষ্টা দ্বারা ইহাকে সর্বান্তর্যামী পুরুষে স্থাপন করার প্রয়াস তাহা অভ্যাসযোগ; এবং ইহাও সহজসাধ্য নহে। ইহাতেও যাহারা অশক্ত, তাহাদিগের জন্য—

তৃতীয় উপায়—ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্মপরায়ণ হওয়া, অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ক শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে তন্নিষ্ঠভাবে জীবন যাপন করা। এই তন্নিষ্ঠতা অন্তর্যামীর সঙ্গে যোগ সাধনের উপায়। এই যোগাশ্রয়েও যাঁহারা অসমর্থ তাহাদিগের প্রতি উপদেশ—

চতুর্থ উপায়—সংযত ও আত্মবান্ হইয়া সমুদয় কর্ম্মের ফল ত্যাগ করা।

"সর্ব কর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্"

জীবাত্মা উপাসক এবং পরমাত্মা উপাস্য। এযাবৎ যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে তাহাতে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ নিষ্ঠাদ্বারা আত্মার স্বরূপ জ্ঞান যথাযথরূপ উপলব্ধি করতঃ **পরমপ্রাপ্য পরমেশ্বরের** যথার্থ তত্ত্ব ও তাঁহার সর্বৈশ্বর্য্যশালীত্ব এবং মাহাত্ম্যের অনুভূতি দ্বারা আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক ভক্তিযোগ নিষ্ঠা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা পরমাত্ম-জ্ঞানের উপযোগী। এই তত্ত্ব নির্ণয়ান্তর ভগবানের মহিমার উল্লেখ দ্বারা পরমাত্মার ভক্তি নামে আখ্যাত উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে।

যোগ ও জ্ঞান সমন্বিত সেই উপাসনা হইতে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ভগবদ্রূপের উপলব্ধি ও জীবের মুক্তি উভয়ই লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ের বিষয়; এজন্য ইহার নাম ভক্তিযোগ।

গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদ্য যত কিছু বিষয় এই প্রথম দ্বাদশ অধ্যায়ে তাহার সমস্তই বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে আত্মা, পরমাত্মা

ও কর্ম্মাদির বিজ্ঞানমূলক বিশেষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলিকে আরো পরিষ্কার করা হইয়াছে।

আত্মজ্ঞান বিনা সংসার হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। প্রকৃতি, পুরুষ ও আত্মা এই তিনটী তত্ত্বজ্ঞানের মূল। সপ্তম অধ্যায়ে পরা ও অপরা নামে যে প্রকৃতিদ্বয়ের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহাদিগের যথার্থ তত্ত্ব না জানাতে জীব-ভাবাপন্ন পরা প্রকৃতির অর্থাৎ চিদংশের সংসারগতি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের নির্ম্মলতা সাধন উদ্দেশ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ ও আত্মার স্বরূপ, দেহ তত্ত্বতঃ কি তাহা ভালরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে; এবং যে আত্মার স্বরূপ জ্ঞানগোচর হইয়াছে, সেই চিদংশ আত্মার অচিতের সহিত সম্বন্ধের হেতু কি, এই সকল নির্ণয় করিবার জন্য **ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ** তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। এই শরীর ক্ষেত্র এবং শরীরকে জানে বলিয়া জীব ক্ষেত্রজ্ঞ।

জীব স্ব স্ব দেহ সম্বন্ধে যে পরিমিত জ্ঞান লাভ করে তদ্দ্বারা এক জীবের পক্ষে অপর জীবের দেহ সম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্ভবপর নহে; সুতরাং আপনার দেহ সম্বন্ধে ক্ষেত্রজ্ঞ হইলেও সকল ক্ষেত্র সম্বন্ধে জীবকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে না। সকল দেহের জ্ঞান নিয়ন্ত্রিত্ব এক পরমাত্মারই আছে, সুতরাং তিনি সমুদয় ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ক্ষেত্র, ও বৈশেষিক মতের আত্মগুণ যথা,—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, দেহেন্দ্রিয়াদির সংঘাত, চেতনা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সকলই ক্ষেত্রাশ্রিত মনোবৃত্তি, সেজন্য ইহারা সবিকার ক্ষেত্র। ক্ষেত্রে অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে চিত্তনিবেশ করিলে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। অমানিত্বাদি সাধন (৭—১১ শ্লোক) এই আত্মজ্ঞান লাভের উপায়।

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ে পরস্পরের সহিত মিলিত ও অনাদি। অমানিত্বাদি জ্ঞান, ইচ্ছা দ্বেষাদি বিকার ইহারা সকলে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়। পুরুষের সহিত মিলিত এবং ক্ষেত্রাকারে

পরিণত প্রকৃতি নিজের বিকার ইচ্ছা, দ্বেষাদি দ্বারা পুরুষের বন্ধন ঘটায়। পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণ সকলের ভোক্তা হয়. আর এই দেহে যিনি পরমপুরুষরূপে বিরাজ করেন, তিনি পরমাত্মা। অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ হেতু ইনি শরীরে থাকিয়াও কিছু করেন না, কিন্তু তিনি উপদ্রষ্টা অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বররূপে অনুক্ষণ বিরাজমান রহিয়াছেন। উপদ্রষ্টা অর্থাৎ স্বয়ং অব্যাপৃত থাকিয়া নিরতিশয় সমীপবর্ত্তী হইয়া দর্শন করেন, সুতরাং সকল কর্ম্মের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান আছেন। অনুমন্তা—যাহার যে কার্য্য বিধেয় তাহাকে সেই কার্য্যে অনুমোদন করেন, ধীবৃত্তি সকল প্রেরণ করেন। তিনি ভর্ত্তা—সকলের ধারয়িতা, ভোক্তা পালক, মহেশ্বর —সকলের আত্মা।

অধ্যায়ের সারমর্ম্ম ঃ—দেহ মধ্যে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে জীব ও ঈশ্বর উভয়ই রহিয়াছেন। জীব দেহধর্ম্মযুক্ত বিধায় বদ্ধ, যখন সে অমানিত্বাদি গুণ সাধন দ্বারা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক সম্যক্‌জ্ঞান সম্পন্ন হয় তখন তাহার গুণাতীত অবস্থা লাভ হয়, সকল অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং তাহার স্বরূপে অবস্থানরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এইজন্য অধ্যায়ের নাম প্রকৃতি পুরুষ বিবেকযোগ।

পূর্ব অধ্যায়ে জাগতিক যাহা কিছু তৎসমস্তই ক্ষেত্র প্রকৃতি ও ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিরীশ্বর সাংখ্য মতানুযায়ী কিনা এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে এবং এই সন্দেহ নিরসন উদ্দেশ্যে পরবর্ত্তী চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের আরম্ভেই বলা হইয়াছে এই সংযোগ ঈশ্বরাধীন।

"মম যোনির্ম্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দদাম্যহং"

এই যে অপরা প্রকৃতি তাহা ব্রহ্মের যোনি—অর্থাৎ সর্বভূতের অভিব্যক্তি স্থান, ইহাতে তিনি গর্ভ আধান করেন—অর্থাৎ আপন প্রতিবিম্বরূপ পরাপ্রকৃতি জীবকে নিক্ষেপ করেন; ক্ষেত্রসহ

ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোজনা করেন এবং বিষয় বিষয়ী সম্বন্ধ উৎপাদন করেন।

অপিচ ইহাও বলা হইয়াছে যে গুণ সকলের প্রতি আসক্তি সৎ বা অসৎ যোনিতে জন্মের কারণ। এইজন্য অধ্যায়ের নাম গুণত্রয় বিভাগ যোগ। গুণগুলি কি, কোন্ গুণ হইতে কোন্ আসক্তির উৎপত্তি, কিরূপেই বা ইহারা বন্ধনের কারণ হয়, এই সকল বিষয়ের বর্ণনান্তর অবশেষে বলা হইয়াছে যাহারা ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের বিষয় জানে তাহারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ("ভূত প্রকৃতি মোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তিতে পরম্"—ত্রয়োদশ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক) এই ভূতগণের প্রকৃতি কি, কি আশ্রয় করিয়া তাহাদিগের ভূতোৎপাদকত্ব, কিরূপেই বা বন্ধন হেতুত্ব, কিরূপে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়, মুক্ত ব্যক্তির লক্ষণ কি, এই সকল তত্ত্বের সবিস্তার বর্ণনা রহিয়াছে; এবং অধ্যায় পরিসমাপ্তিতে বলা হইয়াছে "অব্যভিচারী ভক্তিযোগে যে আমার সেবা করে, সে ব্যক্তি গুণ সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।

গুণ সকল বন্ধনের কারণ, এবং অনন্যভক্তিযোগ তাহা হইতে মুক্তি লাভের উপায়, কিন্তু বৈরাগ্য আশ্রয় ভিন্ন চিত্তের বিষয়া-শক্তির নিরসন হয় না, এবং আত্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মার স্বরূপানুভূতি ভিন্ন ঈশ্বরাভিমুখীনতাও সম্ভবপর নহে, এজন্য পঞ্চদশ অধ্যায়ে সংসারকে একটী উর্দ্ধমূল বৃক্ষরূপে কল্পনা করিয়া, ইহার স্বরূপ এবং তাহার উচ্ছেদের উপায়রূপ বিজ্ঞান প্রদশিত হইয়াছে।

নিরতিশয় বদ্ধমূল এই অশ্বত্থকে অনাশক্তি রূপ সুদৃঢ় শস্ত্র দ্বারা ছেদন পূর্বক যাহা হইতে এই চিরন্তন সংসার প্রবাহ, সেই আদি পুরুষকে আশ্রয় করিতে হইবে।

ইহলোকে ক্ষর ও অক্ষর এই দুই পুরুষ; ক্ষরণ-স্বভাব অচিৎ সংস্থষ্ট বিষয় সেবায় নিমগ্ন দেহাত্মবুদ্ধি বিশিষ্ট বদ্ধজীব ক্ষর পুরুষ। ইহা প্রকৃতি হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ

করতঃ তৎসহযোগে বিষয় ভোগে নিমগ্ন হয়, এবং এই যে দেহ যাহা ইহাদিগের অধিষ্ঠান ভূমি, তাহা হইতে উৎক্রান্ত হইবার সময় এই সকল ইন্দ্রিয়কে লইয়া যায়। ক্ষরশরীরানপেক্ষী অচিৎসংসর্গ বিনির্ম্মুক্ত স্বরূপে অবস্থিত মুক্তাত্মা অক্ষর পুরুষ। এই উভয় হইতে ভিন্ন তৃতীয় আর একজন আছেন, তিনি পরমাত্মা, যিনি অক্ষরের অতীত।

অচিৎসঙ্গ বিমূঢ় জীবের চিত্ত দেহেতেই সন্নিবিষ্ট। এই সকল লোক পরমাত্মা বিমুখ, সুতরাং তিনি তাহাদিগের অনুভূতির অবিষয় হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি অক্ষর হইতে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থিত মুক্ত পুরুষ হইতেও উত্তম—সেজন্য তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলা হয়। তিনি নির্বিকার ঈশ্বর; লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে পালন করিতেছেন।

এই অধ্যায়ের নাম পুরুষোত্তম যোগ। ইহাতে প্রকৃতি, পুরুষ ও পরম পুরুষ (জগৎ, জীব ও ব্রহ্ম) তত্ত্বের পরিস্ফুট বিশ্লেষণ রহিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্য মতে সমগ্র গীতা শাস্ত্রের মর্ম্ম এই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যামুণাচার্য্য "গীতার্থ সার সংগ্রহ" গ্রন্থে এই অধ্যায়ের এইরূপ তাৎপর্য্য করিয়াছেন।

"আত্মা ব্রহ্মের অংশ, চিৎস্বভাব. স্বরূপে দেহাদি অচিৎ সংস্পৃষ্ট বিবর্জ্জিত, সর্বজ্ঞ, সর্বাত্মক, কার্য্যকারণ বিনির্ম্মুক্ত, সুতরাং প্রপঞ্চাতীত অখণ্ড এক রস ব্রহ্মরূপ আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার মধ্যে তাহার অশেষ পুরুষার্থের পরিসমাপ্তি।"

ষোড়শ অধ্যায়ের নাম দৈবাসুর সম্পত্তি বিভাগ যোগ—

সত্ত্ব রজাদি গুণের তারতম্যানুসারে লোক বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়া থাকে। এই সকল প্রকৃতি ভেদের কারণ হইতেছে পূর্ব

জন্মের কর্ম্মজনিত বাসনা। সেই কর্ম্ম ফলে জীব দৈবী কিম্বা আসুরী সম্পদের অভিমুখীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। দৈবী সম্পদ মোক্ষ, আসুরী সম্পদ বন্ধনের জন্য হয়। আসুরী সম্পদের অভিমুখী হইয়া যাহাদিগের জন্ম হয়, তাহারা এই জগৎকে অসত্য অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বরশূণ্য কামহেতু পরস্পরের সংযোগে উৎপন্ন হয় এরূপ মনে করে। আসুরী প্রকৃতি কাম ক্রোধ ও লোভের অধিষ্ঠান ভূমি। এই তিনটীই আত্মনাশের হেতু—অসদ্‌গতি প্রাপ্তির কারণ। তদনন্তর বলা হইয়াছে কোন্‌টী করণীয় কোন্‌টী অকরণীয় তাহা স্থির করিবার পক্ষে শাস্ত্রই প্রমাণ, সুতরাং শাস্ত্র মতে যে সকল কর্ম্মবিধি আছে তাহাই অনুষ্ঠিতব্য।

অধ্যায়ের মর্ম্ম,—কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি সমুদয় আসুরী সম্পদের মূল, সমুদয় অমঙ্গলের কারণ ও সমুদয় শ্রেয়ের প্রতিবন্ধক জানিয়া ইহাদিগকে যত্ন সহকারে পরিত্যাগপূর্বক শ্রেয়ঃ প্রার্থীকে শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্রোপদিষ্ট বিষয়সকলের অনুষ্ঠানপরায়ণ হইতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়ের নাম শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ—

পূর্বোধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত, সে ব্যক্তি সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, তাহার পরমগতি হয় না। ইহা হইতে বলা হইল স্বেচ্ছাচারিতাই তাহার যত কিছু অনর্থের মূল; কিন্তু এরূপও তো হইতে পারে যে, শাস্ত্রবিধির প্রতি তাহার এই অনাদর স্বেচ্ছাচারিতা মূলক নহে, পরন্তু বৃদ্ধদিগের অনুষ্ঠিত লোকাচারকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া দেবাদির পূজা বিষয়ে ইহা তাহার লোকাচারের সশ্রদ্ধ অন্ধ অনুকরণ। সপ্তদশ অধ্যায়ে এই প্রশ্নের উত্তরে তাহাদিগের এই নিষ্ঠাকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে, স্বভাবজাত যে

শ্রদ্ধা তাহা রজ অথবা তমোময়ী শ্রদ্ধা, ইহাকে পরিত্যাগপূর্বক সত্ত্বময়ী শাস্ত্রজ শ্রদ্ধা আশ্রয় করিলে সাধক শ্রেয়ের অধিকারী হয়। শাস্ত্রানুমোদিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কার্য্যে সত্ত্বময়ী এই শ্রদ্ধা কি তাহা ২৩ হইতে ২৭ শ্লোকে বলা হইয়াছে। ২৩ শ্লোকে **'ওঁ তৎ সৎ'** ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্বদা ব্রহ্মবাদিগণের বিধানোক্ত যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তন হয়।

'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া মোক্ষাকাঙ্খিগণ ফলাভিলাষী না হইয়া যজ্ঞ, তপ ও বিবিধ দানক্রিয়া করিয়া থাকে।

'সৎ' সদ্‌ভাব ও সাধুভাবে এই শব্দের প্রয়োগ হয়; সমুদয় মাঙ্গলিক কর্ম্মেও এই শব্দের প্রয়োগ হয়। যজ্ঞ, তপস্যা, দান এই সকল কার্য্যে যাহা স্থায়ীরূপে স্থিতি করে তাহাকে সৎ বলে এবং সেই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম তাহাকেও সৎ বলে।

'ওঁ তৎ সৎ' এই তিনটী নির্দ্দেশ দ্বারা সর্বগত সর্বাতীত ও সর্বান্তর্যামী সর্বান্তরভাবক ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ স্বরূপকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহা ঐতরেয় উপনিষদের একটি প্রসিদ্ধ বাক্য। নিম্নে বিভিন্ন শ্রুতি হইতে ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দ্দেশ জ্ঞাপক কয়েকটী মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে; যথা;—

ব্রহ্মের সর্বগতত্ব জ্ঞাপক **"ওঁ"**।

"ওঁ ইত্যেদক্ষরমিদং সর্বম্" ভূতংভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কারমেব"

মাণ্ডুক্য উপনিষদ, ১ম শ্লোক।

'ওঁ' এই অক্ষরই সমুদয়; ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ যাহা কিছু তৎসমুদয়ই এই ওঙ্কার

'পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার' প্রশ্ন ৫।২

ওঙ্কার বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ তাহাই পর ও অপর ব্রহ্ম স্বরূপ।

'পরং সত্যমক্ষরং পুরুষাখ্যং, অপরঞ্চ প্রাণাখ্যপ্রথমজং

—শঙ্করভাষ্য

পুরুষ সংজ্ঞক অক্ষর স্বরূপ যে পরব্রহ্ম, এবং প্রথমোৎপন্ন প্রাণসংজ্ঞক্ যে অপর ব্রহ্ম এই উভয়ই ওঙ্কারাত্মক। ওঙ্কার হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে।

"ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিদীদং সর্বম্।" তৈত্তিরি, ১।৮।

'ও' ই ব্রহ্ম; 'ও' এই সমুদয়।

"তৎ" সর্বাতীত ব্রহ্ম।

"তদেতৎ" (কঠ, ৫।১৪) তিনি এই।

যম নচিকেতার উপাখ্যানে ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণসকল বর্ণনার পর তাঁহার সর্বাতীতত্ব বুঝাইতে গিয়া বলা হইয়াছে; ধীরগণ "তিনি" এই" (যোগসাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে) এরূপ জানিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। আমি তাঁহাকে কিরূপে জানিব (অর্থাৎ বুঝাইব) তিনি কি প্রকাশ পান বা প্রকাশিত হন?

ইহা দ্বারা বলা হইল তিনি অনুভূতির বিষয়। "একাত্ম-প্রত্যয়সার বাক্যমনের অতীত"।

"সৎ" সর্বান্তর্যামী সর্বান্তরভাবক ব্রহ্ম।

যথা,—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)।

হে সৌম্য, এই সৃষ্টির পূর্বে এই সৎই ছিলেন।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ (ঐতরেয়, ১।১)।

ছান্দোগ্যের "সৎ" এবং ঐতরেয়ের "আত্মা" শব্দ একই অর্থবাচক, ছান্দোগ্যের ৬।৮।৭ মন্ত্রে ইহা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে।

"স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি।"

সেই যে এই অণিমা অর্থাৎ অণুত্ব, ইহাই সৎ পদার্থ, এ সমস্তই এতৎ স্বরূপ। অর্থাৎ এই সৎস্বরূপ অণুত্বই জগতের মূল। সেই সৎ পদার্থ ই সত্য, তাহাই আত্মা, তুমিও তৎস্বরূপ হও।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্বে সৎই ছিলেন, এই উক্তির পর বলা হইয়াছে "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি (৬।২।১)। সেই সৎ-মনন করিয়াছিলেন আমি বহু হইব, আমার বহুরূপে সৃষ্টি হউক।"

ঐতরেয় শ্রুতিও বলিতেছেন—"স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমাল্লোকান্ অসৃজত।" (১।১)

সেই পরমাত্মা এইরূপে ঈক্ষণ অর্থাৎ দৃষ্টি করিলেন। লোক-সকল সৃষ্টি করিব কি? পরে তিনি লোকসকল সৃষ্টি করিলেন। এই সকল বর্ণনা সেই সতের পর পর কয়েকটী অবস্থা জ্ঞাপন করিতেছে। প্রথম ব্রহ্মের নিষ্ক্রিয় অবস্থা, তৎপর ঈক্ষণশক্তিবিশিষ্ট অবস্থা। ইহা তাঁহার জ্ঞানস্বরূপত্বের অভিভাযক সৃষ্টি বিষয়ে উন্মুখাবস্থা ইঙ্গিত করে, তৃতীয় অবস্থায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিসহকারে সৃষ্টি সম্পর্কে কৃতসঙ্কল্পাবস্থা, অবশেষে পৃথক্‌রূপে জগতের সৃষ্টি সম্পাদনাবস্থা।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২ অ, ৪র্থ ব্রাহ্মণ, ১০ম শ্লোক)।

"এই যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদসকল, শ্লোকসকল, সূত্রসকল, ব্যাখ্যাসকল, অনুব্যাখ্যানসকল, যাহা কিছু সকলই এই মহাভূতের নিঃশ্বসিত।"(১) আর্দ্র কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগে যেরূপ নানাপ্রকার ধূম বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, এই সকলও তদ্রূপ ব্রহ্মের নিঃশ্বাসবৎ অযত্নপ্রসূত। (স যথার্দ্রৈন্ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ধূমা বিনিশ্চরন্তি এবং বা অরেঽস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্বসিতানি)।

(১) ইহা শতপথ ব্রাহ্মণের ১৪।৫।৪।২ বৃহদারণ্যকে গৃহীত।

যজ্ঞ, দান ও তপঃ ক্রিয়াতে ব্রহ্মের সর্বগত (ওঁ), সর্বাতীত (তৎ) ও সর্বান্তরভাবক (সৎ) এই ত্রিবিধ লক্ষণসম্পন্ন সমগ্র অবয়ব গ্রহণের ব্যবস্থা এইরূপ :—

যজ্ঞ সম্বন্ধে যজ্ঞীয় বাহ্যিক উপকরণসমূহে ব্রহ্ম দর্শনের যে উপদেশ আছে তাহা ব্রহ্মের তদ্গত (immanent) ভাব। ব্রহ্ম তদ্গত হইয়াও সে সকল উপকরণাদিতে নিবদ্ধ নহেন, তিনি তৎ সকলের অতীত। যজমান (সাধক) যখন ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া নির্লিপ্ত ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তখন এই সকল উপকরণ তাহাকে বদ্ধ রাখিতে পারে না। তিনি ইহাদিগের অতীত হন।

তদ্গত ও তদতীত এই উভয় ভাবই সীমাবদ্ধ সুতরাং ইহাদিগের দ্বারা ব্রহ্মের যে অভিব্যক্তি হয় তাহা খণ্ডশঃ; এই উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করিয়া সতেতে ব্রহ্মের সর্বব্যাপক্ অখণ্ড সত্বার অভিব্যক্তি হয়। এ বিষয়ে (কঠোনিষদ, ৫ম বল্লী ৯—১১ মন্ত্র) যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর যে যে রূপ সেই সেই রূপে প্রতিভাত হয়, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে তত্তদ্ বস্তুরূপ হইয়াছেন, এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন।(৯)

যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানা বস্তু ভেদে তত্তদ্রূপ হইয়াছেন, সেইরূপ একই সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে

মহানির্বাণ তন্ত্রে "ওঁ তৎসৎ" মন্ত্রের মহিমার এরূপ বর্ণনা আছে ;—

"ওঁ তৎ সদিতি মন্ত্রেন যো যৎ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
গৃহস্থো বাপ্যুদাসীনস্তস্যাভীষ্টায় তদ্ভবেৎ॥
জপো হোমঃ প্রতিষ্ঠা চ সংস্কারাস্থ মিলাঃ ক্রিয়াঃ।
ওঁ তৎ সন্মন্ত্র নিষ্পন্নাঃ সম্পূর্ণাঃ স্যুর্ণসংশয়॥
কিমন্যৈর্বাহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিমন্যৈর্ভূরি সাধনৈঃ।
ব্রাহ্মোণানেন মন্ত্রেণ সর্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥

১৪শ উল্লাস, ১৫৪—১৫৬।

সেই সেই বস্তুর রূপ হইয়াছেন। এবং সমুদয় পদার্থের বাহিরেও আছেন। (১০)

সর্বলোকের চক্ষু স্বরূপ এই যে সূর্য্য ইহা যেমন চক্ষুগ্রাহ্য বাহিরের অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ একমাত্র সর্বভূতান্তরাত্মা জাগতিক দুঃখের সহিত মিলিত হয় না।(১১)

অষ্টাদশ অধ্যায়ের নাম মোক্ষযোগ—পূর্বে যাহা যাহা বলা হইয়াছে এই শেষ অধ্যায়ে তাহার একত্র সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য যে সকল বিষয় নানা স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিস্তার পূর্বক বলা হইয়াছে, যাহাতে সে সকল বিষয় পর পর শ্রেণীবদ্ধ প্রণালিক্রমে সহজে বুঝিতে পারা যায় গ্রন্থের উপসংহারে সংক্ষেপে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—"সংযতচিত্ত ব্যক্তি স্বয়ং অহঙ্কার শূন্য, তিনি দেহ দ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না, অন্যকেও করান না, বিবেকবুদ্ধি দ্বারা ইহা জানিতে পারিয়া সর্বপ্রকার বিক্ষেপকর কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া প্রসন্ন চিত্তে অবস্থান করেন।"

নিগমাগম তন্ত্রাণং সারাৎসারতরো মনুঃ।
ওঁ তৎ সদিতি দেবেশি তবাগ্রে সত্যমীরিতম্॥ ঐ ১৫৯

গৃহী বা উদাসীন যিনিই 'ওঁ তৎসৎ' এই মন্ত্র দ্বারা কর্ম্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার ইষ্ট লাভ হইয়া থাকে। জপ, হোম, প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সংস্কার কার্য্য ওঁ তৎসৎ মন্ত্রে নিষ্পন্ন হইলে নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হইবে।

অন্যান্য বহুতর মন্ত্র বা নানাবিধ সাধনার কি প্রয়োজন! হে দেবেশি! এই ব্রহ্ম ওঁ তৎসৎ দ্বারা সমুদয় কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য। এই মন্ত্র যে নিগম আগম ও মন্ত্র সমূহের সার এ কথা তোমাকে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।

নবম অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে,—"শুভাশুভ ফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সন্ন্যাস যোগে যুক্তচিত্ত (সন্ন্যাস যোগযুক্তাত্মা) তুমি আমাকে পাইবে" এই সকল বাক্য দ্বারা কর্ম্ম সন্ন্যাস উপদিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র কর্ম্মফল মাত্র ত্যাগের উল্লেখ রহিয়াছে। যথা, (৪র্থ অঃ, ২০ শ্লোক) "ত্যক্ত্বা কর্ম্ম ফলাসঙ্গং" এবং (১২ অঃ, ১১ শ্লোক) "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং"।

প্রথম উক্তি দুইটী কর্ম্মফলত্যাগরূপ সন্ন্যাস; শেষোক্ত দুইটী দ্বারা কর্ম্মফল ত্যাগ বুঝাইতেছে। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান পরস্পর বিরোধী। ইহার সামঞ্জস্য কোথায় তাহা জানিবার জন্য অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন,—সন্ন্যাস (অর্থাৎ কর্ম্ম সন্ন্যাস) এবং ত্যাগ (কর্ম্ম ফলত্যাগ) এই উভয়ের তত্ত্ব কি?

উত্তরে বলা হইয়াছে,—যে সকল কাম্যকর্ম্ম (যথা পুত্রেষ্টি, জ্যোতিষ্টোম যাগ ইত্যাদি) এই সমূহের সম্যক্ ত্যাগের নাম সন্ন্যাস, আর সকল কাম্য ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলের ফলমাত্র ত্যাগকে ত্যাগ বলে। এইমত বিশদ ভাবে ব্যাখ্যার জন্য সাংখ্য ও মীমাংসকদিগের মত উত্থাপন করিয়া বলিতেছেন, প্রথমোক্তদের মতে কর্ম্মমাত্রই হিংসাদি দোষযুক্ত, সুতরাং তাহা ত্যজ্য; মীমাংসকদের মতে যজ্ঞ, দান, তপঃ এই সমুদয় কার্য্য কদাপি ত্যজ্য নহে। অর্থাৎ যজ্ঞাদি উপলক্ষে যাহা বৈধ হিংসা তাহাতে দোষ নাই।

এই মতভেদ প্রদর্শন করিয়া গীতাকার সামঞ্জস্য করিলেন যে, যজ্ঞ, দান, তপঃকর্ম্ম বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, কিন্তু এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল ঈশ্বরারাধণারূপে অনুষ্ঠিত হওয়া চাই। কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া "এই সমুদয় কর্ম্ম করাই বিধি" এইরূপ জানিয়া নিত্যরূপে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও তাহা ত্যাগই সন্ন্যাস। এই

ত্যাগ দুঃখকরই হউক আর সুখকরই হউক নিষ্ঠাযুক্ত ব্যক্তি কর্ম্মকে বর্জ্জনও করেন না, অথবা তাহাতে আসক্তও হন না।

এইক্ষণ প্রশ্ন উঠিতে পারে যখন কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত থাকাই লক্ষ্য তখন কর্ম্মফল ত্যাগ অপেক্ষা সর্বকর্ম্ম ত্যাগই তো শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতে কর্ম্মদ্বারা চিত্ত বিক্ষেপের আশঙ্কা থাকে না, এবং ফলে জ্ঞান নিষ্ঠারও কোন ব্যাঘাত হইতে পারে না। হইলে ভালই হইত, কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই "ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ" দেহধারী ব্যক্তি নিঃশেষে কর্ম্ম সকল কখনও ত্যাগ করিতে পারে না। "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"।

মানুষ তাহার শরীর মন ও বাক্য দ্বারা ন্যায্য অন্যায্য যে সকল কর্ম্ম করে তাহার হেতু হইতেছে অধিষ্ঠান (দেহ), কর্ত্তা (অহঙ্কার), করণ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, চেষ্টা (প্রাণাপানাদি ব্যাপার) এবং দৈব (চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতা)।

কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু কি ?

"জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা"

জ্ঞান (ইষ্ট সাধন বিষয়ক জ্ঞান), জ্ঞেয় (ইষ্ট সাধন কর্ম্ম) ও পরিজ্ঞাতা (জ্ঞানের আশ্রয়), এই তিন কর্ম্ম প্রবৃত্তির হেতু। আর কর্ম্ম-সংগ্রহ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় হইতেছে, করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা (করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্ম সংগ্রহঃ)। ইষ্ট, অনিষ্ঠ ও মিশ্র কর্ম্ম হইতে এই তিন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। যাহারা সকামকর্ম্মী এই সকল কর্ম্মফল পরলোকে তাহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা সন্ন্যাসী তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই সুতরাং কর্ম্মফল তাহাদিগকে অনুসরণ করে না।

সন্ন্যাসী শব্দ এখানে কর্ম্মফল ত্যাগীর প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ সন্ন্যাস শব্দ গ্রন্থে মুখ্য ও গৌণ দুইভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে।

মুখ্য সন্ন্যাস দুই প্রকার,—জ্ঞানলাভের জন্য কাম্যাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস এবং জ্ঞানলাভের পর কর্ম্মত্যাগ সহকারে সন্ন্যাস। এই উভয় সন্ন্যাসই আশ্রম সন্ন্যাস। গৌণ সন্ন্যাস কর্ম্মফল ত্যাগরূপ সন্ন্যাস। ইহাকে ত্যাগ বলা হইয়াছে।

সাংখ্য শাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ এই সকল সত্ত্বাদিগুণভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে। এই তিনটি গুণ হইতে মুক্ত এমন কোন মনুষ্য নাই। কর্ম্ম সকল স্বভাবজাত এই সকলের প্রত্যেকটিই সাত্ত্বিকাদি গুণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যিনি ব্রাহ্মণ তিনি সত্ত্বগুণ প্রধান এবং তাঁহার স্বভাবজাত কর্ম্ম হইতেছে শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, বিজ্ঞান (অনুভব) ও আস্তিক্য অর্থাৎ পরলোকে বিশ্বাস।

ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—শৌর্য্য, তেজঃ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, ঈশ্বরভাব (অর্থাৎ লোক নিয়মন শক্তি)।

এইরূপে বৈশ্য ও শূদ্রের স্বভাবজাত ধর্ম্ম কি—তাহা বর্ণনার পর বলা হইয়াছে, স্বভাবজাত যাহার যে ধর্ম্ম তাহার সম্যক্ অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ পন্থা। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, ধর্ম্মযুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বভাব ধর্ম্ম। ইহাতে হিংসাদোষ আছে এজন্য পরধর্ম্ম (এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম) শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহা গ্রহণ করা অর্জ্জুনের পক্ষে ঠিক হইবে না। স্বধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে তাহা যদি বিগুণও হয় তথাপি পরধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা, স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্ম করিলে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। অপিচ, "আমি নিজে বিনষ্ট হইব তথাপি ভীষ্ম প্রভৃতি গুরুজনদের সহিত যুদ্ধ করিব না"—ইহা তোমার অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া বলা হইল যদি বল তবে তাহাও তুমি পার না, কারণ তোমার রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয় প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধে নিয়োজিত করিবেই। মোহবশতঃ তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না স্বভাবজাত স্বীয় প্রকৃতি দ্বারা চালিত ও অবশপ্রায় হইয়া তুমি তাহা করিবে। এইভাবে প্রকৃতির

স্বভাবপরতন্ত্রতা ও কর্ম্ম পরতন্ত্রতার উল্লেখ করিয়া কর্ম্ম যখন করিতেই হইবে, তখন ইহার দোষাংশ অর্থাৎ যাহা বন্ধনের হেতু তাহা পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশ সম্পাদনই কর্ত্তব্য।

যে জ্ঞান দ্বারা পরস্পর বিভক্ত ব্রহ্মাদিস্থাবরান্ত সর্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয় ভাবকে বুঝা যায় অর্থাৎ পরমতত্ত্বের অনুভব হয়, সেই সাত্ত্বিক জ্ঞাননিষ্ঠা সহকারে এবং অটল ধৈর্য্যের সহিত বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া এবং শব্দাদি বিষয়সকল ও রাগদ্বেষাদি ত্যাগ করিয়া শুচি ও নির্জ্জন স্থানে বাস এবং মিতাহার দ্বারা মন বাক্য শরীরকে সংযত করিয়া সর্বদা ধ্যানযোগপরায়ণ ও বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও প্রতিগ্রহ ত্যাগ করতঃ, নির্ম্মম ও শান্ত হইলে ব্রহ্মত্বলাভের অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাবাপন্ন হওয়ার যোগ্য হওয়া যায়।

তাহার ফল কি বলা হইতেছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত প্রসন্ন চিত্ত ব্যক্তি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সম চিত্ত হইয়া পরাভক্তি লাভ করেন।

মনুষ্যমাত্রই প্রকৃতি, স্বভাব ও কর্ম্ম এই তিনের অধীন। ইহা সাংখ্য মতানুযায়ী, এবং ইহারা দুরতিক্রমণীয়; এই অবস্থায় ইহা-দিগের উপর কিরূপে জয়লাভ করিয়া ব্রহ্মভূত হইতে পারা যাইবে।

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে ক্ষর (প্রকৃতি) ও অক্ষর (জীব) পরমেশ্বরের এই দুই প্রকৃতি ভিন্ন আর একটি শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি আছে যাহা তাঁহার পুরুষোত্তম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি ঈশ্বর (নিয়ন্তা) ও অব্যয় (নির্বিকার) এবং তিনি লোকত্রয়ের হৃদয়ে প্রবেশ করতঃ পালন করেন "যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ"।

১৫অ ১৭

এই যে পুরুষোত্তম নামধেয় ঈশ্বর তিনি সকল ভূতগণের হৃদয়ে বাস করিতেছেন এবং দেহাভিমানী জীবকে যন্ত্ররূপে ভ্রমণ করাইতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

এই উক্তি দ্বারা মানবের সাংখ্যমতানুযায়ী প্রকৃতির পরতন্ত্রতা, স্বভাবপরতন্ত্রতা এবং কর্ম্মপরতন্ত্রতার উপর পরমেশ্বরপরতন্ত্রতা রহিয়াছে ইহা জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন,—

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত !
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

সর্বতোভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি ও শাশ্বতধামস্বরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।

অবশেষে নবম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকের অংশ "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু মামেবৈষ্যসি" ইহার পুনরুল্লেখ করিয়া বলিতেছেন "সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে", তোমাকে ইহা আমি সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি কেননা তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়। ইহা এবং "কৌন্তেয় ! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"। (৯অঃ—৩১) এই উভয় উক্তি দ্বারা ইহা যে মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় তাহা সমর্থন করা হইয়াছে।

অবশেষে গীতার যত সব উপদেশ তাহার সার ও লক্ষ্য যাহা তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে,

"সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

ইহা ভগবৎধর্ম্ম—মহাভারতে নারায়ণী উপাখ্যানে পঞ্চরাত্রে এই ধর্ম্মকে **ঐকান্তিক** ধর্ম্ম বলা হইয়াছে। ইহা অব্যভিচারি ভক্তিযুক্ত একেশ্বর বাদ (monotheistic religion). "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" কথার মধ্যে বৈদিক বহু দেবতার উপাসনার ইঙ্গিত রহিয়াছে

এবং তাহা অপেক্ষা ফলাকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত হইয়া সর্বকর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পন পূর্বক একমাত্র তাঁহার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া জীবন যাপন যে মনুষ্যের অশেষ কল্যানের হেতু, এখানে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত ব্রহ্মবিদ্যার প্রস্থানত্রয়ের সাধনশাস্ত্র স্মৃতিপ্রস্থান গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় কি অধ্যায়-সারসগ্রহ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। এই সাধনায় জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনেরই প্রয়োজনিয়তা রহিয়াছে। ব্যাখ্যাকারগণ নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী কেহ জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়াছেন—যথা শ্রীমৎ শঙ্কর। কেহ কর্ম্মকে প্রাধান্য দিয়াছেন,—যেমন লোকমান্য তিলক। কেহ ভক্তিকে প্রাধান্য দিয়াছেন, আবার কেহবা এই তিনের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

সাধনার লক্ষ্য সংসারে পুনরাগমন নিরোধ। রামানুজ মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম সংসৃষ্ট ধ্যানপ্রধান ভক্তি ইহার উপায়।

শাণ্ডিল্য মতে কেবল ভক্তিতেই মুক্তি।

গীতাকে ছয় ছয় অধ্যায়ে তিন কাণ্ডে বিভাগ করিয়া মধুসূদন সরস্বতী বলেন;—প্রথম কাণ্ডে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ প্রণালী দ্বারা 'ত্বং' শব্দবাচ্য বিশুদ্ধ-আত্মা প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে নিরূপিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় কাণ্ডে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠাবর্ণন প্রণালীতে—'তৎ' শব্দবাচ্য পরমানন্দ ভগবান্ অবধারিত হইয়াছে।

তৃতীয় কাণ্ডে এতদুভয়ের ঐক্য পরিষ্কাররূপে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

বলদেব গোস্বামীমতে;—জীব ঈশ্বরের অংশ, ঈশ্বর অংশী।

প্রথম ছয় অধ্যায়ে অংশ জীবের অংশী ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিবার যে উপযোগী স্বরূপ আছে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান

অন্তর্গত আছে এরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সাধকের ভক্তিতে উপযোগিতা বা অধিকার জন্মে।

মধ্য ছয় অধ্যায়ে যে ভক্তি দ্বারা পরমপ্রাপ্য ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই ভক্তির মহিমা অগ্রে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া ভক্তিযোগের কথা বলা হইয়াছে।

শেষ ছয় অধ্যায়ে পূর্বে যে ঈশ্বর জীব ইত্যাদির স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তাহারই বিশেষ পরিপোষণ। ইহাতে ভক্তি ও ভক্তি-প্রতিপাদক বিষয়ের উল্লেখ আছে।

তাঁহার মতে কর্ম্মানুষ্ঠানে হৃদয় শুদ্ধ হইয়া জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তি হয়। সেই জ্ঞানই রূপান্তরিত হইয়া ভক্তি নামে অভিহিত হয়। বেদান্তস্যমন্তকে তিনি বলিয়াছেন শব্দ জনিত জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান। হ্লাদিনীর (আনন্দের) সার প্রেম—তৎসমবেত সংবিৎ-জ্ঞান অপরোক্ষ জ্ঞান। সেই অপরোক্ষ জ্ঞানই ভক্তি শব্দে অভিহিত হয়।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীমতে ;—প্রথম ছয় অধ্যায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় ভক্তিযোগ, তৃতীয় ছয় অধ্যায় জ্ঞানযোগ। ভক্তি পরম রহস্য এবং জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবন সঞ্চার করে বলিয়া অত্যন্ত আদরণীয়, ও সর্বাপেক্ষা দুর্ল্লভ, তাই ইহা মধ্যে। ভক্তি না থাকিলে কর্ম্ম ও জ্ঞান বিফল হইয়া যায়, এইজন্য ভক্তি-মিশ্রজ্ঞান ও কর্ম্ম এই শাস্ত্রের অভিপ্রেত।

এই সকল বিষয় স্মরণপথে রাখিয়া আমরা মূল গীতাশাস্ত্র হইতে সাধন ও মুক্তি সম্বন্ধে কি কি পন্থার নির্দ্দেশ আছে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গীতা

গীতা শাস্ত্রে যে সাধনার বিষয় উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লক্ষ্য কি অধ্যায়-সার-সংগ্রহ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়, এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে সাধকের পক্ষে যে সাধনার সোপান পরম্পরা ক্রমশঃ উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ প্রয়োজন তাহাও বুঝা যায়। এই সাধনা বিশেষ প্রযত্নসাধ্য ; সেজন্য বলা হইয়াছে ;—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥" ৭।৩

"আমি কে? এবং সিদ্ধি কাহার?" এই তত্ত্ব না জানা পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভের জন্য আমার যত্নই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

মানবের ইন্দ্রিয়গুলি স্বভাবতঃ বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হয়, ইহাই নিয়ম।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎস্বয়ম্ভুস্তস্মাৎপরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।"

ঈশ্বর ইন্দ্রিয় দ্বারগুলিকে বহির্মুখী করিয়া দিয়াছেন সেইজন্য মানুষ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করে অন্তরাত্মাকে দেখে না। দুঃখার্ত্ত হইয়া বিষয়েতে যখন সে আর সুখ পায় না তখন অন্তরাত্মাকে দেখিবার জন্য অর্থাৎ আত্মানুসন্ধানে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে। আত্মতত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া সে জানিতে পারে, আত্মা দেহাতিরিক্ত, অবিনাশী, অবিকারী বস্তু। বিনাশ ও বিকার দেহের ধর্ম্ম, আত্মার নহে। তখন প্রশ্ন উঠে ;—দেহটা তবে কি?

দেখিতে পায় দেহের উৎপত্তি প্রকৃতি হইতে, প্রকৃতির সহিত ইহার নিত্য সম্বন্ধ ; আত্মা প্রকৃতির অতীত বস্তু ; সুতরাং প্রকৃতি সম্ভূত বিষয় ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য আত্মার নহে। এইরূপে

সাধককে নিজের স্বাতন্ত্র্য অবলোকন করতঃ দর্শনাদি ইন্দ্রিয় ব্যাপারে যাহাতে নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করিতে পারে তাহা শিক্ষা করিতে হইবে। এইরূপ সাধনায় তন্নিষ্ঠ হওয়ার পর যে সকল কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তাহা প্রকৃতিজাত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা সংঘটিত হইতেছে এরূপ জানিয়া আসক্তি ও ফল ত্যাগপূর্বক যাহাতে উদাসীনভাবে অবস্থিতি করিতে পারা যায় সেইভাবে তাহাকে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন অভ্যাস করিতে হইবে ; কিন্তু ইহা সহজ ব্যাপার নহে। কর্ম্মে অকর্ম্মদর্শন করিবার সামর্থ্য সঞ্চয় করিতে হইলে কর্ম্মের গতি বুঝা আবশ্যক। ইহা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। "গহনা কর্ম্মণো গতিঃ" (৪ অঃ—১৭)

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, সে বিষয়ে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, এই জ্ঞান লাভও বড় কঠিন। পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।" ঐ ১৬। কর্ম্ম হইতে জীবের বন্ধন, অথচ কর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম সুতরাং ইহার এমন কৌশল জানা প্রয়োজন যেন কৃত কর্ম্ম বন্ধনের কারণ না হয়।

গীতাশাস্ত্র কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ইহাদিগকে যথাক্রমে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম সংজ্ঞা দিয়া বলা হইয়াছে, কর্ম্মেতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করে, মনুষ্যগণ মধ্যে সেই বুদ্ধিমান্।

এই কর্ম্মতত্ত্ব কি ? তাহা জানা প্রয়োজন। যাহা শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া অনুষ্ঠান তাহা কর্ম্ম, শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্ম্ম বিকর্ম্ম।

ভাষ্যকারগণ নানাভাবে এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নীলকণ্ঠ সুরির ব্যাখ্যার মর্ম্ম—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহার সবই নিষ্ফল, করিয়াও করা হয় না, তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্ম। আর যশোলিপ্সু, আত্মম্ভরী দাম্ভিক ব্যক্তি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে সেই কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়।

মধুসূদন সরস্বতীর ব্যাখ্যার মর্ম্ম—কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, বন্ধন হইতে দুঃখ, সুতরাং কিছু না করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, এইরূপ যদি মনে করা হয়, তাহা আত্ম-প্রতারণা মাত্র ; কারণ যদি কর্ত্তৃত্ব না থাকে তবে বিহিত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না, আর কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকিলে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক ঔদাসীন্যের এই যে ভান ইহাও কর্ম্ম, কারণ তাহা প্রযত্নসাধ্য ; প্রযত্ন মাত্রই কর্ম্ম। সুতরাং বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকা প্রযুক্ত এই ঔদাসীন্যের অভিমানও বন্ধনের হেতু হয়।

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এই তিনের এরূপ তত্ত্ব অবগত হইয়া বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই দুইকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হইয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে এই অভিপ্রায়।

পরবর্ত্তী ১৯—২৩ এই পাঁচ শ্লোকে কর্ম্মে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শনের তাৎপর্য্য কি তাহা বলা হইয়াছে।

কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনরূপ জ্ঞানানলে সমুদয় কর্ম্ম দগ্ধ করিয়া কামনা ও সঙ্কল্প বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। যিনি নিত্যতৃপ্ত, সুতরাং যাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না, কর্ম্মফলের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার কর্ম্ম করা হয় না। যিনি আকাঙ্ক্ষাশূন্য, পরিগ্রহ-বিবর্জ্জিত, অর্থাৎ ভোগ্য-সামগ্রী প্রতি স্পৃহাহীন, সংযত-চিত্ত, যাহা আপনা হইতে আসে তাহাতেই সন্তুষ্ট, সুখ দুঃখের অতীত, মাৎসর্য্য-শূন্য, সিদ্ধি, অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, আসক্তিশূন্য, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত, তাঁহার শরীর রক্ষার্থ যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বন্ধনের হেতু হয় না। এইরূপ সংযত-চিত্ত ব্যক্তি নিস্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইয়া শান্তি লাভ করে।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥" ২ অ, ৭১

এই সকল হইতে বুঝা যায় আত্মাভিমান পরিশূন্যতা এই সাধনার পথে সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয় এবং সেজন্য কর্ম্মসিদ্ধির পশ্চাতে কি কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা জানা আবশ্যক। এইজন্য আরেক ভাবে বিষয়টী উত্থাপিত করা হইয়াছে। ইহা সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। এই মতে সমুদয় কর্ম্মের সিদ্ধির মূলে পাঁচটী কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহারা যথাক্রমে অধিষ্ঠান, কর্ত্তা, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, নানাপ্রকারের পৃথক্ চেষ্টা এবং দৈব।

ন্যায় হউক অথবা অন্যায়ই হউক শরীর, বাক্য ও মনের দ্বারা মনুষ্য যে কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকে এই পাঁচটী তাহার হেতু।

১৮ অ, ১৪, ১৫

অধিষ্ঠান বলিতে দেহ বুঝায়,—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ ও চেতনাদির প্রকাশের আশ্রয় বলিয়া দেহ অধিষ্ঠান বা কর্ত্তা ; জীব ভোক্তা।

দৈব, চক্ষুরাদির অনুগ্রাহক আদিত্যাদি দেবতা ; চক্ষুর দর্শন-শক্তি আদিত্যের অনুগ্রহসাপেক্ষ। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ই এইরূপ নিজ নিজ দেবানুগ্রহসাপেক্ষ।

"ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥" ১৮ অ, ৬১

এই শ্লোকের অনুসরণ করিয়া রামানুজ "দৈব" অর্থ করিয়াছেন অন্তর্যামী, পরমাত্মা। তিনি ১৪শ শ্লোকের এরূপ মর্ম্মার্থ করিয়াছেন ;—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও দেহাদি পরমাত্মার প্রদত্ত, পরমাত্মার শক্তিতে ইহাদিগের শক্তি। পরমাত্মার আবাস-ভূমি স্বয়ং জীবাত্মা পরমাত্মার শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়যোগে কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য স্বেচ্ছায় কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি চেষ্টা সাধন করে। সেই সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত পরমাত্মা (দৈব) নিজে

অনুমতি দিয়া সেই জীবকে কাজে প্রবর্ত্তিত করেন (ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া)। শঙ্করাচার্য্যও দৈব অর্থ সর্বান্তর্যামী করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী ১৬ শ্লোকে আত্মাকে **কেবল** বিশেষণে বিশেষিত করিয়া বলিতেছেন ;—যখন সকল কার্য্যেই এই পাঁচটী হেতু তখন "কেবল" আত্মাকে (অর্থাৎ যে অবিকারী আত্মা কাহারো সহিত মিশে না সুতরাং যাহার অপরের সহিত মিশিয়া কর্ত্তৃত্ব করা সম্ভবপর নহে) যে ব্যক্তি কর্ত্তা দেখে, সে দুর্ম্মতি অকৃতবুদ্ধি, (উপদেশাদির অভাবে অপরিস্ফুট বুদ্ধি), দেখিতে পায় না (তত্ত্ব বুঝিতে পারে না)।

শরীর বাক্য ও মন দ্বারা মনুষ্যের কৃতকার্য্য সকলের কারণ যখন এই পাঁচটী, তখন জীবের কর্ত্তৃত্ব দেহাদি নিরপেক্ষ হইতে পারে না। সে দেহাদি পরতন্ত্র হইয়া বিষয়ভোগে রত হয়। ইহাতে তাহার অবাধ কর্ত্তৃত্ব নাই এবং এই অবস্থায় ভগবদ্ভাব বিবর্জ্জিত তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল বন্ধনের হেতু হয়। ঈশ্বরের অধীনতায় যখন তাহার কার্য্যানুষ্ঠিত হয়, তখন আহারাদি দ্বারা যেরূপ দেহের পুষ্টি সাধিত হয়, তদ্রূপ আত্মাতে জ্ঞানাদি ঐশীশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া স্বরূপের পুষ্টি সাধন করে। এইরূপে আত্মার পরিপুষ্টি সাধিত হইলে ব্রহ্মের সহিত স্বরূপের ঐক্য বশতঃ তাঁহার ব্রহ্মে স্থিতি হয়। এই অবস্থায় "**কেবল**" জীবাত্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত না হইয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া দেহাদির কার্য্যকারিতা সকল উপস্থিত হয়, সুতরাং সে সকল কার্য্যের আত্মা কর্ত্তা নহে, এবং সেই হেতু আত্মাভিমানের আর কোন অবসর থাকে না।

আত্মা নিত্য এই বুদ্ধি সহকারে আসক্তি পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান আচরণীয় ; এরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্ম হইয়া যায়—ইহা কর্ম্মকুশলতা।

জন্ম জরা ও মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ জীবের অন্তরে এইরূপে আত্মজ্ঞান উপজাত করিয়া এবং কিরূপে এই পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারা যায়, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া, মুক্তিপথের যাত্রী সাধককে কি উপায় অবলম্বনে গন্তব্যপথে উপনীত হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা রহিয়াছে। এই পথ বড়ই বন্ধুর, সাধনাও অতিশয় প্রযত্নসাধ্য। কর্ম্মকুশলতা কি তাহা বুঝা গেল, এখন ইহা অর্জ্জন করিবার উপায় কি তাহা বিবেচ্য।

গীতাশাস্ত্র কঠোপনিষদের চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এই শ্রুতিমতে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বহির্ম্মুখী হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে ; বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হওয়া ইহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাই সাধারণতঃ লোকে বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে।

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাঃ।"

৪র্থ বল্লী—২২

শ্রুতিতে কবিত্বের ভাষায় বলা হইয়াছে ;—শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথী, মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গুলিকে অশ্ব, ইন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ-রসাদিকে পথ, ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মাকে রথী বলিয়া জানিবে।

অসমাহিতমনা ও অবিবেকী ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল সারথীর দুষ্টাশ্বের ন্যায় অবশ হয়। যিনি সমাহিতমনা ও বিবেকী তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সাধু (অর্থাৎ শিক্ষিত) অশ্বের ন্যায় বশীভূত থাকে।

(৩য় বল্লী, ৩-৬)

ইন্দ্রিয়গুলি অসংযত থাকিলে তাহা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, গীতায় তাহার এরূপ বর্ণনা আছে ঃ—

দুষ্টাশ্বের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলি যখন নিজ নিজ বিষয়ে বিচরণ করে, তখন মন তাহাদিগের যে কোন একটী ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া অবশভাবে তাহার অনুসরণ করে। আত্মা কি, অনাত্মা কি, ইহা

দেখাইয়া দেওয়া যে প্রজ্ঞার কার্য্য, তাহা তখন বায়ুতাড়িত নৌকার ন্যায় বিষয়াকর্ষণে বিক্ষিপ্ত হয়।

"ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥"

২য়—৬৭।

সেজন্য পরশ্লোকে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে নিগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু ইহা সম্ভবপর কিরূপে? ইন্দ্রিয়গুলি এরূপ পরাক্রমশালী যে ইহারা যত্নশীল জ্ঞানীব্যাক্তির মনও হরণপূর্ব্বক একান্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত করে।

"যততোহ্যপি কৌন্তেয়! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥

২—৬০।

ইন্দ্রিয়গুলির উদ্দাম প্ররোচনা হইতে কাম, ক্রোধ ও লোভের উদ্ভব হয়, ইহাদিগকে ত্রিবিধ নরকের দ্বার, ও আত্মার বিনাশের হেতু বলা হইয়াছে (১৬ অঃ ২)।

বিষয় চিন্তা এই সকল রিপুর উদ্ভবের মূল কারণ। বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্যতা জন্মে। তখন স্মৃতিভ্রম উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মবশে রাখিবার জন্য শাস্ত্র ও আচার্য্যগণের যে সকল উপদেশ আছে শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিও সে সময় তাহা ভুলিয়া যান। স্মৃতি-বিভ্রম উপস্থিত হইলে আত্মজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায়, কোন্‌টি কর্ত্তব্য কোন্‌টি অকর্ত্তব্য, সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, বুদ্ধিনাশ প্রাপ্তির ফলে মানব আত্মতত্ত্ব বিমূঢ় হইয়া বিষয়ে নিমগ্ন হয়, এবং যাহা পরমপুরুষার্থ তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হয়, পুনরাগমনের শৃঙ্খলে নিজকে আবদ্ধ করে।

কঠোপনিষদে ইহার এরূপ বর্ণনা ;—

"যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাঽশুচিঃ।
ন স তৎপদমাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি॥"

৩য় বল্লী—৭।

অবিবেকী অসমাহিতমনা ও সর্বদা অশুচি ব্যক্তি ব্রহ্মপদপ্রাপ্ত হয় না—অর্থাৎ যাহা পরমপুরুষার্থ তাহা প্রাপ্ত হয় না। তাহার সংসারগতিই লাভ হয়।

ইন্দ্রিয়গণ যাহার বশে নাই তাহার বুদ্ধি নাই, তাহার ভাবনা ধ্যান করিবার ক্ষমতা নাই। ধ্যান না করিতে পারিলে শান্তি কোথা হইতে আসিবে? যে শান্ত হইতে পারিল না তাহার সুখ কিরূপে হইবে? (২—৬)

সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিগ্রহ করা সর্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিবে কে?

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩য় অঃ, ৩৩।

জ্ঞানবান ব্যক্তিও আপনার প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, জীবগণ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন করে ; এই যখন অবস্থা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ কে করিবে?

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ বা দ্বেষ অনিবার্য্য।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ (৩৪)।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়, এবং কথায় ও কার্য্যে রাগ দ্বেষ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয়।

বস্তুতঃ প্রকৃতির বিকার সত্ব, রজ ও তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূত কার্য্য ও কারণরূপী শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সাহায্যে সর্বপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকে (প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্বশঃ)।

তথাপি এই দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে অহংবুদ্ধি স্থাপনকরতঃ আমিই শরীরাদির কর্ত্তা, আমিই ইহাদিগের মধ্যবর্ত্তীতায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি, লোকে এরূপ মিথ্যাভ্রমে পতিত হয় এবং কর্ম্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে। অধিকাংশ স্থলেই মানবের এই অবস্থা, সুধু সেই জ্ঞানী ব্যক্তিরাই এই ভ্রম হইতে বিমুক্ত থাকিতে পারেন, যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ-তত্ত্ব জানেন। গুণই গুণানুবর্ত্তন করিতেছে, ইহা জানিয়া তাঁহারা তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন না।

"তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে"॥ ৩—২৮

গুণকর্ম্মবিভাগ বলিতে সত্ত্বাদি গুণবিভাগ ও ঐ সকল গুণের ক্রিয়াবিভাগ বুঝায়।

সত্ত্ব, রজ ও তমঃপ্রধান শরীর, ইন্দ্রিয় ও প্রাণ এই সকল গুণ-বিভাগ এবং দর্শন, স্পর্শন, ক্ষয়, বৃদ্ধি ইত্যাদি কর্ম্মবিভাগ। যিনি এই উভয়ের তত্ত্ব অবগত আছেন, তিনি নিজে গুণাত্মক নহেন, কর্ম্মাত্মক নহেন, পরন্তু গুণসকলই গুণের অনুবর্ত্তন করিতেছে, তিনি স্বয়ং গুণ ও কর্ম্মের অধীন নহেন এরূপ জানিয়া গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগে অভিনিবিষ্ট হন না। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের যে স্বাভাবিক অনুরাগ বা দ্বেষ তাহা হইতে নিজকে অসংস্পৃষ্ট রাখিতে হইবে।

বল ও প্রবৃত্তি রজোগুণের ধর্ম্ম। বিষয়-চিন্তা হইতে তৎপ্রতি যে প্রবৃত্তি বা অভিলাষ জন্মে তাহা কাম। এই কামনা পূর্ণ করিতে গিয়া বাধা প্রাপ্ত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। কাম ও ক্রোধকে তাই রজোগুণসমুৎপন্ন বলা হইয়াছে। ইহারা পরম দুর্দ্ধর্ষ শত্রু। ৩—৩৭

ধূম দ্বারা যেমন বহ্নি আবৃত থাকে, মালিন্য দ্বারা দর্পণ, গর্ভবেষ্টন বা জরায়ু দ্বারা গর্ভ আবৃত থাকে, সেইরূপ কাম ক্রোধ দ্বারা জ্ঞান আবৃত হয়। কামের আশ্রয় বা অধিষ্ঠানভূমি হইতেছে ইন্দ্রিয়,

মন ও বুদ্ধি (৩—৩৮)। এই সকলের ভিতর দিয়া কাম দেহীকে বিমোহিত করে।

ইন্দ্রিয় বিষয়কে সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহার পর সঙ্কল্পাত্মক মনে আন্দোলন উপস্থিত হইয়া তাহাকে বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত করে, বুদ্ধি বিষয় সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় সিদ্ধান্ত করে। এই সকলকে অবলম্বন করিয়া কামের আবির্ভাব হয়। অতএব সাধন পথের যাত্রীর সর্ব-প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশী এই পাপকে বিনাশ করা।

দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়সমুদয় হইতে মনঃ শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ এই দেহী।

'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ (৩—৪২)।

এই দেহীকে জানিয়া আপনাতে আপনাকে নিশ্চলকরতঃ কামরূপ এই দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকে বিনাশ করিতে হইবে।

কঠোপনিষদে এই তত্ত্বটির এরূপ বর্ণনা আছে,—

"ইন্দ্রিয়সমুদয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ, মহৎ হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ (জগতের বীজস্বরূপ বলিয়া) এবং অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ" (৩য় বল্লী—১০, ১১)।

শ্রুতি মতে ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়ের বিষয় দেহাদি শ্রেষ্ঠ, এখানে দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। বিষয়সকল ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করে এইজন্য শ্রুতি ইন্দ্রিয় হইতে বিষয়কে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। বিষয় ও ইন্দ্রিয়সকল ব্যবহারে আসে মনের অধ্যক্ষতায়, এজন্য বিষয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন সংশয়াত্মক, সঙ্কল্প বিকল্পের অধীন। মন বিষয়কে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত করিলে পর নিশ্চয় করিয়া বিষয় ভোগ সম্ভবপর

হয়, সেজন্য মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি ভোগ সাধনের উপকরণ মাত্র, ভোক্তা স্বয়ং জীব, সুতরাং বুদ্ধি হইতে জীব শ্রেষ্ঠ। সেই জীব এই আত্মা—যাহা সেই ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের স্বামী। কাম দেহীর জ্ঞান-বিজ্ঞান বিনাশ করে, সুতরাং ইহাকে নির্ম্মূল করা প্রয়োজন। (৩—৪১)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

গীতা (পূর্বানুবৃত্তি)

মানবমাত্রেরই কর্ম্ম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চলরূপে বসিয়া থাকিবার উপায় নাই।

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ"।

অথচ কোন্‌টি করণীয়, কোন্‌টি অকরণীয় কর্ম্ম তাহা স্থির করা সুকঠিন। তাই বলা হইয়াছে শাস্ত্র এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। (১৬ অঃ—২৪ শ্লোক)। কিন্তু আচার্য্যের সাহায্য বিনা শুধু শাস্ত্র পাঠে সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে না ; সেজন্য বলা হইয়াছে ;—

"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥* ৪-৩৪

* যোগবাশিষ্ট রামায়ণ হইতে শাস্ত্রের সংজ্ঞা কি এবং মনু সংহিতা হইতে আচার্য্যের লক্ষণ কি তাহা জানা যায় :—

যথা,—অনন্তং সমতানন্দং পরমার্থং বিদুর্বুধাঃ।
স যেভ্য প্রাপ্যতে নিত্যং তে সেব্যাঃ শাস্ত্রসাধবঃ ॥
যোঃ বাঃ মুমুক্ষুপ্রকরণ ৬সঃ ৩৪ শ্লোক।

তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী আচার্য্যের নিকট হইতে প্রণিপাৎ প্রশ্ন ও সেবা দ্বারা সেই জ্ঞান অবগত হও, যে জ্ঞান অবগত হইলে আর মোহ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না, এবং যাহা হইলে তুমি সমস্ত ভূতগণকে অভেদরূপে নিজের আত্মাতে, সেই আত্মা—আমাতে অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষেতে দর্শন করিবে, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীগণ সেই জ্ঞান উপদেশ দিবেন। (৪-৩৪-৩৫)

কিন্তু এই জ্ঞান লাভ জন্য তপস্যার প্রয়োজন।

শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদিষ্ট তত্ত্বসকল শ্রদ্ধা ও তন্নিষ্ঠতার সহিত পালন করা এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে যথোচিতরূপে সংযত করা এই জ্ঞান লাভের উপায়।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
(৪-৩৯)

সাধনার্থীর জন্য এখানে আচার্য্যের উপদেশ ও শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা, জ্ঞাননিষ্ঠা এবং সংযতেন্দ্রিয়তা একসঙ্গে এই তিনটী সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে, কারণ একসঙ্গে এই তিনের আচরণ না হইলে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা খুবই কম। নির্বিচারে গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ অবলম্বন ফলে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিরও যে পতন হয় অনেক সময় তাহা দেখা যায়, সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠাসহকারে তাহা গ্রহণের উপদেশ, *

সমতা অজ্ঞানকৃত বৈষম্যনিবৃত্তি ইহা দ্বারা যে অপরিসীম আনন্দ লাভ হয় তাহা পরমার্থ, যে শাস্ত্র হইতে এই পরমার্থ লাভ হয় তাহা সৎশাস্ত্র।

আচিনোতি চ শাস্ত্রার্থং আচারেস্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাৎ আচার্য্যস্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

যিনি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য সংগ্রহ করেন, লোকদিগকে শাস্ত্রসঙ্গত আচারে স্থাপিত করেন, এবং নিজেও শাস্ত্রোক্ত বিধিসকল প্রতিপালন করেন, তিনি আচার্য্য।

* শ্লোকে যে "পরিপ্রশ্নেন" শব্দের (প্রশ্ন দ্বারা) উল্লেখ আছে তাহা হইতে বুঝিতে হইবে আচার্য্য সেবা ও সৎশাস্ত্র অধ্যয়ন অত্যাবশ্যকীয় হইলেও তাহা

আবার জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিচালিত হইয়া বিপথগামী হয় এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে, এজন্য ইন্দ্রিয়সংযম বিশেষ প্রয়োজন।

এসম্বন্ধে কঠশ্রুতি—

"এই আত্মাকে বেদাধ্যয়ন, মেধা (শাস্ত্র সকলের অর্থধারণ ক্ষমতা) বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা লাভ করা যায় না। ("নায়মাত্মা প্রবচনে লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন") যে দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হয় নাই, যে অশান্ত, অসমাহিত, অসংযতমনা এমন ব্যক্তি জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারে না।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

এই সকল উপদেশ হইতে বুঝা যায় সাধনার্থীর পক্ষে চিত্তসংযম প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহা বলিতে যত সহজ কার্য্যতঃ তাহা নহে।

কেন এরূপ হয়?

উত্তরে বলা হইতেছে মানবের স্বভাব সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের সংমিশ্রণে গঠিত। যাহার মধ্যে যে গুণটি প্রাধান্য লাভ করে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য জন্মগত। ৯ম অধ্যায়ের ১২ ও ১৩ শ্লোকে সত্ত্বগুণপ্রধান

পর্য্যাপ্ত নহে। ইহাদিগের উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন ও তাহা হইতে ভ্রমে পতিত হইবার আশঙ্কা আছে, সুতরাং নির্বিচারে তাহা গ্রহণ করা বিধেয় হইবে না "পরিপ্রশ্ন" দ্বারা তাহা বলা হইয়াছে; এসম্বন্ধে মনুর বিধান প্রনিধানযোগ্য। যথা,—

প্রত্যক্ষং অনুমানঞ্চ শাস্ত্রং বিবিধমাগমম্।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা ॥

যিনি ধর্ম্মের বিশুদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুমান ও বিবিধ শাস্ত্র জানা প্রয়োজন।

প্রকৃতিকে দৈবীপ্রকৃতি এবং তদ্বিপরীত প্রকৃতিকে আসুরী প্রকৃতি বলা হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যায়ে জন্মগত দৈবী বা সাত্ত্বিকসম্পদ কি এবং তদ্বিপরীত আসুরী বা রাক্ষসী সম্পদ কি তাহা বলা হইয়াছে।

দৈবী সম্পদের অভিমুখ হইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে তাহার অভয়, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানযোগে স্থিতি হইয়া থাকে, এবং দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, ঋজুতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন্য, ভূতগণে দয়া, অলোলুপত্ব, মৃদুত্ব, লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানিতা লাভ হয়।* (১৬-১-৩)

আসুরী সম্পদের অভিমুখ হইয়া যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞানতা অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুদ্ধিহীনতা হইয়া থাকে।

এই পৃথিবীতে ও স্বর্গে দেবগণ মধ্যে এমন কোন প্রাণী নাই যে এই তিন গুণ হইতে বিমুক্ত

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ॥ ১৮—৪০।*

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ ইত্যাদি জন্মগত দোষ সকলকে অভিভূত করিয়া কিরূপে দৈবীসম্পদ লাভ করিতে পারা যায় শাস্ত্রে সবিস্তারে তাহার উপায় সকল নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আহারের নিয়ন্ত্রণ তাহার একটী প্রধান ও সহজ উপায়। ইহাদ্বারা রজো ও তমোগুণের ক্ষীণতা সম্পাদন করতঃ সাধনের উপযোগী সত্ত্বগুণকে প্রবল করিতে পারা যায়।

যে সকল আহার আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি-বর্দ্ধক, রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, শরীরে দীর্ঘকাল স্থায়ী, দৃষ্টিপ্রিয় সেই সকল সাত্ত্বিক আহার (১৭—৮)।

* পরোক্ষে পরনিন্দা পৈশুন্য এবং তদ্বিপরীত অপৈশুন্য; অদ্রোহ—পরের কোনরূপ অনিষ্টসাধনে বিমুখতা; অনতিমানিতা—নিজকে বড় বলিয়া গর্ব করা; অতিমানিতা—ইহা তাহার বিপরীত ভাব।

যাহা কটু, অম্ল, লবণ, অতি উষ্ণ, তীক্ষ্ণ রুক্ষ, দুষ্পাচ্য এবং যাহাতে দুঃখ, শোক ও রোগ জন্মে তাহা রাজসিক আহার (১৭—৯)।

যে অন্ন যাতযাম অর্থাৎ একপ্রহর পূর্বে পাক করা হইয়াছে, যাহা নীরস, যাহা সদ্য প্রস্তুত নহে, যাহা উচ্ছিষ্ট, যাহা পঁচাগন্ধযুক্ত তাহা তামসিক আহার (১৭—১০)।

সাধককে সর্বতোভাবে রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিতে হইবে, আহার্য্যের পরিমাণ সম্বন্ধেও বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অধিক আহার ও অনাহার উভয়ই অনিষ্টকর। এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অনুসারে সাত্ত্বিক আহারকে নিয়মিত করিলে সাধনার পরিপন্থী বৃত্তিসকল ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আসিবে।

আহার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে কায় মন ও বাক্যে তপস্যা প্রয়োজন।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ দ্বারা যাঁহাদিগের দ্বিতীয় বার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা দ্বিজ পদবাচ্য। তেমন ব্যক্তির কায়িক তপস্যা হইতেছে,—দেব দ্বিজ প্রাজ্ঞব্যক্তির শুশ্রূষাদি পূজা, শৌচ অর্থাৎ বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিতা, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাচরণ।

সত্য প্রিয় হিতজনক অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস—বাক্ তপস্যা।

মনের প্রসন্নতা সৌম্যত্ব মৌন আত্মনিগ্রহ ভাবশুদ্ধি—এই সকল মানস তপস্যা—(১৭ অঃ—১৪, ১৫, ১৬)।

দেহের উদ্ভব গুণত্রয়ের কার্য্য হইতে (১৪অঃ—২০)। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, তমোগুণ হইতে ভ্রান্তি, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সংসারে যাহা কিছু আছে, সকলই এই তিন গুণের সংমিশ্রণ প্রসূত (১৪ – ১৭)।

* এই সকল জন্মগত গুণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কি অভিমত এস্থলে তাহা প্রণিধানযোগ্য—

গুণত্রয় হইতে সমুদ্ভূত এই যে সংসাররূপী দৃঢ়মূল বৃক্ষ অনাশক্তিরূপ সুদৃঢ় শস্ত্রে ইহাকে ছেদন করিতে হইবে (১৫অঃ ৩)।

("অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলং অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েণ ছিত্বা)" রজো ও তমোগুণের নির্য্যাতন দ্বারা সত্ত্ব গুণের বৃদ্ধিসাধন তাহার উপায় ; তজ্জন্য শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য অর্জ্জন নিতান্ত প্রয়োজন (১৮ অঃ—৪২)।

Dr. Leighton ভ্রূণতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সুবিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"Man is composed partly of characteristics which he derived from pre-existing germ cells and over the possession of which he has no control whatsoever. Be they good, bad or indifferent, these characteristics are his from his ancestry, in virtue of his inheritance. The possession of these characteristics is to him a matter of neither blame, nor praise, but of necessity. They are inevitable.

ভাবার্থ :—মানব একটী মিশ্রজীব। তাহার জন্মের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান যে সকল জীবাণু কোষ হইতে তাহার উৎপত্তি, সেই সকল জীবাণু কোষ বহুল পরিমাণে তাহার চরিত্রের নিয়ামক হইয়া থাকে ; এবং এই সকলের উপর তাহার কোনরূপ কিছু করিবার থাকে না। এই সকল গুণ ভালই হউক, আর মন্দই হউক, উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে ইহারা তাহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে অনুক্রামিত হইয়াছে। এই সকলের জন্য সে নিজে কোনরূপ প্রশংসা বা নিন্দাভাজন নহে। ইহারা তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী গুণ বা দোষরূপে গণ্য।"

ইহা হইতে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে সমাগত এই বিশেষত্বগুলির প্রভাব এতই প্রবল হয়, তবে কি দৈহিক গঠন, কি মানসিকবৃত্তি এক বংশ বা জাতীর মধ্যে সকলেরই তো একরূপ হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় না কেন ?

বিজ্ঞান ইহার এরূপ উত্তর দেয় :—

নানা কারণে এই সাদৃশ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। যে জৈবিক পদার্থ (protoplasm) মধ্যে ভাবী সন্তানের আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের বীজ

শম অন্তরিন্দ্রিয় ও দম বাহ্যেন্দ্রিয় নিবৃত্তির উপায়।

অপরে অবিরত তাড়না করিলেও সহিষ্ণুতা অবলম্বনপূর্ব্বক অবিকৃত চিত্তে স্থিতি ক্ষমার কার্য্য।

শাস্ত্র হইতে যে বিষয় জানা যায় তাহার সত্যত্বে নিশ্চয়তা আস্তিক্য; বিজ্ঞান সাক্ষাৎ অনুভূতি।

নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে যত্নপূর্ব্বক পরিপোষণ ও রক্ষা করা ভ্রূণের কার্য্য, ইহা তিনটী বাহিরের ব্যাপারের উপর নির্ভর করে।

(১) জননীর পক্ষে জঠরস্থ ভ্রূণের পুষ্টিকারক খাদ্য সরবরাহ করিবার ক্ষমতা।

(২) জননী-দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচালনা।

(৩) কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা হইতে ভ্রূণের পরিপুষ্টিতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া।

জননীর যথোচিতরূপে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং তাহাদ্বারা নিজের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার উপর ভ্রূণের দেহকে সবল ও সতেজ করিয়া নির্ম্মাণ করিবার শক্তি নির্ভর করে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও তাহার দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শরীরের পরিচালনা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা আবশ্যক হয়। এই সকলের অভাব হইলে কেবল পুষ্টিকর আহার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

জননীজঠরে অবস্থানকালে ভ্রূণ যদি কোনরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি কোন কারণে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের স্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবার ব্যাঘাত ঘটে, তবে ভ্রূণস্থ শিশুর আকার ও প্রকৃতিগত রূপান্তর ঘটিতে পারে।

এক পরিবারস্থ সন্তানদিগের মধ্যে যে আকার ও প্রকৃতিগত এত সব অসদৃশতা দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে এই তিনটী তাহার কারণ। আরম্ভে একই প্রকৃতির বীজ সকলের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত থাকিলেও যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উত্তেজনার ভিতর (Environments, and stimuli) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ইহাদিগের জীবন বর্দ্ধিত হয় সেই সকলের তারতম্যতা হেতু স্বভাব, প্রকৃতি ও আকারগত এত সব পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিগত যতগুলি বৈশিষ্ট্য জৈবপদার্থে

সাধন সম্পর্কে এই শ্লোকে জ্ঞান অতিব্যাপক অর্থ বহন করে—ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১১শ শ্লোকে ইহার সংজ্ঞা করিতে গিয়া যে সকল লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা এই,—অমানিত্ব, দম্ভশূন্যত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, ঋজুতা, আচার্য্য সেবা, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে বৈরাগ্য, নিরহঙ্কার, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন, অনাসক্তি, পুত্র, দারা ও গৃহাদিতে আত্মভাবের অভাব, ইষ্ট বা অনিষ্ট উপস্থিত হইলে চিত্তের সমতা রক্ষা, অনন্যযোগে ঈশ্বরে অব্যভিচারিণী ভক্তি,

(germ plasm) নিহিত, ইহারা মজ্জাগত, এবং সর্বতোভাবে আমাদিগের ইচ্ছা বা শক্তির অতীত। আবার আরো কতকগুলি এমন আছে, যাহারা অনুকূল বা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া গড়িয়া উঠে। চেষ্টা দ্বারা ইহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছানুরূপ গঠন করিয়া তুলিতে পারা যায়।

এই দুই কারণ হইতে পৃথক আর একটী ব্যাপার রহিয়াছে, যাহা অতীব বিস্ময়কর এবং যাহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই ; যেমন কখন কখন কোন এক অচিন্তনীয় প্রকারে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ পায়, কেহ অসাধারণ স্মরণশক্তিবিশিষ্ট হয়, আবার কাহারো বা কোনরূপ চেষ্টা বা গবেষণা ব্যতীত শাস্ত্রবিশেষে অসাধারণ কৃতীত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিভার বিকাশ geniusকে ইহার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ লম্ব্রজো মতে—A man of genius—this apparently highest product of the race—is in reality not a culminant but an aberrant manifestation.

তিনি আরো বলেন :—

A man of genius must be classed with criminals and lunatics, as persons in whom a want of balance or completeness of organization has led to an overdevelopment of one side of their nature, helpful or injurious to other men as accident may decide.

জনকোলাহলশূন্য স্থানপ্রিয়তা, ভোগ-বিলাস রত আত্মজ্ঞানবিমুখ লোকদিগের প্রতি অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠত্ব ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন দর্শনে স্থিরমতি। এই সমস্ত জ্ঞানের ফল, তাহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। ভাষ্যকারদিগের মধ্যে কেহ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানব চরিত্রের এই সকল বিস্ময়কর জটিলতার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—

জননী-জঠরে অবস্থানকালে ভ্রূণকে পরিপুষ্ট ও রক্ষা করিবার জন্য একদিকে যেমন অপূর্ব কৌশলসকল অবলম্বিত হইয়াছে, অপর দিকে ভবিষ্যৎ জীবনে যাহা অপরিত্যক্ত হইবে তেমন কতগুলি বিশিষ্টতা বা বৃত্তি ভ্রূণাবস্থাতেই বদ্ধমূল হইতেছে এবং যে সকল জটিলতার সমষ্টি লইয়া তাহাদের প্রকাশ তাহারা এই তিন শ্রেণীর কোন না কোন একটির অন্তর্গত ;—

(১) কতগুলি উত্তরাধিকারীত্বসূত্রে নিজের পিতৃমাতৃধারা হইতে প্রাপ্ত।

(২) কতগুলি আপনা হইতে উপজাত, যাহার নিশ্চিত কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

(৩) কতগুলি স্বোপার্জ্জিত।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর বিশেষত্বগুলির উপর ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক মানবেরই এমন শক্তি আছে যে, অনুকূল অবস্থার মধ্যে স্থাপিত হইলে চেষ্টা ও অধ্যবসায়বলে তাহার উন্নতির পথের পরিপন্থী সর্বপ্রকার বাধা অতিক্রম করিয়া নিজের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে। বস্তুতঃ মানসিক ও নৈতিক-জীবনের দিক দিয়া যে সকল বিশেষত্ব তাহারা সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আধ্যাত্মিক গুণসমূহ অনেক পরিমাণে স্বোপার্জ্জিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সকল গুণ পশু-জীবন হইতে মানব-জীবনকে পৃথক করিতেছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই মানব তাহার শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা অর্জ্জন করিতে পারে, তথাপি প্রথম শ্রেণীর অদৃষ্টপূর্ব শক্তিগুলির প্রভাবও উপেক্ষণীয় নহে ; তাহাদেরও সার্থকতা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের এই যে অপূর্ব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, গীতাকার দৈবী ও আসুরী সম্পদের অভিমুখ হইয়া জন্ম দ্বারা এই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ আমাদের শাস্ত্রগুলিতে বর্ণিত জটিল কর্ম্মফল তত্ত্বের মীমাংসার সূত্র এই বিশ্লেষণ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেহ মনে করেন, ইহাদিগের একটির অভাব হইলেই জ্ঞানের ব্যত্যয় ঘটে।

জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞেয়কে জানিবার প্রকৃত উপায় লাভ হইলেই জ্ঞেয় বস্তু কি তাহা জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১২ হইতে ১৭ শ্লোকে তাহার এরূপ নির্দ্দেশ রহিয়াছে ;—

পরব্রহ্ম অনাদিমৎ, সৎ ও অসৎ এই উভয় সংজ্ঞারই বাহিরের বস্তু অর্থাৎ কার্য্যকারণাত্মক এই যে বিশ্ব তিনি ইহার অতীত ; এবং যে হেতু তিনি কার্য্য ও কারণরূপ অবস্থাদ্বয় বিরহিত সেই হেতু সৎ ও অসৎ শব্দ দ্বারা তাঁহার স্বরূপ নিরোপিত হইতে পারে না। সর্বত্র তাঁহার পানিপাদ, সর্বত্র তাঁহার নেত্র শির মুখ, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, ত্রিলোকের সমুদয় আবৃত করিয়া তিনি স্থিতি করিতেছেন, তিনি সমুদয় ইন্দ্রিয়গুণের প্রকাশক, অথচ সমুদয় ইন্দ্রিয়বর্জ্জিত, অনাসক্ত অথচ সকলের ধারয়িতা, নির্গুণ অথচ গুণভোক্তা অর্থাৎ সত্বাদি গুণের পালক। তিনি ভূতগণের অন্তরেও বটেন, বাহিরেও বটেন, দূরস্থও বটেন নিকটস্থও বটেন। সূক্ষ্মত্ব বশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়, অবিভক্ত হইয়াও সেই জ্ঞেয় ভূতগণেতে বিভক্তের ন্যায় অবস্থিত, তিনিই ভূতগণের উৎপত্তি পোষণ ও সংহারের কারণ, তিনি জ্যোতির জ্যোতি, সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি তাঁহাকে আলোকিত করে না, তিনি জগতাতীত, অন্ধকারের অতীত—তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনি জ্ঞানগম্য—সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত (পরমাত্মা)।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি যে বলিয়াছেন, আত্ম দ্রষ্টব্য, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন (হৃদিসর্বস্যধিষ্ঠিতং) ইহাতে তিনি যে সাধকের অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় তাহা বলা হইল।

মুণ্ডকশ্রুতি আরো পরিষ্কার ভাষায় বলিলেন,

সত্য, তপস্যা, সম্যগ্‌জ্ঞান ও নিত্যব্রহ্মচর্য্য দ্বারা তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা।
সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্॥

তাহার পর বলা হইয়াছে,--

অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ম্ময়ো হি শুভ্রো।
যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥ ৩ (১) ৫

এখানে যে ক্ষীণদোষাঃ যতয়ঃ—"নির্ম্মলচিত্ত ও সর্বপ্রকার বিকারশূন্য যতিগণ" বাক্যটির প্রয়োগ হইয়াছে ইহা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। বস্তুতঃ এই অবস্থা প্রাপ্তির পূর্বে তিনি সাধকের জ্ঞানগম্যই হইতে পারেন না।

সাধকের এই অবস্থা লাভ হইয়াছে কিনা তাহার পরীক্ষা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ হইতে ৫৮ এই চারিটি শ্লোকে রহিয়াছে। তাহা এই ;—

তিনি মনোগত সমুদয় কামনা পরিত্যাগপূর্বক আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট কিনা ?

তিনি নিয়ত আত্মমননশীল হইয়া দুঃখ উপস্থিত হইলে তাহাতে অনুদ্বিগ্নমনা এবং সুখের প্রতি বিগতস্পৃহ হইয়াছেন কিনা এবং আসক্তি ভয় ক্রোধ পরিশূন্য হইতে পরিয়াছেন কি না ?

তিনি সর্বত্র মমতাশূন্য হইতে পারিয়াছেন কি না ; শুভ লাভে তুষ্টি নাই, অশুভ লাভেও দ্বেষ নাই এই অবস্থা তাঁহার লাভ হইয়াছে কি না ?

কূর্ম্ম যেমন আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ সম্যক্প্রকারে ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লয়, তিনিও বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে তদ্রূপ প্রত্যাহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা।

এই সকল অবস্থাকে স্থিতপ্রজ্ঞতা সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই স্থিতপ্রজ্ঞা ভূমিতে আরূঢ় সাধকের নিকট সকল অবস্থাই সমান, শুভই আসুক, আর অশুভই আসুক, অনুকূল সুখকর বিষয় উপস্থিত হউক, অথবা তদ্বিপরীত প্রতিকূল

দুঃখকর বিষয় উপস্থিত হউক, তিনি তাহাতে আনন্দও করেন না ধিক্কারও করেন না, স্তুতি নিন্দা সকলই সমান। চিত্তের এতাদৃশ নির্বিকার অবস্থায়, বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণই হউক বা চণ্ডালই হউক, গো, হস্তি বা কুক্কুরই হউক, তিনি তখন সকল প্রাণীকে সমান দৃষ্টিতে দেখেন। স্থিতপ্রজ্ঞতালব্ধ ব্যক্তির ইহা এক বিশেষ লক্ষণ। এই সমদর্শিতা প্রাপ্তি হইলে সাধক পরম্ শান্তির অধিকারী হন। এই অবস্থায় তাহার ব্রহ্মে স্থিতি-লাভ হইয়া থাকে।

"বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি। ২অঃ—৭১

স্থিতপ্রজ্ঞতা আত্মার স্বরূপাবস্থায় স্থিতি বা ব্রহ্মের স্বরূপের সহিত একতাবশতঃ ব্রহ্মপ্রাপক স্থিতি বুঝায়। গীতার ব্রাহ্মীস্থিতি এবং ধর্ম্মপদে বর্ণিত বুদ্ধের ব্রহ্মে বিহার একই অবস্থা, সর্ব ভূতে সমভাবাপন্ন শান্ত অবস্থা। এই অবস্থায় স্বরূপের একতাবশতঃ পরব্রহ্মের সঙ্গে যোগ হয়, কিন্তু ইহাতে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের সহিত রহিয়াছে এরূপ অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি যাহাকে বিজ্ঞান সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার উদয় হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ সাধন-পথের একটি প্রধান সোপান, লক্ষ্যে উপনীত হইতে আরো উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ প্রয়োজন। এই ভূমি বড়ই বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল। শুধু শাস্ত্রজ্ঞান ও আচার্য্যের উপদেশ ইহার জন্য পর্য্যাপ্ত নহে।

তাই কঠ শ্রুতি বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"

এজন্য বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে ইহার সঙ্কেত শিক্ষা প্রয়োজন, শ্রুতি তাই সাধনার্থীকে বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত"।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপের একতা স্থাপন করিয়া এবং সংসারে পুনরাগমনের নিবৃত্তি ও অপরোক্ষ ব্রহ্ম দর্শনই সাধনার চরম লক্ষ্য ইহা স্থির রাখিয়া এই সাধনায় সফলকাম হইতে হইলে পথের বিঘ্নসকলকে কিরূপে দূর করিতে হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়।

কর্ম্ম বন্ধনের হেতু, প্রাকৃতিক গুণ হইতে কর্ম্মের উদ্ভব, পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নাই যে প্রাকৃতিক গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত (১৮ অঃ—৪০)। সুতরাং শরীরধারীর পক্ষে সর্বতোভাবে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব। (১৮ অঃ—১১)

ইষ্ট, অনিষ্ট, ইষ্টানিষ্টমিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল। আসক্তি ও ফলত্যাগপূর্বক কর্ত্তব্যবোধে বিধিসিদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে ইষ্টানিষ্ট ও অনিষ্ট ফলের আশঙ্কা নাই। বিধিসিদ্ধ এই সকল নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়; অজ্ঞানজনিত কার্য্য ও কর্ত্তৃত্বাদির অভিমান না থাকায় সাধকের নৈষ্কর্ম্ম্য যোগ-সিদ্ধ-ত্যাগী ও সন্ন্যাসীর অবস্থা লাভ হয়। বেদান্তবাক্যসমুৎপন্ন ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান লাভান্তর তিনি ধ্যানযোগাবলম্বনে অপরোক্ষ জ্ঞান লাভে সমর্থ হন। কিন্তু এই সাধনায় বিশেষজ্ঞের সাহায্য সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়। কঠ-শ্রুতি সাধনার এই পথকে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ক্ষুরের শাণিতধার যেরূপ দুরতিক্রমনীয়, এই পথকেও পণ্ডিতগণ তদ্রূপ দুর্গম বলিয়াছেন।

মুণ্ডক শ্রুতিতেও বলা হইয়াছে—

"জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ত্ব-

স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"॥ ৩য় বল্লী, ১ম অঃ, ৮।

জ্ঞানশুদ্ধি দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া সাধক ধ্যানযোগে নিরবয়ব পরমাত্মাকে দর্শন করেন।

এই শ্রুতিতে আরো বলা হইয়াছে, "কর্ম্ম দ্বারা নিত্য পদার্থ লাভ হয় না, ইহা জানিতে পারিয়া সাধক বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্বক সমিৎহস্তে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট উপস্থিত হইবেন। গুরু যদি তাহাকে সম্যগ্‌রূপে প্রশান্তচিত্ত ও শমগুণান্বিত মনে করেন, তবে তাহার নিকট এই তত্ত্ব জ্ঞাপন করিবেন। (১ম—২ অঃ —১২, ১৩)।

শ্রুতি নিষ্কল পরমাত্মাকে দর্শনের উপায়রূপ ধ্যানযোগের যে উল্লেখ করিয়াছেন, গীতার ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এই সকলের উপায় ও লক্ষণের বর্ণনা আছে।

সঙ্কল্প হইতে কামনাসকলের উদ্ভব হয়, তাই ইহাদিগকে নিঃশেষরূপে পরিহারকরতঃ মন দ্বারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়-গুলিকে সংযত করিয়া ধৈর্য্যসহকারে বশীভূত হইয়াছে যে কর্ত্তব্য নির্ণয়াত্মক বুদ্ধি, তাহার সাহায্যে মনকে আত্মাতে স্থাপনপূর্বক ধীরে ধীরে অভ্যাসক্রমে আত্মাতে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে হইবে, অপর কোন চিন্তাই থাকিবে না (২৪, ২৫)।

কোনরূপ বলপ্রয়োগে ইহা হইবে না।

কঠ-শ্রুতি বলিতেছেন,—

"প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বাক্যকে মনেতে সংযত করিবে, সেই মনকে জ্ঞানরূপী আত্মাতে (অর্থাৎ বুদ্ধিতে) সংযত করিবে, বুদ্ধিকে মহান্ আত্মাতে (জীবাত্মাতে) সংযত করিবে এবং এই জীবাত্মাকে শান্ত (অর্থাৎ বিকারশূন্য) পরমাত্মাতে সংযত করিবে (৩য় বল্লী—১৩)।

নির্বাত স্থানে অবস্থিত দীপশিখা যেমন কোনরূপ বিচলিত হয় না তদ্রূপ চিত্ত-সমাধানপূর্বক আত্ম-সমাধানযোগে সমারূঢ় যোগীর চিত্তও কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না (১৯)।

যোগাভ্যাস দ্বারা এইরূপে চিত্তবৃত্তিসকল নিরোধ হইলে সাধক আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া আপনাতে পরিতুষ্ট হন এবং একমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ তাহা উপলব্ধি করেন এবং তাহাতে স্থিত হইয়া আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। তখন তিনি দেখিতে পান ইহা অপেক্ষা অধিক লাভের আর কিছুই নাই। সেই সময় দুঃখের সহিত তাহার সমস্ত সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (৪০—২৩)।

এই পরমার্থ লাভে সাধারণতঃ মানব এরূপ বিমুখ কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য গীতাতে বলা হইয়াছে,—

গুণত্রয়ের সংঘাত হইতে যখন ইন্দ্রিয় মনাদি সমন্বিত দেহের উদ্ভব, তখন মনের চাঞ্চল্য স্বাভাবিক। মন ইন্দ্রিয়গুলিতে বিক্ষোভ উপস্থিত করিবেই, সুতরাং, বায়ুকে ধরিয়া রাখা যেরূপ দুষ্কর, মন নিগ্রহ করাও তদ্রূপ দুষ্কর (৬ অঃ—৩৪)।

পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে, চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা যে নিতান্তই সুকঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অভ্যাসও বৈরাগ্য যোগে ইহাকে বশে আনা যাইতে পারে।* ফোঁটা ফোঁটা জল বিন্দুপাতে প্রস্তর বক্ষে যেমন গর্ত্তের সৃষ্টি করে সেইরূপ একই প্রতীতির পুনঃ পুনঃ অভ্যাস,—যথা, আত্মা বা পরমাত্মাতে চিত্ত স্থাপনরূপ অভ্যাস দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু বাসনা এমনই দুর্নিবার যে ইহা নির্ম্মূল না হওয়া পর্য্যন্ত এই অভ্যাস সাধনেও পরম বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। বাসনা পরিত্যাগের পক্ষে বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠ উপায়। অনুগীতাতে উক্ত হইয়াছে—আত্মাতে চিত্ত স্থাপন রূপ অভ্যাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি

* অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয় পাতঞ্জল দর্শন ১ম পাদ ১২ সূত্র।

সকলের নিলয় সাধন হইলে পর—মুঞ্জা হইতে কাশ তৃণকে যে প্রকার পৃথক করিয়া দেখা যায়, যোগযুক্ত ব্যক্তি সেইরূপ দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক করিয়া দেখেন (১৯ অঃ—২২ শ্লোক)।

সংযতমনা যোগী এইরূপে সর্বদা আত্ম সমাধান করতঃ ব্রহ্মে স্থিতিরূপ নির্বান-প্রধান শান্তি প্রাপ্ত হন

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ (৬অঃ—১৫)*

যোগাভ্যাসে এইরূপে চিত্ত সমাহিত হইলে সর্বত্র সমদৃষ্টি জন্মে। সাধক আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করেন। তখন তাহার অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, ব্রহ্ম তাহার নিকট অদর্শন হন না। (৬ অঃ—২৯, ৩০)।

ভাষ্যকার শ্লোকের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

চিত্তরূপ নদী দুই দিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—একটী কল্যাণের দিকে, অপরটী পাপের দিকে। যে বিবেক কৈবল্যের পূর্ববর্ত্তী কারণ, তাহার নিম্ন দিয়া যেটী বহিতেছে, তাহা হইতে কল্যাণ প্রবাহিত হয়, যে অবিবেক সংসারের পূর্ববর্ত্তী কারণ তাহার নিম্ন দিয়া যেটী প্রবাহিত হইতেছে, তাহা হইতে পাপ প্রবাহিত হয়।

বিবেক ও দর্শনের অভ্যাসে কল্যাণ স্রোত উদ্‌ঘাটিত হয়, বৈরাগ্যে বিষয়ের স্রোত নিরুদ্ধ হয়—অতএব চিত্তবৃত্তি নিরোধ এই উভয়ের অধীন।

মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পাতঞ্জল যোগ দর্শনে উল্লেখিত যোগের বিভিন্ন অবস্থার আভাস দিয়াছেন—

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানম্" ইহা ঐ দর্শনের একাগ্রভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি জ্ঞাপন করিতেছে।

"নিয়তমানস" ইহা সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলস্বরূপ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নিরোধ ভূমি।

"শান্ত" ইহা নিরোধ সমাধি হইতে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহার ফল স্বরূপ "প্রশান্ত বাহিতা" নির্দ্দেশ করে।

প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধই সকল প্রকার বৈষম্যের হেতু। চিত্ত এই সম্বন্ধ বিমুক্ত হইলে ইহাকে সমাহিত হইয়াছে বলা যায়। যিনি যোগযুক্ত হইয়াছেন, তিনি প্রকৃতি হইতে মুক্ত, সুতরাং এক জ্ঞানাকারে অবস্থিত হইয়া তিনি আপনার আত্মাকে সকল ভূতের সমানাকার এবং সমুদয় ভূতকে আপনার সমানাকার দেখেন এবং ইহা দ্বারা তিনি "তাহার নিকট আমি অদর্শন হই না ; আমার নিকট সে অদর্শন হয় না"রূপ সাধনার স্তরে আরোহণ করিলে তাঁহার অপরোক্ষ ব্রহ্ম দর্শন লাভ হয়—অর্থাৎ তাঁহার আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে নিরন্তর সাক্ষাৎকার যোগ লাভ হইয়া থাকে।

"নির্বানং পরমাং" ইহা দ্বারা ধর্ম্মমেঘ নামা সমাধি হইতে যে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হয় সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভের উপায় উক্ত হইয়াছে।

"মৎ সংস্থং" আমাতে স্থিতি। ইহা দ্বারা উপনিষদোক্ত কৈবল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,

সর্বপ্রকার চাঞ্চল্য চলিয়া গেলে চিত্ত যখন একাগ্রভাবে কোন বিষয়ে অবস্থান করে, তখন সেই একাগ্রতার অবস্থাতে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হয়। সেই চিন্তনীয় বিষয়ের সঙ্গে একাকার হইয়া মানসিক বৃত্তিসকলের সম্পূর্ণরূপ নিরোধ ঘটিলে, সেই অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হয়। তাহার ফল প্রশান্তবাহিতা ; ইন্ধন সম্পূর্ণরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে অগ্নি যেরূপ প্রশমিত হয় তদ্রূপ চিত্তচাঞ্চল্য সম্পূর্ণরূপ দূর হইয়া চিত্তের যে অবস্থা হয় তাহা প্রশান্তবাহিতা। চিত্তের এই অবস্থায় বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান উদিত হয়। চিত্ত সর্বপ্রকার বাসনা পরিশূন্য হওয়ায় সেই আত্মজ্ঞানে বিবেক পরিপুষ্টি লাভ করে। বিবেকপরিপুষ্টি হইতে ধর্ম্মমেঘ নামা সমাধি উপস্থিত হয়। সমুদয় জানিবার উপযুক্ত ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া উহা বর্ষণ করে, অথবা জীব ও ব্রহ্মের একতা প্রত্যক্ষ করা রূপ ধর্ম্ম সিঞ্চন করে এজন্য তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের হেতু ধর্ম্মমেঘ। তদনন্তর জ্ঞান সর্বপ্রকার আবরণশূন্য হয়। জ্ঞান আবরণশূন্য হইলে পর চিচ্ছক্তির স্বরূপ মাত্র অবস্থানরূপ কৈবল্য সিদ্ধ হয়।

মধুসূদন সরস্বতী মতে উপনিষদ্ সম্মত ব্রহ্মেস্থিতি এবং এই কৈবল্য একই অবস্থা জ্ঞাপক।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সর্বতোভাবে প্রয়োজনীয়, অথচ ইহা বল প্রকাশের কার্য্য নহে। ইন্দ্রিয়গুলি গুণসমুৎপন্ন, আহার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সাধনার বিঘ্নউৎপাদনকারী রজো ও তমোগুণকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি সাধন করা যাইতে পারে বটে কিন্তু অভিষ্টসিদ্ধির জন্য তাহা পর্য্যাপ্ত নহে, সেজন্য বিশেষ কুশলজ্ঞ আচার্য্যের সহায়তা প্রয়োজন।

যোগসাধনায় চিত্তকে ধ্যানের অনুকূল অবস্থায় আনয়ন করিবার জন্য আসনস্থাপন এবং কিরূপে তদুপরি উপবিষ্ট হইয়া যোগসাধনা করিতে হইবে, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১১শ হইতে ১৪শ শ্লোকে তাহার উপদেশ রহিয়াছে। এই যোগাসন যে স্থানে স্থাপন করা হইবে, তাহা পবিত্র স্থান (শুচৌ দেশে) হওয়া চাই, ইহা অতি উচ্চও হইবে না, অতি নীচুও হইবে না। অগ্রে কুশাসন, তদুপরি চর্ম্ম এবং তদুপরি চেলখণ্ড স্থাপন করিতে হইবেক (চেলাজিন কুশোত্তরং)। যোগসাধনশীল এইরূপ আসনে দেহ মস্তক ও গ্রীবা সোজা রাখিয়া উপবিষ্ট হইবেন, এবং নিশ্চল ভাবধারণপূর্বক অপর কোন দিকে না তাকাইয়া স্থির হইয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবেন, এবং প্রশান্তচিত্ত ও নির্ভয় (বিগতভীঃ) হইয়া ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতিপূর্বক মনঃসংযমকরতঃ অন্তর্যামী পুরুষে চিত্ত সমাধান করিতে হইবে (মচ্চিত্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ)।

আসন স্থাপন ও কিরূপে তাহাতে উপবেশন করিতে হইবে তাহার যে বিধি এখানে উক্ত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যোগ-শাস্ত্রানুযায়ী প্রাণায়ামের কথা এখানে বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রাণায়াম ক্রিয়ার যে বর্ণনা আছে, ইহা তাহারই অনুসরণ করিতেছে।

তথায় বলা হইয়াছে, সমতল, পবিত্র, শর্করা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড), বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত, শব্দ, জল ও আশ্রয় অর্থাৎ

কুটীরাদি দ্বারা মনের অনুকূল, চক্ষুর পীড়াদায়ক নহে এমন, এবং গুহা ও বায়ুচ্ছ্বাসশূন্য কুটীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে চিত্তকে পরমাত্মাতে সংযোজিত করিতে হইবে (২ অঃ—১০ শ্লোক)। তদনন্তর কি উপায় অবলম্বনে মনঃসংযোগ হইবে তাহা বলা হইয়াছে। স্থির ভাবাপন্ন হইয়া প্রাণবায়ুকে সংযমন করতঃ মন নিঃশক্তি হইলে নাসিকা দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস করিবেক। জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় মনকে ধারণ করিবেক (২—১০)।

মৃত্তিকা দ্বারা মলিনীকৃত ধাতুখণ্ড উত্তমরূপে ধৌত করিলে পুনরায় যেনন উজ্জ্বল দেখায়, যোগের এই সকল প্রক্রিয়া হইতে সাধকও তদ্রূপ আত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। তদনন্তর সেই দীপস্থানীয় আত্মতত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শন করতঃ জন্মরহিত ধ্রুব ও সর্ববিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হয়েন (২—১৫)।*

গীতামতে একমাত্র সংশিতব্রত (তীক্ষ্ণ ব্রতধারী দৃঢ় সঙ্কল্প) যত্নশীল ব্যক্তিরাই এই যোগের অধিকারী। যোগ প্রণালীর এরূপ বর্ণনা রহিয়াছে—

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে, প্রাণে অপানকে হবনকরতঃ প্রাণ ও অপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকেন। অপরে আহার সংযমপূর্ব্বক প্রাণকে প্রাণেতে হবন করেন। সতত একাকী

---

* ঋগিগণ যে প্রাচীন ঋগ্বেদের সময়ই যোগসাধন প্রণালী অবগত ছিলেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে, যথা, ১—১৬৪—৪৫।

"চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি **তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।**
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেংগয়ংতি তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদংতি॥

চারি প্রকার বাকের তিনটি লুক্কায়িত থাকে, প্রকাশিত হয় না, একমাত্র মেধাবী ঋত্বিকেরা তাহা অবগত আছেন। তন্ত্র শাস্ত্রের ভাষায় ইহারা পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা। একমাত্র যোগাবলম্বন দ্বারা তাহাদিগকে জানা যায়।

নির্জ্জনে স্থিতি করিয়া চিত্ত ও দেহ সংযমপূর্বক নিরাকাঙ্ক্ষ ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া যোগাভ্যাস করিতে হয় (৬ অঃ—১০)।

যোগের দুইটি প্রণালীর বিষয় এখানে উক্ত হইল। ইহার একটি অপানে প্রাণকে ও প্রাণে অপানকে হবনপূর্বক উভয়ের গতিরোধ করিয়া প্রাণায়াম; অপরটি আহার সংযম দ্বারা প্রাণকে প্রাণে হবন করা।*

* মহাভারত শান্তিপর্ব ১৯৫ অধ্যায়ে ইহার এরূপ বর্ণনা আছে—

"ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তি শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে মনোমধ্যে আকর্ষণকরতঃ উহাদের সহিত উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্থির করিবেন। পঞ্চ ইন্দ্রিয় মনের পাঁচটি দ্বার। ইহাদিগের সহায়তায় চঞ্চল মন সর্বদা বিষয়মগ্ন থাকে। অতএব মনকে প্রযত্নসহকারে ধ্যানমার্গে সমাহিত করা প্রয়োজন। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীবের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মন এইরূপে নিরুদ্ধ হইলে মেঘ মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় বিষয়-বাসনার স্ফুরণ হইতে থাকে। পত্রস্থ সলিলবিন্দু পত্রোপরি অবস্থান করিয়াও অতিশয় চঞ্চল থাকে, সেইরূপ মন ধ্যানমার্গে অবস্থান করিলেও ইহার চঞ্চলতা একেবারে দূর হয় না। এই সময় ধ্যানযোগ-কৌশলসম্পন্ন ব্যক্তির আলস্য পরিত্যাগপূর্বক মৎসর বিবর্জ্জিত হইয়া ধ্যানপ্রভাবে পুনর্বার মন সমাধান করা কর্ত্তব্য।

যোগী ব্যক্তি যোগানুষ্ঠান আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার বিচার, বিতর্ক ও বিবেক নামে সমাধি উপস্থিত হয়। মন নিতান্ত কাতর হইলেও একাগ্রতা পরিহার কর্ত্তব্য নহে। যোগী ব্যক্তির যোগ বিষয়ে শিথিলতা প্রদর্শন কোন-ক্রমেই বিধেয় নহে। ভস্ম ও শুষ্কগোময়রাশিতে জল নিক্ষেপ করিবামাত্র কদাপি সম্পূর্ণরূপ আর্দ্র হয় না, পুনঃ পুনঃ জল সেক দ্বারা যেমন উহা ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমশঃ বশীভূত করা আবশ্যক।

এইরূপে মন ও ইন্দ্রিয়সকলকে ধ্যানপথে অবস্থাপনপূর্বক ক্রমে ক্রমে প্রসন্ন করিতে পারিলে অবশেষে উহাদের ও আত্মার সম্পূর্ণরূপ শান্তি লাভ হয়। যোগীগণ যোগপ্রভাবে যেরূপ সুখ লাভ করিয়া থাকেন, দৈব ও পুরুষকার দ্বারা কদাপি সে সুখ লাভ সম্ভবপর নহে।

প্রাণ অপান, ব্যাণ, সমান ও উদান এই পাঁচটি প্রাণবায়ু। অপান বায়ু অধোগামী, প্রাণ বায়ু উর্দ্ধগামী।

বাহির হইতে শ্বাস গ্রহণপূর্বক ভিতরে ধারণ করা হইতেছে—অপানে প্রাণকে হবন করা; শ্বাস বহির্গত করা হইতেছে অধোগামী অপান বায়ুকে উর্দ্ধগামী প্রাণ বায়ুতে হবন করা। এই উভয় বায়ুর গতিরোধকে বলা হয় প্রাণ ও অপানকে নাসিকার মধ্যে সমানভাবে বিচরণ করিতে দেওয়া।

যোগার্থীর নিরন্তর মুক্তাবস্থা কখন লাভ হয় ৫ম অধ্যায়ের ২৭ শ্লোকে তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া প্রাণ অপানের নাসাভ্যন্তরে এরূপ স্থিতি হয় বলা হইয়াছে (প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ)।*

শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিরাম প্রাণায়াম।

বাহিরের বায়ুকে ভিতরে গ্রহণ করা শ্বাস, ভিতরের বায়ুকে বহিঃ নিঃসরণ করা প্রশ্বাস—এই উভয় গতির অভাব প্রাণায়াম। প্রাণায়ামের বাহ্য ব্যাপার রেচক, আভ্যন্তর ব্যাপার পূরক, ভিতরে ধারণ বা স্তম্ভন ব্যাপার কুম্ভক।

বিশেষ কুশলজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাণায়াম সাধনায় নানারূপ অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, সুতরাং ইহাকে অতি দুর্গম পথ বলা হইয়া থাকে। প্রধাণতঃ সংসার ত্যাগী ব্রহ্মচারীর জন্যই এই বিধান, গীতাশাস্ত্রের এরূপ অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

দ্বিতীয় পন্থা আহার সংযমনপূর্বক প্রাণবৃত্তির বিরুদ্ধ পথে গতি অবরুদ্ধ করা—ইহাও এক প্রকার প্রাণায়াম, বাহ্য ও অভ্যন্তর ব্যাপার নিরপেক্ষ হইলে ইহাতে স্তম্ভনরূপ গতি বিরাম হইয়া থাকে, যোগদর্শনের ২য় পাদের ৫১ সূত্রে এরূপ বলা হইয়াছে।

---

* পাতঞ্জল যোগ-দর্শনে ২ পাঃ, ৪৯ সূঃ।

বাহ্য ব্যাপার ও অভ্যন্তর ব্যাপার (রেচক ও পূরক) এই দুইকে অপেক্ষা না করিয়া চতুর্থ হইয়া থাকে।

ইহাতে প্রথমটির ন্যায় ততটা অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।

চিত্ত যখন কোন বিষয়ের চিন্তনে গাঢ়রূপে নিবিষ্ট হয় শ্বাস প্রশ্বাসের গতি আপনা হইতেই শ্লথ হইয়া পড়ে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক সকলেরই এরূপ অবস্থা হয়। সে সময় শ্বাস প্রশ্বাস নাসিকার অভ্যন্তরে অবরুদ্ধ অবস্থায় স্থিতি করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মচিন্তা বা পরমাত্মচিন্তা এক প্রকার যোগ সাধনা। এই সকল চিন্তার গাঢ়তা হইতে স্বভাবতঃ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বিরাম এক প্রকার প্রাণায়াম। আত্মাতে বা পরমাত্মাতে অনুরাগ মূলক চিন্তার যখন গাঢ়তা আসে তখন রেচক ও পূরক এই উভয়কে অপেক্ষা না করিয়া স্তম্ভনরূপ গতি বিরাম হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধকের চিন্তাধারার গতি অনুসারে আত্মদর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

নিঃশ্রেয়স বা সংসারের পুনরাবর্ত্তন হইতে নিষ্কৃতি লাভই সকল সাধনার লক্ষ্য। গীতা মতে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি হইতেও এই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে।

যে ব্যক্তি সর্বত্র আশক্তি শূণ্য ও স্পৃহাহীন সে সন্ন্যাস দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ১৮—৪৯)

গুণের কার্য্য হইতে বিষয় সকলের উদ্ভব। লোকে এই সকল প্রাকৃতিক গুণে অবশ হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে।

নৈষ্কর্ম্ম্য বলিতে গুণাতীত অবস্থা বুঝায়।

নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি—ভগবদ্‌ভাব বিবর্জ্জিত গুণের ক্রিয়া হইতে প্রসূত যে সকল কর্ম্ম তাহার ত্যাগরূপ সিদ্ধি। শাঙ্কর ভাষ্যে ইহার যে ব্যাখ্যা রহিয়াছে তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই—নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হওয়াতে যে ব্যক্তির কর্ম্ম সকল বাহির হইয়া গিয়াছে সে নিষ্কর্ম্মা। সেই নিষ্কর্ম্মার ভাব নৈষ্কর্ম্ম্য ;

নৈষ্কর্ম্ম্যই সিদ্ধি অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপেতে অবস্থানরূপ সিদ্ধি-সম্পন্নতা। সেই নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি পরমা * প্রকৃষ্টা, কর্ম্মজ সিদ্ধি হইতে অন্যবিধ ও জ্ঞানযোগের ফলভূত পরমা ধ্যাননিষ্ঠা, এই সিদ্ধিযোগে ব্রহ্ম প্রাপ্তিই জ্ঞানের পরানিষ্ঠা (১৮—৫০)।

কি উপায়ে নৈষ্কর্ম্ম্য সিদ্ধি প্রাপ্ত সাধকের অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় পরবর্ত্তী ৫১—৫৪ শ্লোকে তাহার বর্ণনা আছে।

"বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং অব্যভিচারিণী ধারণা যোগে মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সকলকে নিয়মিত করিয়া, শব্দাদি বিষয় পরিত্যাগ, অনুরাগ ও দ্বেষ পরিহার, ধ্যানের প্রতিকূল জনকোলাহল হইতে সুদূর স্থানে অবস্থান ও লঘু আহার (সহজ-পাচ্য আহার) ভোজন করিয়া, সংযম দ্বারা কায়, মন ও বাক্যকে ধ্যানাভিমুখী করতঃ বৈরাগ্য আশ্রয় করিবে অর্থাৎ, ধ্যেয় ব্যতিরিক্ত বিষয়ের দোষ পর্য্যালোচনা দ্বারা তাহাতে বিরাগ উৎপন্ন করিয়া ধ্যানযোগ পরায়ণ হইবে।

আত্মস্বরূপ চিন্তন—ধ্যান। ধ্যানের তীব্রতা বা একাগ্রীকরণ দ্বারা চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া ফেলা—যোগ। এই ধ্যানযোগে তন্নিষ্ঠ হইতে হইবে। অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ করতঃ শান্ত ও নির্ম্মম হইয়া সাধক ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ (১৮ – ৫৩)

স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ এই সাধন পথের প্রথম ও প্রধান সোপান। অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধাদির নির্ম্মূল সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় না। সাধনার এত পথ অতিক্রমের পর আবার এই সকলের উদ্ভব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ইহা স্বাভাবিক প্রশ্ন।

---

* নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি (১৮-৪৯)।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরীর ব্যাখ্যা হইতে শ্লোকের মর্ম্ম কি এবং কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা সাধনার উন্নত স্তরে সমারূঢ় ব্যক্তিরও যে অধঃপতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, শান্ত হয় নাই, সমাহিত হয় নাই, শান্তমনা হয় নাই, সে কেবল প্রজ্ঞা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

শ্রুতিমন্ত্রে "প্রজ্ঞা" দ্বারা শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ জনিত জ্ঞান বুঝায়।

শান্ত—জিতচিত্ত, সমাহিত—নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি। এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়া এবং তপশ্চরণশীল হইয়াও যে ব্যক্তি অশান্তমনা সে আত্মাকে পায় না। এখানে অশান্তমনা শব্দ দ্বারা যোগ বলে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্যের প্রতি আশক্তচিত্ততা বুঝায়। গীতার শ্লোকটীও এই মন্ত্রেরই অনুসরণ করিতেছে। যোগৈশ্বর্য্যলাভে লক্ষ্যভ্রষ্ট যোগী পুনর্বার অহঙ্কার বল দর্প ইত্যাদির অধীন হইয়া অধোগামী হয়। কেন এরূপ হয় নীলকণ্ঠ সূরী তাহার কারণ এরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

যোগমগ্ন হইবার সময় যোগী নিজের আত্মাতে চিত্ত নিবেশ করিবেন কিম্বা পরমাত্মাতে নিবিষ্টচিত্ত হইবেন, ইহা তাঁহার ইচ্ছাধীন। চিত্তবৃত্তি নিরোধান্তে যোগীর যখন "আমি আছি" এইমাত্র প্রত্যয়যুক্ত স্থিতি, সেই স্থিতি যদি বিষয়ের অভিমুখ হয় তাহাকে অস্মিতা বলে। এই অবস্থায় অহঙ্কার নিগ্রহ প্রয়োজন। তাহা না হইলে যোগী আপনার সত্য সঙ্কল্পাদি সামর্থ্য দেখিয়া আমার তুল্য আর কেহ নাই এরূপ দর্প অনুভব করেন। এই দর্প হইতে দিব্য কামনা সকলের অভিলাষ জন্মে। সেই অবস্থায় কামনার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলে ক্রোধের সঞ্চার হয়, এবং তাহা দ্বারা পরিচালিত হইয়া শত্রুর উচ্ছেদের জন্য শিষ্যাদি পরিগ্রহণ করেন। এইরূপ শিষ্য সংগ্রহ করিবার পর বিনাশ প্রাপ্ত

হন। অতএব অহঙ্কার সকল অনর্থের মূল। ইহাকে পরিত্যাগ করিলে আর সমুদয় আপনা আপনিই পরিত্যক্ত হয়। অহঙ্কার বিমুক্ত চিত্তে নির্ম্মমত্ব আসে। বিষয় সমূহে মমতা শূন্যত্ব উপস্থিত হইলে অহঙ্কার শিথিল হয়, তাহা হইতে বিষয় বৈমুখ্য জন্মে এবং আত্মকারণ অস্মিতাতে উহা বিলীন হইয়া যায়। তদনন্তর শান্ত হইয়া অস্মিতাও যখন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখন যোগী নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায় উপরত হইয়া ব্রহ্মভূত হন।

গীতার এই শ্লোকটী হইতে, সাধন পথ যে বড়ই বিঘ্নসঙ্কুল, সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় ব্যক্তিরও যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার প্রবল সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা বুঝা যায়। সাধনরত যোগীর সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক সজাগ থাকা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানকালেও শিষ্য সংগ্রহরত বিশেষ প্রতিপত্তিশালী সাধুদিগের কার্য্যে যে সকল অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় গীতার এই শ্লোকে তাহার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভের পর সাধক প্রসন্নচিত্ত এবং সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হন, এবং উপনিষদ্ যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেই আনন্দৈকঘন রস স্বরূপ পরমাত্মা সহ স্বরূপের একতা নিবন্ধন আনন্দময় হইয়া আনন্দ রসাস্বাদনে নিমগ্ন হন।* তখন তাহার পরাভক্তি লাভ হয়। পরোক্ষাবস্থায় সাধনায় যাহা নৈষ্কর্ম্ম্য, জ্ঞান ও ভক্তি; অপরোক্ষ

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিপাদ এবং ইহাদিগকে যথাক্রমে বৈশ্বানর, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং চতুর্থ (তুরীয়) বলা হইয়াছে। যাহা তুরীয় তাহা পূর্ববর্ত্তী তিনের অতীত, শান্ত শিব ও অদ্বৈত পরমাত্মা।

"তৃতীয় পাদ সুষুপ্তি স্থান একীভূত, প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময়—এইজন্য ইহা আনন্দভুক্। চেতনা ইহার মুখ। ইনি সর্বেশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্যামী, ইনি সমুদয়ের উৎপত্তি স্থান, এবং ভুত সকলের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ।"

ব্রহ্ম দর্শনান্তে তাহা পরম নৈষ্কর্ম্য, পরজ্ঞান ও পরাভক্তি হয়। অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান এই তিনের মিলন ক্ষেত্র।

সুষুপ্তিতে সাধারণ জীবমাত্রই আনন্দের ভোক্তা হয়, জাগরিতাবস্থায় তাহা তাহার জ্ঞান বা স্মৃতির অধিগম্য থাকে না—

মৎপ্রণীত "ওঙ্কার ও গায়ত্রী তত্ত্ব" গ্রন্থে এই তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

"তিনি বৈশ্বানর, তিনি তৈজস, এবং তিনিই প্রাজ্ঞ। প্রজ্ঞা বলিতে স্বরূপভূত চিচ্ছক্তিকে বুঝায়। জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থায় দৃশ্যশক্তি (বিষয়) দৃক্‌শক্তি (বিষয়ীর) অতিরিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে ইহারা বিষয়ীর সঙ্গে এক হইয়া যায়:

তৃতীয় পাদ প্রাজ্ঞকে এইজন্য একীভূত বলা হইয়াছে। বিষয় সমুহের জ্ঞান—প্রজ্ঞান। এই অবস্থায় এই সকল জ্ঞান আত্মার অতিরিক্ত বলিয়া আর অনুভূত হয় না। ইহারা যেন অবিভক্ত ভাব গ্রহণ করিয়া জমাট একত্মরূপ ধারণ করে, এইজন্য ইহা প্রজ্ঞানঘন। প্রজ্ঞানঘন অবস্থায় একমাত্র আনন্দেরই অনুভূতি থাকে। তাই দেখা যায়, যখন সুষুপ্তি অবস্থা (গভীর নিদ্রা) হইতে কেহ জাগরিত হয়, বলিয়া উঠে—আঃ কি আরামেই নিদ্রা গিয়েছিলাম,—কি সুখ! সুষুপ্তিতে এই যে স্মৃতি, ইহা আনন্দানুভূতির পরিচয়, এই নিমিত্ত প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময়। এই আনন্দই সমুদয়ের মূল (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে); সমুদয়ের মূল হওয়াতে আনন্দকে স্রষ্টার স্বরূপ বলা হয়। সুষুপ্তাবস্থায় জীব পরমাত্মাতে প্রবেশ লাভ করিলে পর, বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান তিরোহিত হয় বটে, কিন্তু জীবাত্মা চিচ্ছক্তির অংশ (অনুচৈতন্য) হওয়ায় তাহার চেতনা সকল সময়েই বিদ্যমান থাকে, এবং ভিন্ন ভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান তিরোহিত হওয়ার পর যে আনন্দ অবশেষ থাকে, সেই আনন্দে আনন্দময় হইয়া সে আনন্দের ভোক্তা হয়। চেতনা যোগে আনন্দ সম্ভোগ হয় বলিয়া চেতনাকে মুখ বলা হইয়াছে। জীবের এইরূপে যে আনন্দ সম্ভোগ হয়, সেই আনন্দ প্রাজ্ঞের স্বরূপ।"

ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য মূল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মাণ্ডুক্য উপনিষদ যাঁহাকে সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, একীভূত প্রজ্ঞানঘন আনন্দময়, অন্তর্যামী, সকলের উৎপত্তি স্থান, ভূত সকলের উদ্ভব ও প্রলয়ের কারণ বলিয়াছেন, এবং আনন্দই যাঁহার স্বরূপ, যোগী চেতনা মুখে সেই আনন্দঘন রসাস্বাদনে বিভোর হন। বৃহদারণ্যক শ্রুতি যাহাকে স্ত্রী পুত্র বিত্ত প্রভৃতি সব হইতে প্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অপরোক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর সাধক তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা প্রিয় অন্তরতম পরমবস্তু জানিতে পারিয়া তাঁহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। তিনিই তখন জীবনসর্বস্ব হন, ধ্যান ধারণা চিন্তা যাহা কিছু সকলের একমাত্র বিষয় হন।

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥ ৯ অঃ—১৪।

তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার কীর্ত্তন করে, যত্ন করে, ভক্তিপূর্বক আমায় নমস্কার করে, নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে, নমস্কার করে। আমি ভগবান্ এবং সকল কল্যাণগুণের নিধান, ইষ্টদেবতা, পরমগুরু, পরমেশ্বর এবং অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে অবস্থিত আছি জানিয়া আমাকে নমস্কার করে।

ভক্তিতে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করে—পরম প্রেমে বিভোর হইয়া সর্বদা আমাতে যুক্ত থাকে, আমা ভিন্ন আর কিছু জানে না। পরাভক্তি লাভের ইহা স্বাভাবিক পরিণতি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গীতায় উক্ত সাধনা কি ও সাধনার লক্ষ্য কি তাহা বলা হইল। গ্রন্থের নানা স্থানে "মদ্‌গতচিত্ত" 'মন্মনা' 'মদ্‌ভক্ত' 'মদ্‌যাজি' 'শ্রদ্ধাবান্‌' শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে। 'মদ্‌গতচিত্ত' 'মন্মনা' এই বিশেষণদ্বয় দ্বারা ঈশ্বরভাবসমন্বিত জ্ঞান বুঝায়।

'শ্রদ্ধাবান্‌' 'মদ্‌ভক্ত' ইহারা ভক্তিজ্ঞাপন করে,
'মদ্‌যাজি' 'ভজন' ইহা কর্ম্ম সূচনা করে।

ভাষ্যকারগণ এই সকল শব্দের প্রয়োগ হইতে গীতাতে সাধনার তিনটি বিভিন্ন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে এরূপ মনে করেন। ইহারা যথাক্রমে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের পথ। এই সম্বন্ধে কোন কোন ভাষ্যকারের মত সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

নীলকণ্ঠ মতে কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান, ছয় ছয় অধ্যায়ে সম্পন্ন এই তিন তিন কাণ্ডের বিষয়। শ্রীধর স্বামী মতে গীতায় ভক্তির প্রাধান্য। তিনি তাঁহার রচিত সুবোধিনী টীকার "তস্মাৎভগবদ্‌-ভক্তিরেব মোক্ষ হেতুরিতি সিদ্ধং" বলিয়া উপসংহার করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন,—

ভগবদ্ভক্তিযুক্তস্য তৎপ্রসাদাত্মা বোধতঃ।
সুখং বদ্ধ বিমুক্তিঃ স্যাদিতি গীতার্থ সংগ্রহঃ।

এই মতের সমর্থনে যুক্তি ;—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ! ভক্ত্যা লভ্যস্তনন্যয়া। ৮।২২

তিনি অনন্যা ভক্তির দ্বারাই লভ্য।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন ।। ১১।৫৪

অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন করার পর ভগবান্‌ বলিলেন চতুর্বেদ অধ্যয়ন, তপস্যা দান যজ্ঞ ইহাদের কোন উপায়েই

আমার এই বিশ্বরূপ কেহ দেখিতে সমর্থ হয় না, একমাত্র মদেকনিষ্ঠ ভক্তই আমার এইরূপ দর্শনে সমর্থ।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপজান্তি তে॥ ১০।১০

মদেকনিষ্ঠ আমাতে সততযুক্তচিত্ত প্রীতিপূর্বক ভজনকারিগণকে সেই বুদ্ধিরূপ উপায় প্রদান করি যদ্দারা আমাকে সে লাভ করিতে পারে।

সাধনার লক্ষ্য পরম পুরুষার্থ বা মোক্ষ লাভ। সেজন্য কৰ্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি এই তিনটী পথ এই শাস্ত্রের বিষয়, তবে কাহারো মতে ভক্তির প্রাধান্য, কাহারো মতে জ্ঞানের প্রাধান্য, কেহবা কৰ্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন। এই তিন পথের মূলতত্ত্ব কি? তাহা বিবেচনার বিষয়।

কৰ্ম্ম—শরীরধারীর পক্ষে সর্বতোভাবে কৰ্ম্মত্যাগ অসম্ভব (১৮ অঃ—১১)। কৰ্ম্মের আবার ইষ্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র এই ত্রিবিধ ফল। যাহারা ত্যাগী নহে, তাহাদিগের পরলোকে এই ত্রিবিধ ফল অনুসরণ করিয়া থাকে, সন্ন্যাসীদিগের ইহার কিছুই হয় না (১৮ অঃ—১২)।

এখানে ইষ্ট বলিতে অভিলষিত স্বর্গাদি, অনিষ্ট বলিতে তাহার বিপরীত অবাঞ্ছনীয় নরকাদি এবং মিশ্র বলিতে সুখ দুঃখাদি। পরলোকে (অর্থাৎ শরীর পতনান্তে) কৰ্ম্মানুসারে এই ত্রিবিধ অবস্থা ঘটে।

কৰ্ম্মফল আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্য মনে করিয়া যিনি কৰ্ম্ম করেন, তিনি সন্ন্যাসী (অনাশ্রিতঃ কৰ্ম্মফলং কার্য্যং কৰ্ম্ম করোতি যঃ স সন্ন্যাসী ৬ অঃ—১)।

সুতরাং সন্ন্যাসী ইষ্ট, অনিষ্ট ও ইষ্টানিষ্ট সকল প্রকার কৰ্ম্মফল দ্বারা অসংস্পৃষ্ট।

মধুসূদন মতে,—

অকর্ত্তা, অভোক্তা, পরমানন্দ, অদ্বিতীয়, সত্য, স্বপ্রকাশ, ব্রহ্মাত্ম সাক্ষাৎকারপ্রধান বিচার দ্বারা যাঁহার প্রামাণ্য নিশ্চিত হইয়াছে এবং বেদান্ত বাক্য সমুৎপন্ন ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে যাঁহার অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়াছে, সুতরাং যাঁহাতে আর অজ্ঞানতাপ্রসূত কার্য্য ও কর্ত্তৃত্বাদির অবসর নাই, সেই আত্মাভিনান পরিশূন্য ব্যক্তিই যথার্থ সন্ন্যাসী।

সর্বপ্রকার কর্ম্মের বিলোপ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি শুদ্ধ ও সর্বপ্রকার ভ্রম-প্রমাদশূন্য। অবিদ্যা কর্ম্মাদির উচ্ছেদবশতঃ তাঁহার পুনরায় শরীর গ্রহণের আশঙ্কা তিরোহিত হইয়াছে।

ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয় করাই যে জন্মনিরোধের একমাত্র উপায় সকল উপনিষদেরই এই মত।

"বেদাহমেতমজরং পুরাণম্
সর্বাত্মানং সর্বগতং বিভুত্বাৎ।
জন্ম নিরোধং প্রবদন্তি যস্য
ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি-নিত্যম্॥"

শ্বেতাশ্বতর ৩য়, অঃ, ২১।

গীতার ২য় অধ্যায়ের ১২ হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন ;—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ! কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥

২য় অঃ—৩৯।

সাংখ্যে যে বুদ্ধি (জ্ঞান) হয় তোমায় বলিলাম, কর্ম্মযোগে কি বুদ্ধি (জ্ঞান) হয়, তাহা শ্রবণ কর। এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া তুমি কর্ম্মবন্ধন পরিহার করিবে।

এখানে কর্ম্মবন্ধন বলিতে সংসার বুঝায়। শ্রীধর স্বামী শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া তৎপ্রসাদে যে অপরোক্ষ জ্ঞান উপস্থিত হয়, সেই অপরোক্ষ জ্ঞানে কর্ম্মাত্মক বন্ধ প্রকৃষ্টরূপে পরিহার করিবে।

শঙ্করাচার্য্যমতে,—ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাখ্য যত কিছু কর্ম্ম সবই বন্ধনের হেতু। রামানুজমতে,—শ্লোকের তাৎপর্য্য—আত্মজ্ঞান,—সাংখ্য বুদ্ধি (বুদ্ধি দ্বারা অবধারিত আত্মজ্ঞান সাংখ্য), এই সাংখ্য বা আত্ম-জ্ঞানপূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠান মোক্ষের উপায়, ইহাই বুদ্ধিযোগ। এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিতে হইবে।

অন্যত্র বলা হইয়াছে, কর্ম্ম করিয়াও বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি দুষ্কৃত (ধর্ম্ম অধর্ম্মাখ্য) উভয়ই পরিহার করেন, সেজন্য যোগযুক্ত হইতে হইবে। যোগ কর্ম্মে কুশলতা (২য় অঃ—৫০)। এই কর্ম্ম কুশলতা কি তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। ফলাভিসন্ধিযুক্ত কর্ম্ম হইতে বন্ধন উপস্থিত হয়, ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত কর্ম্মযোগ দ্বারা উহার পরিহার হয়, যোগে কর্ম্ম কুশলতা বলার ইহাই তাৎপর্য্য—সাংখ্যে আবার যে নিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এই বুদ্ধিসহকারে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক যে কর্ম্মানুষ্ঠান উহাই কর্ম্মযোগ বিষয়ক বুদ্ধি। সুতরাং দেখা যাইতেছে সাধনার্থীর পক্ষে জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ মধ্যে কোনরূপ রেখাসম্পাত করা সম্ভবপর নহে। আরম্ভে অবশ্য যাহার যাহার স্বভাবানুসারে কাহারো পক্ষে জ্ঞানের পথ, কাহারো পক্ষে কর্ম্মের পথ প্রশস্ত হইবে। যাহার স্বভাব রজোগুণ প্রধান তাহার পক্ষে আরম্ভে কর্ম্মযোগই প্রশস্ত, তাহাকেও আত্মজ্ঞান অনুশীলন দ্বারা এবং যথোচিত আহার নিয়ম দ্বারা রজোগুণকে নির্জ্জিত ও সত্ত্বগুণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া সাধন যে একেবারেই অসম্ভব তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য বলা হইয়াছে ;—

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।"

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।

স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ১৮ অঃ—৪৭।

সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, কারণ স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয় না।

কর্ম্মযোগ জ্ঞাননিষ্ঠার উপর স্থাপিত। কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মযোগ, সাংখ্যযোগ এবং ধ্যানযোগ এই ত্রিবিধ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিতাত্মানমাত্মনা।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥"

১৩ অঃ—২৪।

কেহ ধ্যানযোগে আত্মাতে আপনি আপনাকে দেখে, কেহ সাংখ্যযোগে, কেহ কর্ম্মযোগে দেখিয়া থাকে। এখানে আত্মা শব্দে বুদ্ধি বুঝায়।

আপনাকে দেখে শ্রীমদানন্দ গিরি ইহার অর্থ করিয়াছেন,— পরমাত্মারূপে আপনাকে দেখে। আপনি আপনাকে দেখা— পরমাত্মাকে অন্তর্নয়নে গোচর করা। ধ্যান যে অপরোক্ষ ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। শ্লোকে যে "কেচিৎ", "অন্যে" ও "অপরে" শব্দের প্রয়োগ আছে, আনন্দগিরি মতে এই তিনটি পন্থা দ্বারা উত্তম মধ্যম ও অধম অধিকারী নির্দ্দেশ করে। শঙ্করাচার্য্য ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়কে ইহাদিগের বিষয় শব্দাদি হইতে মনেতে স্থাপিত করা, তদনন্তর মনকে প্রত্যগাত্মাতে উপসংহৃত করিয়া একাগ্রভাবে চিন্তন—ধ্যান। সাংখ্যযোগ—প্রকৃতি পুরুষ বিবেক। ইহা জ্ঞানের পথ। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য কর্ম্মবন্ধন

হইতে মুক্তিলাভের জন্য যে-আত্মসাক্ষাৎকার এত প্রয়োজন, ভক্তিমার্গকে ইহা লাভের পন্থারূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এই পন্থাকে যে কোনরূপ উপেক্ষা করা হইয়াছে তাহা নহে। গ্রন্থে যাহা পরাভক্তি নামে অভিহিত হইয়াছে, যাহাকে কোন কোন ভাষ্যকার যেমন, বলদেব বিদ্যাভূষণ, জ্ঞানের পরিপক্বাবস্থা বলিয়াছেন, তাহা অপরোক্ষ ভগবদ্দর্শনের পর উপজাত হয়। ইহার পূর্বে যত কিছু ভক্তির কার্য্য, যথা তন্নিষ্ঠতার সহিত শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ পালন, দেব দ্বিজ গুরু ও প্রাজ্ঞগণের সেবা পূজা, পত্র পুষ্প ফল জল-সহকারে দেবার্চ্চনা এ সকলই পরোক্ষ ভক্তির কার্য্য। যে স্তরে সমারূঢ় হইতে পারিলে সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়, ইহা তাহা হইতে নিম্নে অবস্থিত, তথাপি সাধনার্থীর পক্ষে এই পরোক্ষ ভক্তিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ইহা বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধির প্রকৃষ্ট উপায়। বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই।

প্রাচীন বৈদিক দেবোপাসনা উভয় ভক্তি ও কর্ম্মমূলক। ঔপনিষদ ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানমূলক। ছান্দোগ্য উপনিষদের শাণ্ডিল্য বিদ্যায় ভক্তি শব্দের প্রয়োগ না থাকিলেও ভক্তির আভাষ পাওয়া যায়। প্রাচীন উপনিষদগুলির মধ্যে একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে প্রথম ভক্তি শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। ইহার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে জগতের স্রষ্টা ও প্রলয়কর্ত্তা শিব ভাবপূর্ণ বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন। ভাব শব্দ এখানে বিশ্বাস ও ভক্তি অর্থ বহন করে।

ফলতঃ দেখা যায়, প্রাচীন বৈদিকযুগেই স্বার্থান্বেষী পুরোহিত-গণ যজমান খুঁজিয়া বেড়াইতেন। ঋগ্বেদের ঋষি তাঁহাদিগকে উদর-সর্বস্ব বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। পুরোহিতদিগের এইরূপ

গর্হিত অর্থলালসার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞগুলিরও অপব্যবহার হইতে আরম্ভ হয়।

যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির এই সকল অপ্যবহার হইতে অপরিসীম অধোগতি ঘটে, তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, আজীবকধর্ম্ম, বার্হস্পত্য মত ও গীতার উদ্ভব হয়। এই সকল ধর্ম্ম ও মত বিশেষভাবে নীতিমূলক। রাজারা ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা-স্বরূপ দাসীও দান করিতেছেন, এই সকল দাসীর গর্ভে সন্তানোৎ-পাদন স্বাভাবিক। গীতাতে ইহাকে সামাজিক জীবননাশের হেতু বলা হইয়াছে এবং ইহার বিশেষ নিন্দা রহিয়াছে।

ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারের প্রতিক্রিয়া হইতে উদ্ভব এই সকল বিভিন্ন মতের অধিকাংশের গতি ঘড়ির দোলকের গতির ন্যায় মধ্যপথ অতিক্রমপূর্ব্বক অপর সীমানায় নিরীশ্বরবাদেতে পরিণত হয়, গীতার প্রতিক্রিয়াতে ঐরূপ কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় গীতাও তৎকালে প্রচলিত সাংখ্য ও যোগমতসকল গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বরবর্জ্জিতভাবে নহে। ঈশ্বরকে অন্তর্যামী-পুরুষরূপে মধ্যবিন্দু করিয়া গীতার মত পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি, গীতাতেও এই অনাদিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, এখানে কিন্তু তাহারা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপে সর্বৈশ্বর্য্যশালী ভগবানের বিভূতি। বেদের ব্রহ্ম, যাঁহাকে উপনিষদ পরমাত্মারূপে গ্রহণ করিয়াছিল, গীতাতে তিনি ভগবান্। অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শনের মধ্য দিয়া এই ভগবানতত্ত্ব বিশেষভাবে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। অক্ষরতত্ত্বের এই ত্রিবিধ ভাবের মনোরম বিশ্লেষণ এখানে দেখা যায়। উপনিষদে ব্রহ্মের সর্বাতীত ভাব উপাসকের সাধনার বিষয় ছিল। জগৎকে সাধনপথ হইতে দূরে না সরাইয়া রাখিতে পারিলে এই পথে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন, সাধকের নিকট জগৎ ক্রমেই অসার ও মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং গৃহাশ্রম এই সাধনার উপযোগী

নয় বলিয়া লোকসকলের মধ্যে সংসারবিমুখতা প্রসার লাভ করিতে লাগিল। ভগবদ্ভাবে ঈশ্বরকে সাধকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া গীতা উপাসনাকে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ইহাতে যাহার যেরূপ শক্তি তদনুরূপ সমাজের সকল স্তরের লোকের জন্যই ভগবদারাধনার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

'মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

১০ম অঃ, ৯ম।

তাহাদের চিত্ত, তাহাদের প্রাণ আমাতে নিমগ্ন। আমার কথাই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনার বিষয়, আমার কথা কীর্ত্তন করে। প্রতিদিন আমাতেই পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হয়।

কর্ম্ম হইতে বন্ধন, এই বন্ধন হইতে জন্ম। তত্ত্বসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ এই জন্ম-মৃত্যুর অধীনতা অনিবার্য্য, ইহা গীতার সুস্পষ্ট মত। দেহী স্বয়ং অবিকারী ও সকল ধর্ম্মের অতীত, অজ্ঞানোপহত বলিয়া তাহার এই সকল আবর্ত্তন ঘটিতেছে। অবস্থা অনুসারে যে যতটা লাভের যোগ্য— ঈশ্বরে ভগবদ্ভাবের বিকাশ দ্বারা গীতা তাহার জন্য ততটা প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছে।

৭ অঃ, ১৬ শ্লোকে বলা হইয়াছে চারি শ্রেণীর লোক ঈশ্বরের ভজনা করিয়া থাকে, তাহারা আর্ত্ত (বিপদে অভিভূত), জিজ্ঞাসু (আত্মতত্ত্ব লাভের অভিলাষী), অর্থী (ধনাভিলাষী), জ্ঞানী (ভগবত্তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা রূপ জ্ঞানের অভিলাষী)। ইহারা সকলেই ভক্ত *। ইহাদিগের মধ্যে যে ভক্ত জ্ঞানী ভগবত্তত্ত্ব

* মহাভারতে শান্তিপর্ব ৩৪১ অঃ, ৩৩।৩৪ শ্লোক—তাঁহার মুখেই এই বিষয়ে এরূপ বর্ণনা আছে—

"আমার ভক্ত চারি প্রকার ইহা তুমি শুনিয়াছ। কর্ম্মানুষ্ঠানার্থিদিগের মধ্যে যাহারা অন্য দেবতার ভজনা না করিয়া আমাতেই একান্ত অনুরাগী,

প্রত্যক্ষ করা রূপ যে জ্ঞান তাহাতে সদাযুক্ত—তিনি শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভের অধিকার অর্জ্জনক্ষম ; অপর ত্রিবিধ শ্রেণীর ভক্ত জন্ম-মৃত্যুর অধিকারের অতীত নহেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকার ভিন্ন মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সকলকেই জ্ঞানী-ভক্তের অবস্থায় উপনীত হইতে হইবে, ইহা এই জন্মেই হউক বা পরবর্ত্তী কোন জন্মেই হউক। অপবর্গ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা অবশ্যম্ভাবী তাহা তিনি "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি" (৪র্থ অঃ, ৫) বলিয়া অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন এবং বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে তাহাও বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ৭ম অঃ, ১৯।

শঙ্করাচার্য্য শ্লোকের বাসুদেব অর্থ সর্বাত্মা করিয়াছেন। বাসুদেবই সমুদয়, আমি ও ইহা সকলই বাসুদেব (মধুসূদন), যাহা কিছু সকলই সর্বাত্মা—বাসুদেব দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ইহা ছান্দোগ্যোপনিষদের ৭ অঃ, ২-২৫ মন্ত্র অনুযায়ী। এরূপ জ্ঞানবান্ আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির তথায় এরূপ বর্ণনা আছে।

আত্মাই নিম্নে, আত্মাই উপরে, আত্মাই পশ্চাতে, আত্মাই সম্মুখে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে, আত্মাই এ সমুদয়—এইরূপ দেখিয়া ও জানিয়া ইনি আত্মাতেই রমণ করেন, আত্মাতেই ক্রীড়া করেন, আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েন, আত্মাতেই আনন্দলাভ

অন্যাভিলাষশূন্য, আমিই যাহাদের একমাত্র গতি, তাহারাই শ্রেষ্ঠ, অবশিষ্ট ত্রিবিধ ভক্ত ফলকামী, তাহারা সকলেই পতনাধীন। যে ব্যক্তি জ্ঞানী সেই শ্রেষ্ঠ।

করেন, আত্মাতেই বিরাজ করেন, সকল লোকেতেই ইনি যথেচ্ছ বিহার করেন। (১)

ব্রহ্মসূত্রে মুক্তজীবের অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বেদব্যাস এই শ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন। আত্মা সম্বন্ধে শ্রুতির এই যে বর্ণনা, গীতায় উক্ত 'বাসুদেব' শব্দ এই অর্থ ই বহন করে। উত্তম, মধ্যম বা অধম অধিকারী সকলেই এই অবস্থায় উপনীত হইয়া মুক্তি লাভ করিবে, অগ্র আর পশ্চাৎ এই যাহা প্রভেদ; সুতরাং বলা হইয়াছে ভজনকারী এই চারি শ্রেণীর সকলেই উদার। এই উক্তি সকল শ্রেণীর জন্যই আশার বাণী, তথাপি জ্ঞানের পন্থা যে শ্রেষ্ঠ পন্থা ইহার উপর বিশেষ জোর দিবার জন্য বলা হইয়াছে "জ্ঞানী আমার আত্মা" (৭ম অঃ, ১৮)।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"। (৪র্থ অঃ, ১১)

আমাকে যে যে ভাবে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করি।

এখন প্রশ্ন আসিতে পারে মানব-প্রকৃতিতে এত সব তারতম্য কিরূপে হইল? ইহার উত্তর এইভাবে দেওয়া হইয়াছে—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥

৫ম অঃ, ১৪।১৫।

ঈশ্বর লোক সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম কিছুই সৃজন করেন না, কর্ম্মফল সংযোগ ও সৃজন করেন না; স্বভাবই প্রবৃত্ত হয়।

(১) "আত্মৈবাধস্তাৎ আত্মোপরিষ্টাৎ, আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ, আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বানঃ এবং বিজানন আত্মরতিঃ আত্মক্রীড়ঃ, আত্মমিথুনঃ আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতি। তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।"

তিনি কাহাকে পাপেও প্রবৃত্ত করেন না, সুকৃতিতেও প্রবৃত্ত করেন না। অজ্ঞান দ্বারা জীবগণের জ্ঞান আবৃত, তাই তাহারা মোহপ্রাপ্ত হয়। পাপী বা পুণ্যাত্মা এই দুইয়ের সম্বন্ধে ঈশ্বরের কোনরূপ বিদ্বেষ বা অনুরাগ নাই। তাঁহাতে কোনরূপ বৈষম্য সম্ভবে না। ঈশ্বর প্রকৃতির প্রেরয়িতা বটেন, প্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে তাহার নিজের ধর্ম্মানুসারে গুণ ও কার্য্যসকলের প্রবর্ত্তক। এই প্রাকৃতিক ক্রিয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট জীবের সুখ ও দুঃখের কারণ। দ্বিতীয় শ্লোকে ঈশ্বরকে বিভু বলা হইয়াছে; বিভু অর্থ ব্যাপক, তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। শক্তির পরিচালনা হইতে কার্য্য। যে শক্তি সর্বত্র ব্যাপ্ত তাহার পরিচালনার কোন অবসর নাই, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়।

যিনি সক্রিয় তিনি অন্যকে পরিচালনা করিতে সমর্থ হন এবং যে ভাবে প্রবর্ত্তিত করেন তদনুসারে তাহার পাপপুণ্যের কারণ হন। যিনি বিভু তাঁহার সম্বন্ধে অপরকে এরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা সম্ভবপর নহে। তিনি বিভু-ব্যাপক অনন্তশক্তির আধার সর্বান্তরবাহ্যভাষক, সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশক মাত্র। সূর্য্যকিরণ বিস্তারে পাপী পুণ্যাত্মা বলিয়া যেমন কোন বৈষম্য নাই, মনুষ্যের সুকৃতি দুষ্কৃতি সম্বন্ধেও তদ্রূপ পরমেশ্বরের কোনরূপ বৈষম্য নাই। এই গ্রন্থে জীবকে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি, জড়-প্রকৃতিকে তাঁহার অশ্রেষ্ঠ প্রকৃতি বলা হইয়াছে। এই শ্রেষ্ঠ জীব-প্রকৃতি যদি অশ্রেষ্ঠ জড়-প্রকৃতির অধীন হয় তবেই তাহার দুষ্কৃতি, আর ভগবানের অধীন হইলে সুকৃতি হয়। ইহাদিগের উৎপত্তির কারণ স্বভাব। এই স্বভাব কি? উপনিষদে আছে—"আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ স ঐক্ষত লোকা নু সৃজা ইতি" ইহাদ্বারা সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টাতে যে সৃজ্য শক্তি বিদ্যমান ছিল তাহা বুঝায়। সেই সকল শক্তির অন্তর্নিহিত ভাবই স্বভাব। সৃষ্টিশক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, কারণের আত্মভূতশক্তি,

সৃজ্যশক্তি সৃষ্টিশক্তির অন্তরঙ্গা শক্তি, ইহা শক্তির আত্মভূত কার্য্য। প্রকৃতি সৃজ্য শক্তি, ইহা সৃষ্টিশক্তির অন্তরঙ্গা শক্তি, সুতরাং এই শক্তির প্রেরয়িতা ঈশ্বর, কিন্তু কার্য্যসকল এই সৃজ্যশক্তি বা প্রকৃতির আত্মভূত, প্রকৃতিই ইহাদিগের নিয়ামক, এবং যেহেতু সৃজ্যশক্তি সৃষ্টিশক্তি হইতে অভিন্ন (ইহা ঈশ্বরেরই নিকৃষ্ট প্রকৃতি) সেই হেতু সৃষ্টিশক্তির সত্তাতেই সৃজ্যশক্তি সকলের সত্তা। সুতরাং স্বভাব দ্বারা এই সৃজ্যশক্তির অন্তর্নিহিত ভাব বুঝায়। এই স্বভাব যাহা প্রকৃতিগত তাহা হইতে কর্ম্মসকল উৎপন্ন হয়, ঈশ্বর স্বয়ং তাহাতে অসংস্পৃষ্ট থাকেন, তবে কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে এত সব বৈষম্য উপস্থিত হয় কেন? তাহার কারণ জীবগণের জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, তাই তাহারা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ বশতঃ মোহগ্রস্থ হয়।

ভিন্ন ভিন্ন মানবে স্বভাবের এই যে বৈষম্য ইহার জন্য তাহারা বিভিন্ন স্তরের লোক হইয়া থাকে। "আমি গুণ কর্ম্ম বিভাগানুসারে চারিবর্ণের সৃজন করিয়াছি।" এই উক্তি এই তত্ত্বই প্রকাশ করিতেছে।

শ্লোকে যে চারিবর্ণের উল্লেখ আছে, তাহা সে কালের সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে বুঝায়। রামানুজ ইহার ব্যাখ্যায় বলিতেছেন—চারিবর্ণ উপলক্ষ মাত্র। চারিবর্ণ হইতে আরম্ভ করিয়া আব্রহ্মস্তম্বাদি সমস্ত জগৎ সত্ত্বাদি গুণবিভাগ এবং সেই গুণানুসারে শমদমাদি কর্ম্মবিভাগে বিভক্ত করিয়া আমি সৃজন করিয়াছি এরূপ বুঝিতে হইবে।

শঙ্করাচার্য্য গুণ কর্ম্মবিভাগের অর্থ করিয়াছেন "গুণবিভাগ ও কর্ম্মবিভাগ।

গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। ব্রাহ্মণ সত্ত্ব প্রধান সাত্ত্বিক, শমদম তপাদি তাঁহার কর্ম্ম। ক্ষত্রিয় সত্ত্বগুণমিশ্র রজোগুণ প্রধান, শৌর্য্য বীর্য্যাদি তাঁহার কর্ম্ম। বৈশ্য তমোমিশ্র রজোগুণ প্রধান,

কৃষি আদি তাঁহার কর্ম্ম। শূদ্র রজোমিশ্র তমোগুণ প্রধান, শুশ্রূষা তাহার কর্ম্ম।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে, সৃজন করা সত্ত্বেও আমায় অকর্ত্তা বলিয়া জানিবে। ইহা কিরূপে সম্ভব? সম্ভবপর হয় এইভাবে—প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজঃ ও তমো গুণানুসারে এই চারিবর্ণের সৃষ্টি, প্রকৃতির প্রেরয়িতা ঈশ্বর, সুতরাং গৌণ ভাবে এই সৃষ্টি তাঁহা বর্জ্জিত নহে, কিন্তু যেহেতু মুখ্যতঃ সৃষ্টি প্রকৃতির কার্য্য, এইজন্য তিনি অকর্ত্তা।

এই চতুর্বর্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জন্মগত চারিবর্ণকে যে নির্দ্দেশ করে না তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে। গুণ ও কর্ম্মের উৎকর্ষসাধন দ্বারা এক স্তরের লোক যে তাহা অপেক্ষা উন্নততর স্তরে উত্থিত হইতে পারিত এবং অপকর্ষতা হেতু অধোগতি প্রাপ্ত হইত, তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

দ্বিজ কে? বলা হইয়াছে;—

মহাভারত অনুশাসন পর্ব ১৪৩ অঃ, ৫০-৫২।

জন্ম সংস্কার শাস্ত্র-জ্ঞান ও বংশ হইতে দ্বিজ হয় না, চরিত্রই দ্বিজত্বের কারণ। সকলেই চরিত্রগুণে শূদ্র ও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। গুণাতীত নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহাতে স্থিতি করেন তিনিই দ্বিজ।

অন্যত্র—বনপর্বের ২১১ অঃ, ১১-১২ শ্লোক—

শূদ্রযোনীতে জন্ম হইলেও সদ্‌গুণের অনুষ্ঠান দ্বারা বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়, ঋজুতাতে অবস্থিতি করিলে ব্রাহ্মণত্বেও অধিকার জন্মে।

মনুসংহিতার ১০ অঃ, ৬৫ শ্লোকে—

শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব প্রাপ্তির উল্লেখ আছে।

যাহা হউক প্রাকৃতিক গুণসকলের কার্য্যকারিতা হইতে বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত সর্বশ্রেণীর মানবের জন্যই সাধনার দ্বারা ক্রমশঃ

মুক্তিপথের উন্নত হইতে উন্নতর স্তরে আরোহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে ইহাও গীতার বিশেষত্ব।

তিনি বাসুদেব, সর্বভূতের অন্তরাত্মা হইয়া সর্বত্র বিরাজ করিতেছেন। আমি সর্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বিদিগের তেজ, বলবানের বল ইত্যাদি (৭ম, ১০।১১)। ইনিই জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রতু, বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞ, স্বধা, ঔষধ, মন্ত্রপূত অগ্নি হোম (৯-১৬) যদ্দারা আহুতি দেওয়া হয় তাহা তিনি (ব্রহ্ম), যাহা আহুত হয় তাহাও তিনিই (ব্রহ্ম)।

এই সকল ব্রহ্মের সর্বান্তরাত্মা বাসুদেব তত্ত্বজ্ঞাপন করিতেছে। এই সকলই শক্তির কার্য্য। সৃজ্যশক্তি সৃষ্টিশক্তি হইতে অভিন্ন। সৃষ্টিশক্তির সত্ত্বাতে সৃজ্যশক্তিগুলির সত্ত্বা, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং ক্রতু ইত্যাদি দ্রব্যসকলের অন্তর্যামী সহ স্বতন্ত্রতা নাই। তাঁহার শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া স্বাধীনভাবে ইহাদিগের অবস্থিতিই সম্ভবে না। যাঁহার সত্ত্বাতে এই সকলের সত্ত্বাবত্তা তিনি বাসুদেব। এই তত্ত্বে দৃঢ়মতি হইয়া তাঁহাতে চিত্তস্থাপন করিলে সেই অন্তর্যামী বুদ্ধির বিষয় হন। এই সকল উক্তি দ্বারা শক্তিসন্নিবেশে উপজাত যজ্ঞাদির উপকরণ দ্রব্যাদি নহে জ্ঞাপন করা হইল। যে সত্ত্বাতে ইহাদিগের সত্ত্বাবত্তা ইহারা সেই ব্রহ্মস্বরূপ নহে, কিন্তু ইহাদের সত্ত্বাদি ব্রহ্মাধীন। ইহারা ভগবানের বিভূতিমধ্যে গণ্য। ১০ম অধ্যায়ে এই সকল বিভূতির বিশেষ ভাবে কোথায় কোথায় প্রকাশ তাহার বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন, আমার দিব্যবিভূতি নিচয়ের অন্ত নাই, যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীযুক্ত গুণাতিশয় তাহাদিগকে আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে; কিন্তু তোমার এসকল বহু বিষয় জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আমিই একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া আছি (১০ অঃ, ৪০, ৪১, ৪২)। "একাংশে জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি" ইহা দ্বারা পূর্বোক্ত (৯ অঃ, ৪) "অব্যক্তমূর্ত্তিতে

আমি সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, আমাতে সমুদয়ভূত স্থিতি করিতেছে, আমি তাহাতে স্থিতি করি না অর্থাৎ আমি তাহার অতীত হইয়া স্থিতি করিতেছি” কথার পুনরুক্তি করা হইয়াছে।

এভাবে উপসংহারের তাৎপর্য্য কি? শ্রীমদানন্দ গিরি তাহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

“ধ্যেয় ও জ্ঞেয়রূপে ভগবানের নানাবিধ বিভূতির উপদেশ করিয়া প্রপঞ্চাত্মক ধ্যেয়রূপ প্রদর্শনান্তে প্রপঞ্চাতীত নিরুপাধিক রূপ উল্লেখ দ্বারা তাঁহার পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় **তৎ** (ব্রহ্ম) পদার্থ পরিলক্ষিত অর্থ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।”

যাহারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিয়া চিন্তাকে অন্তর্মুখী করিতে পারে নাই, তাহাদের চিন্তা বাহিরের দিকে ধাবিত হইবেই। বাহিরে ঈশ্বরদৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্য বিভূতিসকলের বর্ণনা— “ইহারা আমার তেজোঽংশসম্ভূত” এরূপ বলার ইহাই তাৎপর্য্য।

বিভূতিগুলির চিন্তা করিতে করিতে তাহাতেই চিত্ত আবদ্ধ হইয়া পড়িতে পারে, তাহা হইলে যে সাধ্য প্রাপ্তির জন্য সাধনা তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়, বিভূতিগুলিতে ভগবান্ আপনার শক্তির অভিব্যক্তি করিয়া প্রকাশমান, ইহারা ভগবান্ নহে. বিভূতিতে শক্তি অর্থাৎ বাসুদেবের (পরমাত্মার) অন্তর্যামীত্ব শক্তিই চিন্তনীয়।

‘আমিই একাংশে সমুদয় জগৎ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি’ ইহা দ্বারা তাঁহার সর্বাধারত্ব বলা হইয়াছে। এই সর্বাধারত্ব কি? একাদশ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন মধ্যে তাহার মর্ম্ম রহিয়াছে। এই বিশ্বরূপ বর্ণনায় ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের (১০ম— ৯০ সূ) অনুসরণ করা হইয়াছে। সূক্তের তৃতীয় ঋকে বলা হইয়াছে—“ইহার এরূপ মহিমা, ইহা হইতেও পুরুষ মহত্তম, সমুদয় ভূত ইহার পাদমাত্র, ইহার অপর ত্রিপাদ দিব্যধামে”।

পঞ্চম ঋক্—তাঁহা হইতে বিরাট উৎপন্ন হইলেন, সেই বিরাটকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া পুরুষ অবস্থিত।

এই সকল হইতে বুঝা যায়, অন্তর্যামী ভগবানে বিশ্বের স্থিতি (বাসুদেবঃ সর্বমিতি ৭ অঃ, ১৯) হইলেও ইহা তাঁহার একাংশ মাত্র, তিনি ইহাতে স্থিতি করিয়াও ইহার অতীত। এই বিশ্ব তাঁহার অন্তর্ভুক্ত বিধায় বিশ্ব লইয়া তাঁহার রূপ, বিশ্বের বিভূতিনিচয়ে তিনি প্রকাশমান তাই তিনি বিশ্বরূপ।

এই জগৎ তাঁহার দেহস্থানীয় তিনি স্বরূপে নিরূপাধিক হইলেও অরূপের রূপ এই জগৎ। তিনি আপনি জগতের আত্মা বটেন, কিন্তু জগদ্রূপদেহে আবদ্ধ নন, জগৎ তাঁহার এক পাদমাত্র, "অপর ত্রিপাদ" জগতাতীত।

বিশ্বরূপ প্রদর্শন বর্ণনায় ব্রহ্মের অন্তর্যামীত্ব ও ভগত্ব* এই উভয় তত্ত্বের সমাবেশান্তে অধ্যায়ের শেষশ্লোকে গীতা শাস্ত্রের যাহা সারোপদেশ তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে।

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সব ভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।

১১ অঃ, ৫৫।

আমার জন্যই কর্ম্ম করে, বেদাধ্যয়নাদি সমুদয় কার্য্যই আমার আরাধনারূপে করে।

মৎপরম—আমিই যাঁহার পরম প্রাপ্য, সমুদয় অনুষ্ঠানের আমিই একমাত্র লক্ষ্য।

মদ্ভক্ত—আমি যাঁহার পরম প্রিয়, সে জন্য যে আমার কীর্ত্তন শ্রবন অর্চ্চনাদি ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না বলিয়া আমাতে

---

* সমগ্র ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই ছয়এর একত্র সমাবেশকে ভগ বলে। ভগ ঋগ্বেদের একজন দেবতা, তাঁহার উপাসক ভগবান হয় (৭ম—৪১ সূ—৫ম ঋক্)।

পরম প্রয়োজন, এই ভাবে যে জীবন যাপন করে সে আমার ভক্ত।

সঙ্গ বর্জ্জিত—আমিই একমাত্র প্রিয়, এ জন্য অন্য কাহারো সঙ্গ সহিতে পারে না, আমাতে একান্ত ধ্যান নিষ্ঠ।

সকল প্রাণী পরম পুরুষতন্ত্র, বিশ্বভগবৎস্বরূপ এরূপ জানিয়া প্রাণিগণের প্রতি কোনরূপ শত্রুতার যিনি কারণ দেখেন না—তিনি নির্বৈর।

শঙ্করাচার্য্য শ্লোকের এরূপ মর্ম্মার্থ করিয়াছেন—

পরম মঙ্গল সাধনার্থ যাহাতে অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে সেইভাবে সমুদয় গীতা-শাস্ত্রের যাহা সারভূত অর্থ এই শ্লোকে তাহার মিলন সাধিত হইয়াছে। নীলকণ্ঠমতে এই শ্লোকের মৎকর্ম্মকৃৎ ও মৎপরম দ্বারা কর্ম্মযোগ ও ধ্যানযোগ উক্ত হইয়াছে, সঙ্গবর্জ্জিত দ্বারা সাধকের একান্ত ধ্যান নিষ্ঠা জ্ঞাপন করিতেছে; নির্বৈর দ্বারা বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপে দেখিতে হইবে, এবং মদ্‌ভক্ত দ্বারা উপাসনা কাণ্ডের অর্থসংগ্রহ হইয়াছে।

গীতার সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় যথা সম্ভব সংক্ষেপ ও সরলভাষায় মর্ম্মার্থ সহ আলোচনা করা হইল। উত্তম মধ্যম অধম সর্বপ্রকার অধিকারীর জন্যই যে এই গ্রন্থে সাধনার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাও দেখান গেল।

গীতা-শাস্ত্রে যে সাধনার পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে জন্য বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধিতা সম্পাদন প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য—ফলতঃ ইহা না হওয়া পর্য্যন্ত সাধন পথে প্রবেশের অধিকারই জন্মে না। এইজন্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাসহকারে শাস্ত্রের বিধি ও আচার্য্যের উপদেশ প্রতিপালন প্রয়োজন।

প্রকৃত শাস্ত্র কি এবং কাহাকে আচার্য্য বলা যায় পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। ইহার পর নিজ নিজ স্বভাবানুসারে কোন সাধকের পক্ষে জ্ঞানের পথ কোন সাধকের পক্ষে কর্ম্মের পথ প্রশস্ত। মূলে এই দুই পথের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যাহা কিছু প্রভেদ তাহা আরম্ভে।

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

৫ম, ৫ শ্লোক।

শ্লোকের "স্থান" শব্দের অর্থ মোক্ষ। সাংখ্য ও কর্ম্মযোগ উভয় দ্বারাই সেই মোক্ষ লাভ হয়। এই উভয়কে যে এক দেখে সে প্রকৃত দেখে।

ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে বালকেরাই ইহাদিগকে পৃথক্ বলিয়া থাকে,—পণ্ডিতেরা বলেন না।

সাংখ্য সেই জ্ঞানকে নির্দ্দেশ করে যদ্দারা ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠান ভূমি এই দেহ হইতে দেহী যে সম্পূর্ণ পৃথক, কর্ম্ম সকল প্রকৃতির গুণসম্ভূত এবং দেহী স্বয়ং নিষ্ক্রিয় বলিয়া সম্যক উপলব্ধি হয়। তখন তিনি জানিতে পারেন, কার্য্য কারণ ও কর্ত্তৃত্বের প্রকৃতিই হেতু, পুরুষ আত্মজ্ঞান বিমূঢ় থাকা বশতঃ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত গুণসকল ভোগ করিয়া সুখ-দুঃখের অধীন হয় (১৩ অঃ, ২০, ২১) এই জ্ঞানলাভের পরবর্ত্তী অবস্থা সাধকের গুণাতীত হওয়া। গুণাতীত ব্যক্তি প্রকাশ (সত্ত্ব) প্রবৃত্তি (রজঃ) ও মোহ (তমঃ) এই তিনগুণের কার্য্য উপস্থিত হইলে তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া নির্বিকার থাকেন।

গুণাতীত অবস্থা লাভ হইয়াছে কি না চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২৩-২৫ শ্লোকে তাহার এরূপ লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—

গুণাতীত ব্যক্তি উদাসীনের ন্যায় নির্লিপ্ত, গুণসকল নিজেদের কার্য্য করিতেছে ইহা জানিয়া বিচলিত হন না, সুখ-দুঃখে

সমভাবাপন্ন, নিয়ত আত্মস্বরূপে স্থিত, প্রস্তর লোষ্ট্র কাঞ্চনে সমজ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয়, নিন্দা স্তুতি, মান অপমান সব সমান, তিনি শত্রু মিত্রে সমবুদ্ধি, তিনি ধীর ও উদ্যমত্যাগী অর্থাৎ আপনার অহঙ্কারের প্ররোচনায় কোন কর্ম্মে প্রয়াস করেন না।

এই অবস্থায় উপনীত হওয়ার পশ্চাতে যে কত সাধনার প্রয়োজন তাহা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এ সমস্তই পুরুষকার সাপেক্ষ। খুব কম সংখ্যক লোকের পক্ষে এই সাধনা সম্ভবপর, এইজন্য অপর এক পন্থার নির্দ্দেশ রহিয়াছে—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তি যোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪ অঃ, ২৬।

যে ব্যক্তি অব্যভিচারী ভক্তিযোগে আমার সেবা করে সে ব্যক্তি গুণসকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।*

---

* পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি পাদের ২১ সূত্র—"তীব্র সংবেদানামাসন্নঃ" তীব্র সংবেদশালী যোগীদের সমাধি ও সমাধিফল অর্থাৎ কৈবল্যলাভ আসন্ন। সংবেদ বলিতে বৈরাগ্যমূলক সাধনে কুশলতা এবং তাহা দ্বারা লক্ষ্যের প্রতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়া বুঝায়। এইরূপ কুশলতা তৎপর শ্রদ্ধা বীর্য্যাদি সাধনশীল যোগীরা মৃদু মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে নয় শ্রেণীতে বিভক্ত, তীব্র সংবেদীরা মাত্রার তারতম্যানুসারে মৃদু তীব্র সংবেদী, মধ্য তীব্র সংবেদী ও অধিমাত্র তীব্র সংবেদী নামে অভিহিত হন। যথাক্রমে তাহাদের সমাধি ও সমাধিফল আসন্ন আসন্নতর ও আসন্নতম হয়।

এই অবস্থা লাভকরা বড়ই দুরূহ ব্যাপার, অন্য কোন উপায় আছে কি না? শিষ্য এরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তরে বলা হইল "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা" এখানে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে ভগবানের সেবাদ্বারাও যে গুণাতিক্রম করিতে পারার উল্লেখ, ইহা যোগদর্শনের এই কথারই অনুসরণ, কিন্তু এই অব্যভিচারী ভক্তিলাভও কঠোর তপস্যা দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করিতে না পারিলে সম্ভবপর হয় না।

দ্বাদশ অধ্যায়ের ৬।৭ শ্লোকে এই কথাটী অন্য একভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যাহারা সমুদয় কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করতঃ মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগে আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমাতে অভিনিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরে মৃত্যুরূপ সংসার সাগর হইতে আমি উদ্ধার করি। যোগ বলিতে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে বহমান মনের প্রণিধান বুঝায়। এই অনুধ্যান যখন প্রীতিসহকারে ভগবানের গুনানুকীর্ত্তন ও চিন্তনের দিকে বহমান হয় তখন তাহা ভক্তি। চিত্তের একাগ্রতা সাধন ভিন্ন তাহা সম্ভবপর হয় না। চিত্তের এই একাগ্রতা লাভও কঠিন সাধনা ভিন্ন হয় না। সংসাররূপ সাগর হইতে উদ্ধার লাভকরা অর্থ মুক্তি লাভ করা। গুণসকলকে অতিক্রমপূর্ব্বক ইহাদিগের কার্য্য হইতে নিজকে অসংশ্লিষ্ট রাখিতে হইবে, সেজন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিগ্রহ করা প্রয়োজন। চিত্তবৃত্তির নিরোধ ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। যোগসাধন ইহার একমাত্র উপায়। যোগবলে চিত্তবৃত্তি যখন নিবৃত্ত হয় তখন যাহার মধ্যবর্ত্তীতায় ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য তাহার অভাবে প্রকৃতি সম্ভূত যাহা কিছু সকলি সাধকের নিকট হইতে অপসৃত হইয়া যায়, সাধকের তখন কেবলত্ব লাভ হয়। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ২০ ও ২১ শ্লোকে ইহার এরূপ বর্ণনা আছে।

"যোগ বলিতে তাহা বোঝায় যে অবস্থায় যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হয়, এবং আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হয়। সাধকের তখন বুদ্ধিগ্রাহ্য অতিন্দ্রিয় যে আত্যন্তিক সুখ তাহা তাহার জ্ঞানের বিষয় হয়, এবং সেই সুখে অবস্থিত হইয়া আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হন না। সাংখ্যদ্বারা এইস্থান এইভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কর্ম্মকুশলতা দ্বারাও সেই স্থান প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়। কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্ম না করাই এই কুশলতা ; এরূপ করিতে

পারিলে কৃত কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। কিন্তু এই কুশলতা অর্জ্জন করিতে হইলে গুণ কর্ম্ম বিভাগতত্ত্ব জানা প্রয়োজন এবং তজ্জন্য যাহা কিছু সাংখ্যে উক্ত হইয়াছে তাহার সমুদয়ই অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়।

এইরূপে জ্ঞানমিশ্র ফলাকাঙ্খাবিবর্জ্জিত কর্ম্মদ্বারা নিষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ হইলে কর্ম্মের বন্ধন আর সৃষ্টি হয় না।

এতদতিরিক্ত আর একটী পন্থার উপর বিশেষভাবে গীতাশাস্ত্রে জোর দেওয়া হইয়াছে, ইহা যোগদর্শনে বর্ণিত যোগ সাধনার পন্থা—

"সর্ব্বদা আত্মসমাধান করতঃ ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত নিরুদ্ধচিত্ত-যোগী আমার স্বরূপে অবস্থিতিরূপ নির্বাণ প্রধান শান্তি লাভ করিয়া থাকে।

এই শ্লোকে যোগদর্শনে বর্ণিত যোগের সকল বিভিন্ন অবস্থারই যে আভাষ রহিয়াছে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই সাধনা যে সাধারণ লোকের জন্য প্রযোজ্য নহে "ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থিত" এই উক্তি দ্বারা সাধারণ লোকের জন্য আর একটী পন্থার ব্যবস্থা আছে তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত অল্পায়াস সাধ্য। ইহাতে আহার সংযমপূর্বক প্রাণায়ামের রেচক ও পূরকের সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাণবৃত্তির বিরুদ্ধপথে গতি অবরুদ্ধ করিতে হয়। ইহাও যোগদর্শনের অবলম্বিত একটী পন্থা।

এই তিনটী পন্থাই সম্পূর্ণরূপে পুরুষকার প্রযত্ন সাপেক্ষ। এবং অতীব কষ্টসাধ্য।

এতদ্ব্যতীত পুনর্জন্ম হইতে বিরতিলাভের আর একটী উপায়রূপে বলা হইয়াছে,—

অভ্যাসরূপ যোগ সাধনা দ্বারা (অর্থাৎ একই রকম চিন্তাপ্রবাহ দ্বারা) যে চিত্ত সমাহিত হইয়াছে যাহা অন্যগামী নয়, সেই চিত্ত-যোগে অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকালে সেই পরম

পুরুষকে চিন্তা করিলে তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সাধকের পরম পুরুষপ্রাপ্তির পর আর ফিরিয়া আসিতে হয় না (৮ অঃ, ১০, ১৬)।

যাহার যেরূপ চিন্তায় জীবন অতিবাহিত হয়, অন্তকালে তাহার মনে সেইরূপ চিন্তাই উদিত হয়, দেহত্যাগান্তে তাহার গতিও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

৮ম অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে। "যে যে ভাবে স্মরণ করিয়া কলেবর ত্যাগ করে তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া সে সেই ভাবই লাভ করিয়া থাকে", সুতরাং ভগবচ্চিন্তাকে যিনি জীবনের নিয়ামক করেন, তাঁহার পক্ষে অন্তকালে ঐ চিন্তাই মনে জাগ্রত থাকিবে এবং দেহান্তে তিনি পরম পুরুষকে লাভ করিবেন, কিন্তু চিন্তাপ্রবাহ অনন্যগামী হওয়া চাই। অনন্যচিত্ত হইয়া যে নিরন্তর আমায় স্মরণ করে, সেই নিত্যযুক্ত সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ, সেই মহাত্মন্ ব্যক্তি আমায় প্রাপ্ত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করে, সে আর দুঃখের আলয় অনিত্য সংসারে জন্মগ্রহণ করে না (৮ অঃ, ১৪, ১৫)।

ছান্দোগ্যশ্রুতির বাক্য 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্', গ্রন্থের আরম্ভেই যাহার উল্লেখ রহিয়াছে, এই শ্রুতিবাক্যের অনুসরণক্রমে গীতোক্ত ঐ সাধনার পন্থা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সম্পূর্ণ শ্রুতিবাক্যটি এই ঃ—

সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি। শান্তমুপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষো যথা ক্রতুরস্মিন্‌লোকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত।

যে হেতু এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ সুতরাং শান্ত হইয়া অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি দোষরহিত ও সংযত হইয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিবে কিরূপে উপাসনা করিবে? ক্রতু করিবে।

ক্রতু বলিতে নিশ্চয় অধ্যবসায় বুঝায়, এইরূপই বটে অন্যরূপ নহে এই দৃঢ় প্রত্যয় (ক্রতুঃ নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ঃ এবমেব নান্যথা, ইতি অবিচল প্রত্যয়ঃ)—শঙ্কর।

ক্রতুর অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা হইয়াছে জীব (মনুষ্যমাত্রই) সঙ্কল্পপ্রধান। ইহজীবন যাহার যেপ্রকার ক্রতু (অর্থাৎ যে যেরূপ অধ্যবসায় সম্পন্ন হয়) মৃত্যুর পরও তাহার তদনুরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। এই জন্য রাগ দ্বেষাদি সর্বপ্রকার চিত্তচাঞ্চল্য পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মোপাসনা করিবে।

এইরূপে ব্রহ্মোপাসনার কি ফল লাভ হয় গীতায় তাহা এরূপ বলা হইয়াছে ;—

আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!
মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

(৮অঃ, ১৬ শ্লোক)

ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া যত লোক আছে, সকল লোক হইতে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়। আমায় পাইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এইরূপে পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য মৃত্যুকালে অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগবলে ভ্রূ মধ্যে প্রাণকে সম্যক্‌রূপে স্থাপন করিতে হইবে (৮ অঃ, ১০)।

এই অবস্থা লাভের জন্য যে উপায় অবলম্বন প্রয়োজন তাহা এই ঃ—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে॥
সর্ব দ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥
৮ অঃ, ১২—১৩।

ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, যতিগণ বিষয়-বাসনা পরিত্যাগকরতঃ যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, (সাধকগণ) যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিয়া থাকেন, সেই প্রাপ্য কি তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি—

সমস্ত ইন্দ্রিয়কে বিষয় হইতে বিমুখ এবং মনকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করতঃ আপনার প্রাণকে ভ্রূদ্বয় মধ্যে স্থাপনপূর্বক যোগধারণা আশ্রয়ে ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ ও আমায় স্মরণপূর্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া যায় সে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন, —"দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তি লক্ষণো নিবৃত্তি লক্ষণশ্চ"। বেদোক্ত ধর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ। এই ধর্ম্ম জগতের স্থিতির কারণ ও জীবগণের মুক্তির হেতু। সেই মুক্তি সর্বকর্ম্ম ত্যাগ ও আত্মজ্ঞানরূপ ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হয়। ইহার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যে যে প্রণালী অবলম্বনক্রমে এই সাধনায় সিদ্ধি অর্থাৎ নির্বাণরূপ মুক্তি লাভ হয়, সে সকল প্রণালী এখানে প্রদর্শিত হইল।

প্রবৃত্তি লক্ষণধর্ম্ম জগতের স্থিতি এবং প্রাণীগণের সাক্ষাৎ অভ্যুদয়ের হেতু।

"তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয় হেতুঃ"।

গ্রন্থের উপসংহার শ্লোকে কিরূপে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা পরম কৌশলসহকারে সঞ্জয়ের মুখ দিয়া জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

"যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্ম্মম ॥"

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাঞ্চাল যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া এই উক্তি হইলেও ইহা অতি ব্যাপক অর্থ বহন করে, এরূপ মনে হয়। মানবজীবনমাত্রই এক একটি সংগ্রামক্ষেত্র। এই সংগ্রামে জয়লাভ না করিতে পারিলে জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। শ্লোকের শ্রী, ভূতি, নীতি, বিজয় এই সব কয়টি শব্দই অভ্যুদয় জ্ঞাপন করে। এই অভ্যুদয় লাভের পন্থা হইতেছে ধনুর্দ্ধর পার্থের পশ্চাতে যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণের স্থিতি। ধনুর্ধর পার্থ দ্বারা কর্ম্ম ও ভক্তিকে সূচনা করা হইয়াছে। যোগেশ্বর কৃষ্ণ জ্ঞানের প্রতীক্। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এক সঙ্গে এই তিন থাকাই প্রয়োজন। কর্ম্ম চাইই কিন্তু তাহা নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করা প্রয়োজন এবং ইহার পথ প্রদর্শক হইবে জ্ঞান। যেখানে এই তিনের যথোচিত সমাবেশ তথায় জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ ধ্রুব নিশ্চয়। সংসারে স্থিতি লাভের জন্য ইহা শ্রেষ্ঠ পন্থা। প্রবৃত্তিমার্গের যাত্রীদিগের জন্য গীতার এই উপদেশবাণী—ইহা যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণমুখে স্বয়ং ভগবানের উক্তি। এই উক্তি সকল দেশে সকল জাতির জন্য। ঠিকমত ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে হইলে জাতি-ধর্ম্মের গণ্ডির ঊর্দ্ধে আরোহণ প্রয়োজন।

আচারিয়ার ঠিকই বলিয়াছেন,—

"The Bhagabat Geeta is a work which inspite of its great antiquity and sanctity and apparent simplicity has baffled many commentators and critics. To some it appears full of contradictions, to others it is a patch work of three or four layers set one over another. To others again the central theme is clear, while the work is full of digressions and repetitions."

এই সকল উক্তি যে সর্বথা ভ্রমাত্মক, গীতার যত সব বর্ণনা সকলই যে দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্রের ন্যায় নিঃশ্রেয়স ও অ্যভুদয় লাভের উপায় নির্দ্দেশক, আশা করি সহৃদয় পাঠক এইক্ষণ তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

যে ব্রহ্মজ্ঞানকে বেদান্তে "পরম গুহ্য" রহস্যজ্ঞান বলা হয়, ছান্দোগ্য উপনিষদে যাহা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সাগরবেষ্টিত পৃথিবী দানও তাহা লাভের জন্য পর্য্যাপ্ত গুরু দক্ষিণা নহে, কিরূপ জীবনযাপন ও সাধন প্রণালী অবলম্বন করিলে সেই তত্ত্ব সম্যক্ প্রকারে উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে, গীতাশাস্ত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল সাধনায় সম্প্রদায়বিশেষের কিছুমাত্র প্রভাব দৃষ্ট হয় না। দেশ-কাল-পাত্রনির্বিশেষে মানবমাত্রই এই সকল সাধনার অধিকারী। ইহা সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন মানবধর্ম্ম; তথাপি দেখা যায় বৈদিক বিষ্ণু নারায়ণ উপাসনা গীতার কোন কোন উক্তিকে অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের এক প্রধান শাখা বৈষ্ণবধর্ম্মের রূপ ধারণ করিয়াছে। এ প্রসঙ্গে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন,—

"হে পরন্তপ অর্জ্জুন! আমার ও তোমার বহুজন্ম অতীত হইয়াছে, আমি সেই সকল অবগত আছি, তুমি তাহা জান না। যদি বল, আপনি পাপ-পুণ্যবিহীন ঈশ্বর, আপনার কিরূপে জীবের ন্যায় জন্ম সম্ভবে? তাহার উত্তর, আমি জন্মশূন্য, অবিনশ্বর

ভূতসকলের ঈশ্বর হইয়াও নিজ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া (অর্থাৎ ব্রহ্মরূপতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া) নিজ মায়া দ্বারা জন্মগ্রহণ করি।"

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া ॥"৬

এইরূপে অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বলা হইয়াছে ; যখনই ধর্ম্মের হানি ও অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখন আমি দেহ সৃষ্টি করি ("তদাত্মানং সৃজাম্যহম্")। পঞ্চম পরিচ্ছেদে "**নারায়ণ-বাসুদেব**" তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় আমরা দেখিয়াছি, প্রথম মনুর অধিকারকালে বিশ্বাত্মা সনাতন নারায়ণ "নর," "নারায়ণ," "হরি," "কৃষ্ণ" এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাদের উপদেশক্রমে যিনি সূক্ষ্ম অবিজ্ঞেয় অচল নিত্য ইন্দ্রিয় বিষয় ও সর্ব্বভূতের অতীত, পণ্ডিতরা যাঁহাকে সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা ও ত্রিগুণাতীত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, ব্যক্তভাবে যাহা হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয় সমুদ্ভূত হইয়াছে, শ্বেতদ্বীপে আদ্যামূর্ত্তিতে অবস্থিত সেই পরমাত্মাকে দর্শনাভিলাষে তথায় গমন করেন। নারদের ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া নারায়ণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া চতুর্ব্যূহাত্মক ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রচার করেন। ইহার মর্ম্ম—সর্ব্বভূতের আত্মভূত পরমাত্মা বাসুদেব নিত্য, সকল আত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার। জীবরূপী সঙ্কর্ষণ, মনোরূপী প্রদ্যুম্ন ও অহঙ্কাররূপী অনিরুদ্ধ ইহারা প্রত্যেকে তাঁহার এক একটি ব্যূহ বা প্রতিমূর্ত্তি।

নারদের প্রতি আরো উপদেশ এই যে, তাঁহার মূর্ত্তি ধর্ম্মের ঘরে নর, নারায়ণ, হরি, কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইয়াছে, নিরন্তর এই সকল মূর্ত্তির আরাধনা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আরো বলা হইয়াছে,

ভূভার হরণের জন্য তিনি যুগে যুগে নানা অবতারে অবতীর্ণ হইবেন এবং সপ্তম মনুর যুগে পরিশেষে মথুরাতে কংস ও অন্যান্য দানবদিগকে বিনাশ করিয়া দ্বারকাতে নিজের বসতি স্থাপন করিবেন এবং তথায় নিজের ভ্রাতা, পুত্র ও পৌত্র সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের মধ্য দিয়া নিজের চতুর্ব্যূহের কার্য্যসকল সমাপনান্তে সাত্বতগণ সহ দ্বারকাপুরী ধ্বংসকরতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন।

মহাভারতের শান্তিপর্বের ৩৪৯ অধ্যায়ে বর্ণনা আছে, বর্ত্তমান মন্বর অধিকারকালে ত্রেতাযুগের আরম্ভে মনু ইক্ষ্বাকুকে এই ধর্ম্ম প্রদান করেন। ইক্ষ্বাকু ত্রিলোক মধ্যে ইহা প্রচার করেন। পরিশেষে সাত্বতদিগের মধ্যে ইহা নিবদ্ধ থাকে। আরো বর্ণনা আছে, নারদ ব্যাসের নিকট এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। পূর্বে যতিধর্ম্ম কীর্ত্তন প্রসঙ্গে হরিগীতায় সংক্ষেপে এই ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। হরিগীতাই যে ভগবদ্গীতা পূর্বে তাহা বলা হইয়াছে।

গীতার অর্জ্জুন এবং কৃষ্ণই যে পূর্বজন্মে বদরিকাশ্রমে তপোমগ্ন নর নারায়ণ ঋষি ছিলেন, এ সম্বন্ধে পঞ্চম পরিচ্ছেদে আরো কয়েকটি প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এস্থলে লক্ষ্যের বিষয়, নারদ পঞ্চরাত্রসম্মত এই যে ঐকান্তিক ধর্ম্ম, যাহা হইতে বর্ত্তমান বৈষ্ণবধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে অর্জ্জুনের কোন স্থান নাই। অর্জ্জুন মাত্র বাসুদেবের একজন উপাসক ("বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুণ)। কৃষ্ণের ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহের মধ্য দিয়া সৃষ্টির যে প্রকাশ তাহার দার্শনিক তত্ত্ব এই—যিনি বাসুদেব তিনি স্বরূপে চতুর্বিংশ তত্ত্বাতীত সকলের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ অজ নিত্য নিরাকার পরমাত্মা। তাঁহার পরাপ্রকৃতি সঙ্কর্ষণাখ্য জীব। পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, সলিল, তেজ এই পঞ্চভূত হইতে শরীরের সৃষ্টি হইলে জীব কর্ত্তৃক এই শরীরস্থ বায়ু সঞ্চালিত হইতে থাকে। জীবাত্মা

শরীরে আবির্ভূত হইলেই লোকের শরীর চেষ্টাযুক্ত হয়। জীব হইতে মনঃস্বরূপ প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি হয়। প্রদ্যুম্নাখ্য মন হইতে সর্বভূতের অহঙ্কার স্বরূপ অনিরুদ্ধের উদ্ভব। এই অহঙ্কার বিষয়ী। তিনি বিষয়কে আকর্ষণ করতঃ এক একটি দেহের সৃষ্টি করেন এবং তাহা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়, কল্পান্তে জগৎসংহারপূর্বক স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় জীবকে শরীরস্থ করিয়া বাসুদেবাখ্য পরমাত্মা একাকী বিদ্যাশক্তির সহিত যোগ-নিদ্রায় অবস্থান করে। পুনর্বার তাঁহার প্রভাবে সেই বিদ্যাশক্তি হইতে বিশ্বের সৃষ্টি হয়।

এই গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে (১) আমরা দেখিয়াছি খৃষ্টের জন্মের অনুমান চারিশত বৎসর পূর্বে এদেশে যে সকল ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল বাসুদেব বলদেবের উপাসনা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহাই যতদূর জানা যায় এই ধর্ম্ম প্রচলনের প্রাচীনতম প্রমাণ। তাহার পর দেখা যায় মথুরা নগরীতে সৌরসেনিদিগের মধ্যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দির শেষভাগে হরিকৃষ্ণ আরাধ্য দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহার পর বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কাল। তথাপি বাসুদেব বলদেব ধর্ম্মও ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল কিন্তু বলদেব নাম স্থানে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণ নাম যুক্ত হইয়াছে। ২০০ খৃঃ পূঃ পশ্চিমদিকে তক্ষশীলার অধিবাসী

(১) ৮৪ পৃঃ। Epigraphica Indica Vol. X appendix এই শিলালিপি উদ্ধৃত হইয়াছে —

"Devadevasa Va (sude) vasa Garod-adhvage ayam karite (i a) Heleodorena Bhagavatena Diyasa putrena Takhkhasila-kena Yona-dutena āgatena Mohārājasa Amtaliketesa upā(m)tā Sākasam Rano.

Kāsiputesa Bhāgabhadrasa trātārasa Vasuna (chotu) dasimna rajena.

Vadhamānasa"

যবন (গ্রীক) দিগের মধ্যেও কেহ কেহ এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যবন রাজদূত হেলিওডরা কর্ত্তৃক মালব দেশে বাসুদেবসঙ্কর্ষণ উপাসনামূলক এক গড়ুরধ্বজ স্থাপনের উল্লেখ করিয়াছি। ইহাতে হেলিওডরা নিজকে "ভাগবত" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন ইহার পর খৃষ্টাব্দের একশত শতাব্দির পূর্ব্বে নানাঘাটে গিরি গহ্বরে খোদিত প্রস্তরলিপি উল্লেখ যোগ্য। ইহাতে, নানা হিন্দু-দেবতার স্তুতি প্রসঙ্গে নামোল্লেখ রহিয়াছে, তন্মধ্যে বাসুদেব সঙ্কর্ষণের নাম আছে। ইহার পর সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের কাল। এই সময় মধ্যে কোন হিন্দু-দেবতার বিশেষ কোন প্রতিপত্তির উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় না দাঁড়াইতে পারিলেও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যে বিশেষ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল তাহা মনে হয় না। চারিশত খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশের অভ্যুদয় হয়। ৪৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্ধগুপ্তের রাজত্ব কাল। ইহারা সকলেই পরম প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত। তাঁহারা সকলেই ভগবৎ বাসুদেবের উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের রাজত্ব কালে প্রচলিত মুদ্রাতে নিজেদের পরম ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

দিল্লী সহরে কুতুবমিনারের নিকট যে বিশাল ধাতু নির্ম্মিত স্তম্ভ রহিয়াছে, যাহাকে সাধারণ লোকে যুধিষ্ঠিরের জয় স্তম্ভ বলিয়া মনে করে, ইহার গাত্রে যে উৎকীর্ণ রহিয়াছে তাহা হইতে জানা যায়, বিষ্ণুর উপাসক অমিততেজা নরপতি চন্দ্র কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা স্থাপনের তারিখ নাই। কিন্তু পরম পরাক্রমশালী এই চন্দ্র নরপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য হওয়াই সম্ভব, তাহা হইলে চতুর্থ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইহা স্থাপিত হইয়াছে, কারণ ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের সময়।

ঐ সময়ে উদয়গিরিতে প্রস্তর গাত্রে এক চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল দেখা যায়।

গাজিপুর জিলায় ভিটরি নামক স্থানে এক স্তম্ভ আছে, তাহার গাত্রের উৎকীর্ণ হইতে জানা যায়, ইহা স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক সারঙ্গীন্ দেবতার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্থাপিত হইয়াছিল। ৪৫৪ হইতে ৪৬৪ খৃঃ স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব কাল। তিনি নিজকে ভাগবত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন সুতরাং সারঙ্গীন্ বাসুদেবকৃষ্ণেরই এক নাম বুঝা যায়।

৪৫৬ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের সৌরাষ্ট্র দেশের প্রতিনিধি' চক্রপালিত কর্ত্তৃক এক বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে রক্ষিত প্রস্তর-গাত্রে বামনরূপী বিষ্ণুর স্তুতি রহিয়াছে।

মধ্যপ্রদেশে সাগর জিলায় বুদ্ধগুপ্তের রাজত্বকালের ৪৮৩ খৃঃ উৎকীর্ণ এক ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধ্যানবিষ্ণু জনার্দ্দনের উদ্দেশ্যে এক ধ্বজা স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মাতৃবিষ্ণু নিজকে অত্যন্ত ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, যাহা হইতে বুঝা যায় বাসুদেব কৃষ্ণই এই জনার্দ্দন। (১)

অনুমান ৯ম খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত যোধপুর হইতে ৩১ মাইল উত্তরে অসিয়া নামক স্থানে এক মন্দির ও ইহার সভামণ্ডপের সংলগ্ন দুই প্রাচীর গাত্রে গড়ুর বাহন দুই দেবতার মূর্ত্তি রহিয়াছে। উভয়েই চতুর্ভুজধারী। এক মূর্ত্তির চারি হাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম রহিয়াছে। অপর মূর্ত্তির এক হাতে লাঙ্গল, এক হাতে গদা, অপর দুই হাত খালি, শেষোক্ত দেবতার মাথার উপর পঞ্চশীর্ষ সর্প রহিয়াছে। ইহারা বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি।

---

(১) Corpus Inscriptionum Indicarum Vol. IIIতে এই সকলের প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫৭৮ খৃঃ অব্দে দক্ষিণ প্রদেশে সালুক্য বংশের রাজপুত্র মঙ্গলিস পর্বত গহ্বরে বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বিষ্ণুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণু ও নারায়ণ সর্পের গাত্রের উপর হেলান অবস্থায় রহিয়াছেন, লক্ষ্মী বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছেন, নিকটে বরাহ ও নরসিংহ মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং হরিহর মূর্ত্তি, ইহাতে হরি অর্থাৎ বিষ্ণু এবং হর অর্থাৎ শিব উভয় দেবতার চিহ্ন সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। (২)

যোধপুরের অনতিদূরে মান্দর নামক স্থানে ভূগর্ভে নিহিত এক স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গাত্রে শিশুকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শকট উল্টাইয়া ফেলিবার এবং তাঁহার হস্তদ্বারা গোবর্দ্ধন পর্বত ধারণ করিবার চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ডাঃ ভাণ্ডারকার মনে করেন এই স্তম্ভ খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

কালিদাস মেঘদূতের পঞ্চম অঙ্কের ১৫ শ্লোকে রামধনু শোভিত মেঘখণ্ডকে যেন শিখিপুচ্ছ চূড়া শোভিত গোপালরূপী বিষ্ণু দেবতা এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের প্রধান রত্ন ছিলেন, সুতরাং তিনি খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দির প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায়। কালিদাস নিজে শিবোপাসক ছিলেন, রঘুবংশের প্রথম বন্দনা শ্লোক হইতে তাহা বুঝা যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অতুল প্রভাব সত্ত্বেও শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমশঃ শিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল।

কালিদাসের সমসাময়িক এবং বিক্রমাদিত্যের অপর সভাসদ্ অমরসিংহ তাঁহার সুবিখ্যাত অভিধানে তৎকালে প্রচলিত দেবতাদের নাম দিয়াছেন। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার কোষে প্রথম যে সকল বিভিন্ন নামে বুদ্ধকে বুঝায়,

---

(২) Fergusson and Burgess,—Cave Temples.

তাহার উল্লেখ করিয়া বিষ্ণুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং দেবতার ৩৯টি নামের উল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন তিনি বসুদেবের পুত্র। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় এই সমুদয় নামেই বিষ্ণুকে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি নাম কংসারতি। বাসুদেব-কৃষ্ণের পিতা বসুদেব নামোল্লেখের পর তিনি সঙ্কর্ষণ বা বলদেবের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তদনন্তর প্রত্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের নাম। ইহার পর বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী। তাহার পর বিষ্ণুর অস্ত্র শঙ্খ চক্র, গদা পদ্মের উল্লেখ। অবশেষে বিষ্ণুর বাহন গড়ুর। বিষ্ণু দেবতার পর শৈবদের উপাস্য দেবতা শিবশম্ভুর নাম রহিয়াছে। অমরসিংহ খৃষ্ট পঞ্চম শতাব্দির প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। দেবতাদের নামোল্লেখ হইতে বুঝা যায়. ভাগবত সম্প্রদায়ের চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অমরসিংহ এই তালিকা দিয়াছেন।

সে কালে প্রচলিত হিন্দু উপাসকদিগের বিভিন্ন দেববিগ্রহের মধ্যে কোন্ দেবতার বিগ্রহ কাঁহা কর্ত্তৃক স্থাপিত হওয়া প্রশস্ত, সে সম্বন্ধে বরাহমিহির বলেন ভাগবতদিগের দ্বারা বিষ্ণুর বিগ্রহ স্থাপন প্রশস্ত। ৫৮৭ খৃঃ (৫০৯ শকাব্দে) বরাহমিহিরের মৃত্যু হয়। সুতরাং দেখা যায় নারদ পঞ্চরাত্র-সম্মত চতুর্ব্যূহ তত্ত্বমূলক ঐকান্তিক ভাগবত ধর্ম্ম তখন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; কৃষ্ণ ও বলরাম ঐ চতুর্ব্যূহ তত্ত্বের বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণের স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নিজে বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার সভাসদ্দিগের মধ্যে একজন (কালিদাস) শৈব ছিলেন, একজন (অমরসিংহ) বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা হইতে বুঝা যায় বৌদ্ধ শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে মতগত পার্থক্য ভিন্ন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ছিল না। বৈষ্ণবগণ বুদ্ধকে তাঁহাদের প্রধান দশ অবতারের মধ্যে আসন প্রদান করিয়াছেন। জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক

প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভও তাঁহাদের নিকট তদ্রূপ সম্মান লাভ করিয়াছেন। ইহার কারণ নির্ণয় করা খুব শক্ত নহে। আমরা দেখিয়াছি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব। বৈদিক ধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ভিন্ন অপর কাহারো বেদমন্ত্র উচ্চারণ অথবা উপনিষদ পাঠের অধিকার ছিল না। কোনরূপে ইহার ব্যত্যয় হইলে কঠোর সাজা হইত। মীমাংসা শাস্ত্রগুলিতে সেজন্য "অপশূদ্র অধিকরণ" বিধিগুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (১)

বৌদ্ধধর্ম্মের অনুষ্ঠানগুলিতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার রহিয়াছে। শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের দ্বার অন্ততঃ কতক পরিমাণে সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। গীতা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের জন্য আশার বাণী ঘোষণা করিলেন ঃ—

(১) ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩৪-৩৮ সূত্র অপশূদ্র অধিকরণ। শূদ্রের বেদাধ্যয়নে অধিকার নাই, যেহেতু উপনয়নপূর্বক বেদাধ্যয়ন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রের নিয়ম। উপনয়ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের জন্যই বিহিত। "ন চ শূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি, উপনয়নপূর্বকত্বা-দ্বেদাধ্যয়নস্য, উপনয়নস্য চ বর্ণত্রয় বিষয়ত্বাৎ—ইতি শঙ্করঃ।

৩৮ সূত্র—"শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ।"

যেহেতু শূদ্রের বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন বেদার্থ পরিগ্রহে নিষেধ আছে, অতএব শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার নাই। "স্মৃতেশ্চ" শঙ্করাচার্য্য ইহার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "স্মৃতিতে লিখিত আছে শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে, তাহা হইলে তাহার কর্ণ সীস্ ও লাক্ষা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিবে। শূদ্র বেদ উচ্চারণ করিলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদ করিবে, বেদাধ্যয়ন করিলে তাহার শরীর ছেদন করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবত ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—

"স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ বন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

"মাং হি পার্থ ! ব্যপাশ্রিত্য
যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-
স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥" ৯ অঃ, ৩২।

হে পার্থ ! যে কোন ব্যক্তি সে পাপজন্মাই হউক অথবা বৈশ্য বা শূদ্র হউক, বা স্ত্রী হউক, আমাকে আশ্রয় করিলে সকলেই পরাগতি প্রাপ্ত হয়। (১)

---

(১) এখানে বৈশ্য ও স্ত্রী, শূদ্রের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত, বেদ শ্রবণ ও বেদাধ্যয়নে ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভে অনধিকারী এরূপ বুঝা যাইতেছে। কিন্তু গীতাশাস্ত্রমতে তাঁহারাও ভগবানের আশ্রয় লাভ করিতে পারে। তাঁহার শরণাপন্ন হইবার জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই সমান অধিকার রহিয়াছে।

বৈদিকধর্ম্মে এই যে বৈষম্যের সৃষ্টি, আদিতে তাহা গুণগত ছিল, জাতির সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। ঋগ্বেদে অনেক নারী-ঋষির সন্ধান পাওয়া যায়। নারী-ঋষি বিশ্ববারার বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে প্রভাতে যজ্ঞশালায় গমনের স্তুতিগুলি বড়ই পবিত্রভাবব্যঞ্জক (৫ম—২৮সূ)। মন্ত্রগুলির ভাষা জনসাধারণের ভাষা হইতে ভিন্ন ছিল, ইহা বিশেষ শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের ভাষা ছিল। বেদাধ্যয়ন ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোক অন্য ভাষা ব্যবহার করিত। কৃষিকার্য্য ও বস্ত্রবয়ন তাহাদের ব্যবসায় ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭১ সূক্তের ৯ম মন্ত্রের ঋষি বলিতেছেন :—

"এই সকল সাধারণ লোক যাহারা ইহকাল পরকাল কিছুই পর্য্যালোচনা করে না, যাহারা স্তুতি (মন্ত্র) প্রয়োগ বা সোম-যাগ করে না, তাহারা দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয় অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।"

এই যে শ্রেণী বিভাগ ইহা যে জন্মগত নহে অপর এক ঋষির উক্তি হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি বলিতেছেন :—

"আমার পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে। যেমন, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসা-

বৌদ্ধধর্ম্ম সহস্র বৎসরেরও অধিককাল এদেশে ব্যাপকভাবে প্রধান ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহার মূলে ছিল ভগবান্ শাক্যসিংহের লোকোত্তর জীবন, ধর্ম্মসঙ্ঘকে সম্রাট অশোকের সর্বস্ব দান, শ্রমণদিগের অনাড়ম্বর নির্ম্মল জীবন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বাণী প্রচার ও সাধারণ জ্ঞানবিস্তারের কেন্দ্রস্থলরূপে সর্বত্র বিহার নির্ম্মাণ। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে নালান্দার বিহার নির্ম্মিত হয়। ঐ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন তথায় ব্রহ্মজাল সূক্ত ও অপরাপর অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তদবধি নানা দূরদেশে শিক্ষাকেন্দ্ররূপে নালান্দার খ্যাতি প্রচারিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিয়ান্-সিয়াং (Heuen-Isiang) বৌদ্ধদর্শন শিক্ষার জন্য এখানে আগমন করেন এবং একাদিক্রমে ১৬ বৎসর এদেশে অবস্থান করিয়া নিজের জ্ঞানপিপাসার তৃপ্তিসাধন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, ইহার পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল।

ব্যবসায়ী, কন্যা যব ঘর্ষণকারিণী। আদিতে গুণগত যাহার যাহার সামর্থ্য অনুসারে জীবিকানির্বাহের এরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও দেখা যায় বৈশ্যগণ জমি-কর্ষণ ও বস্ত্র-বয়ন তাহাদের জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুশীলন ও স্তোত্রের ভাষা তাহারা বিস্মৃত হইয়া দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাকৃতজনের ন্যায় জীবনধারণ করিতেছিল, এইভাবে ক্রমে তাহারা শূদ্রদের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রীজাতিকেও একই পর্য্যায়ের সামিল করা হইয়াছে। ইহা এক অদৃষ্টের পরিহাস। প্রাচীন বৈদিকযুগে সমাজে ও পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির যে গৌরবময় উচ্চ আসন ছিল, ঋগ্বেদ ও অথর্ব বেদের প্রাচীন মন্ত্রগুলি হইতে তাহা অবগত হইতে পারা যায়। কালে যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির লক্ষ্য ও আদর্শ হইতে অনেক বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল। স্বার্থান্বেষী পুরোহিতগণ সমাজের উপর নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখিবার জন্য যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপকে এরূপ জটিল করিয়া তুলিয়াছিল যে, যজমানকে ইষ্টানিষ্ট ফলের জন্য সম্পূর্ণরূপে ঋত্বিকের মুখাপেক্ষী হইয়া

বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের পর রাজা শক্রাদিত্য নালান্দায় এক বিহার নির্ম্মাণ করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র রাজা বুদ্ধগুপ্ত ইহার দক্ষিণ পার্শে আর একটি সংঘারাম (বিহার) নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার কিছুকাল পরে পূর্বদিকে আর একটি বিহার নির্ম্মিত হয়। তদনন্তর রাজা বালাদিত্ব উত্তর পূর্ব কোণে আর একটি সংঘারাম নির্ম্মান করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কয়েকজন চীনদেশীয় পরিব্রাজক ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন জন্য এখানে আসেন। তাঁহাদের জীবনে মুগ্ধ হইয়া রাজা সিংহাসন পরিত্যাগকরতঃ পরিব্রাজক-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইহার পর মধ্যভারতের এক নরপতি কর্ত্তৃক আর একটি সংঘারাম নির্ম্মিত হয়। এইরূপে পর পর ছয়জন নরপতি কর্ত্তৃক নালান্দা বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার প্রথম স্থাপনের ৭০০ বৎসর পর

থাকিতে হইত। পুরোহিতরা এই পরিস্থিতির সুবিধা গ্রহণ করিয়া নৈতিক-জীবনের উপর আঘাত করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। ইহার ফলে ঋত্বিকের ঔরসে যজমান-পত্নীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন একপ্রকার সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়। এইরূপ উৎপন্ন পুত্র ক্ষেত্রজ পুত্র নামে অভিহিত হইতে থাকে। সমাজে নারীজাতির এই যে গ্লানিকর অবস্থা এবং তাহার পূর্ববর্ত্তী প্রাচীন বৈদিকযুগের গৌরবময় অবস্থা—মহাভারতের অনুশাসনপর্বে এই উভয় অবস্থার দুইটি সুন্দর চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। একটি ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে। ইহাতে স্ত্রীজাতি কিরূপ গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের আস্পদ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায়। ইহার অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ে নারদ-পঞ্চচূড়া সংবাদ নামক এক আখ্যানে নারীজাতির স্বভাব সম্বন্ধে যে বর্ণনা আছে, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া আসে। দুই একটি এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে, বৈদিক নারী-ঋষি বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা প্রভৃতির ভগিনিগণ কিরূপ অধোগতির চরম সীমানায় উপনীতা হইয়াছিল।

"কামিনীগণ সৎকুলসম্ভূতা, সুরূপা ও সধবা হইলেও স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। উহারা সকল দোষের আকর, উহাদের অপেক্ষা পাপপরায়ণা আর কেহ নাই, উহাদের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র ধর্ম্মভয় নাই। উহারা অনায়াসে লজ্জা

হিয়ান্-সিয়াং (উয়ান-চাঙ্গ) এদেশে আগমন করেন। তিনি মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র হইয়া নালান্দায় আসেন। পাটলিপুত্র সহরেই ৫০টি বিহার ও ১০,০০০ বৌদ্ধভিক্ষু দেখিতে পান। নালান্দা মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের বিহার। অধ্যাপক ও ছাত্র মিলিয়া দশ সহস্র লোকের প্রতিদিন তথায় বাস করিয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইহা এক Residential University বিশেষ ছিল। জগতের ইতিহাসে এত বড় আর একটি দ্বিতীয় শিক্ষায়তনের দৃষ্টান্ত মিলে না। প্রতিদিন একশত অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন, ছাত্রগণ অবহিতচিত্তে তাহা গ্রহণ করিত। তাহাদের এমনই সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ছিল যে, ঘড়ির কাটার সঙ্গে মিলাইয়া তাহারা যথাসময়ে অধ্যাপকদিগের নিকট উপস্থিত হইত।

"The students attend these discourses without any fail even for a minute (an inch shadow in the dial), The priests dwelling here, are, as a body,

পরিত্যাগপূর্বক পরপুরুষের সহিত সংসর্গ করে। পুরুষ পরস্ত্রী-সম্ভোগে অভিলাষী হইয়া তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক দুই একটি চাটুবাক্য প্রয়োগ করিলেই সে তাহার প্রতি অনুরক্তা হয়," ইত্যাদি ইত্যাদি। যে সমাজে মাতৃজাতির এরূপ লজ্জাস্কর অবস্থা, সে সমাজ যে কতদূর অধঃপাতিত হইয়াছিল, তাহা কল্পনা করাও সহজ নহে। নীতিপ্রধান বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতসকল ইহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল, এই সংগ্রামে বৈষ্ণবধর্ম্মও এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের শেষ কয় শ্লোকে বর্ণসঙ্করদের হইতে বংশ ও সমাজের যে অশেষ অমঙ্গল ঘটে তাহার বর্ণনা যথা,—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্ত পিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ ॥"

ইত্যাদি ইহাদিগের মধ্যে নারীজাতির এই অপমানজনক অধঃপাতিত অবস্থার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

naturally dignified and grave, so that during the 700 years since the foundation of the establishment, there has been no single case of guilty rebellion."

Beal's Translation.

এই শিক্ষায়তনে মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধশাস্ত্রাদি ভিন্ন অন্যান্য শাস্ত্র, যথা—বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাংখ্য, অথর্ববেদ বা যাদুবিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা ছিল। গ্রন্থাগারে সকল শাস্ত্রেরই অসংখ্য গ্রন্থ ছিল। বিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র মহাস্থবির সর্ববিষয়েই সুপণ্ডিত ছিলেন। হিয়ান্-সিয়াং সুদীর্ঘ ষোল বৎসর এদেশে অবস্থান করিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেবের জীবন-স্মৃতির সঙ্গে জড়িত সমুদয় স্থান ও বিহার দর্শন করেন। ইহার মধ্যে দশ বৎসর একাদিক্রমে নালান্দা বিহারে অতিবাহিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শনশাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করেন। দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই সকল বিষয়ের ৬৭৫ খণ্ড গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া যান। কালে বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির মধ্যে তান্ত্রিক প্রভাব প্রবেশ লাভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ কুসংস্কার ইহার আদর্শকে অবনমিত করিতে থাকে। এই যখন সমাজের অবস্থা, তখন যে বৈদিকধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব, সেই কর্ম্মকাণ্ডের পুনরাবির্ভাব হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও পরিশেষে জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে ইহা নির্বাসিত হয়। সবরস্বামী এই প্রতিক্রিয়ার অগ্রদূত, কিন্তু বিশেষভাবে কুমারিল ভট্ট এই সংগ্রামে প্রধান নায়ক ছিলেন। তিনি কোন্ দেশে কখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি আর্য্যাবর্ত্তবাসী ছিলেন, কিন্তু তাহার বিশেষ প্রমাণ নাই, তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি গৌড়পাদেরও পূর্ববর্ত্তী

ছিলেন। পূর্বমীমাংসা দর্শনে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বৌদ্ধাচার্য্যগণ তাঁহার নিকট বিচারে পরাভূত হইয়া দলে দলে বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। হিন্দুরাজা সুধন্ব তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ তাঁহাদিগ কর্ত্তৃক নানাভাবে নির্য্যাতিত হইয়া অবশেষে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

Eliot—"Hinduism and Buddhism" Vol II, গ্রন্থে লিখেছেন, কুমারিল প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করেন। সাধারণতঃ এই মতই প্রচলিত, কিন্তু এ সম্বন্ধেও বিশেষ প্রমাণাভাব রহিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, কুমারিল হিন্দুই ছিলেন, বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া পূর্ব অঙ্গীকার মতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে চিতানলে দেহপাত করেন। এই মতের অনুকূলেও বিশেষ প্রমাণ নাই। সে যাহাই হউক, তিনি তাঁহার রচিত গ্রন্থাদিতে এবং বিচারে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের সমর্থনে যে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহা হইতে লুপ্তপ্রায় বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের যে পুনরভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা ঠিক। শিক্ষিত আর্য্য-সমাজের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল বৈষ্ণবধর্ম্ম জৈনধর্ম্ম তাহার নিকট আর স্থান পাইল না। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে বৈষ্ণব ও শৈব আচার্য্যগণ তামিল ভাষায় দ্রবিড় প্রভৃতি অনার্য্যজাতি ও অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

কুমারিল ভট্টের অসাধারণ প্রতিভার নিকট অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ-শিক্ষিত বৌদ্ধগণ পরাজিত হইয়া বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডানুযায়ী ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও বৌদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতগণ ইহাতে আস্থাবান হইতে পারেন নাই। বৌদ্ধদর্শনে যুক্তির প্রাধান্য। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের দর্শন পূর্বমীমাংসায় যুক্তির বিশেষ অভাব। এই দর্শন মতে বেদ

অপৌরুষেয়, স্বয়ম্ভূ, আপনা হইতে নিঃশ্বসিত, সুতরাং বেদবাক্য কোনরূপ যুক্তি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বৈদিক শব্দসকল নিত্য, ইহারা শব্দব্রহ্ম; শব্দের অর্থ এবং অর্থের সঙ্গে শব্দের সম্বন্ধও নিত্য, সুতরাং শব্দযোগে প্রকাশিত মন্ত্রসকলও নিত্য এবং মন্ত্রের সঙ্গে মন্ত্রের অর্থ বা দেবতার সম্বন্ধও নিত্য। শব্দ ও শব্দের অর্থের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ন্যায় মন্ত্র ও মন্ত্রের বাচ্য দেবতার মধ্যে সম্বন্ধ, সুতরাং মন্ত্রসকলই দেবতা। যথাযথরূপে মন্ত্রসকল উচ্চারিত হইলে মন্ত্রের দেবতা আকৃষ্ট হইবে এবং উপাসকের অভিষ্ট সাধন করিবে।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপাসনা, সকাম উপাসনা। অভ্যুদয় লাভ বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদির লক্ষ্য, ইহাই পুরুষার্থ। যথানিয়মে ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হইলে এই দর্শন মতে এই অভ্যুদয় লাভ সুনিশ্চিত, তাহা ইহজীবনেই হউক বা পরজীবনেই হউক। বেদ যখন অপৌরুষেয়, ভ্রমপ্রমাদশূন্য তখন বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞাদি যে তাহাদের ফল উৎপাদন করিবে তাহা স্থিরনিশ্চয়। এই ফল দৃষ্টানুশ্রাবিক। কতগুলি ফল প্রত্যক্ষ, যেমন,—পুত্রেষ্টিযজ্ঞের ফল, ইহকালেই ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। অনুশ্রাবিক ফল পরকালে লাভ হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞ কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্যভাবে করিতে পারিলে পরলোকে অভ্যুদয় লাভ হইবেই, এমন কি ইন্দ্রত্ব পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে। বেদ স্বয়ং এই ফললাভের কথা বলিয়াছেন।

এই দর্শন মতে আমাদের আত্মার অতিরিক্ত মন্ত্র ভিন্ন অপর কোন ঈশ্বর নাই, মাঝে মাঝে যে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখা যায় ইহা উপাসকের উপাস্য প্রকাশক অর্থবাদ মাত্র। অভীষ্ট লাভের জন্য মন্ত্রের বিহিত প্রয়োগ ভিন্ন আর কোন স্বতন্ত্র ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। সংক্ষেপে বলিতে গেলে এই মতে কর্ম্ম ও ঈশ্বর মধ্যে কোনরূপ প্রভেদের অবসর নাই।

আদিতে বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিবাদকল্পে যে সকল মতের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহারা সকলই স্বাধীনচিন্তা-প্রসূত। অনেক চিন্তাশীল লোক বিশেষতঃ যাঁহারা বৌদ্ধ ও জৈনদর্শনে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের চিন্তাধারার সঙ্গে এই দর্শন অনুযায়ী মতের সামঞ্জস্য রক্ষা পাইল না। যজ্ঞে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সহিত পশু-হত্যার বিধান, তাহা হইতে দীর্ঘকাল অহিংসবাদ প্রচলনের পর শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে যুগপৎ সন্দেহ ও বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন তাহা নীতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতাবলম্বীরা উত্তরকালে মহাযান ও হীনযান এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। উভয় মতই, বিশেষভাবে মহাযান সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক নাগার্জ্জুন রচিত দর্শনশাস্ত্রসকল সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। বৈদিকধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রয়াসকে জয়যুক্ত করিতে হইলে বৌদ্ধধর্ম্মের পারমার্থিক তত্ত্বমূলক দর্শন ও নীতিবাদের প্রতিকূলে বেদের জ্ঞানকাণ্ডের দার্শনিকতত্ত্ব ও নীতিকে প্রয়োগ প্রয়োজন। প্রকৃত তত্ত্ব কি তাহা নির্ণয়ের জন্য সেকালে বৌদ্ধ ও হিন্দু আচার্য্যদিগের মধ্যে বিচারের অনেক বিবরণ আছে। হিয়ান্ সিয়াংএর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়, কান্যকুব্জাধিপতি বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী মহারাজা শীলাদিত্য সে সময় উত্তর-ভারতের সম্রাট ছিলেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপ) কুমার রাজাও ঐ মতাবলম্বী ছিলেন। তিনিও প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি এবং শীলাদিত্যের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। গঞ্জাম অঞ্চল জয়ের পর শীলাদিত্য দেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে যখন উড়িষ্যায় উপনীত হন, তথাকার হীনযান মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ মহাযান মতকে আকাশ-কুসুম বলিয়া উপহাস করেন। শীলাদিত্য দেশে প্রত্যাগমনের পর প্রকৃত তত্ত্ব কি, তাহা নির্ণয়ের জন্য ভারতের সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যদিগের এক বিচার-সভা আহ্বান করেন। হীনযান ও

মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্য্যগণ ব্যতীত তিন সহস্র ব্রাহ্মণ ও নিগ্রর্ন্থ (জৈন সন্ন্যাসী) সম্প্রদায়ের লোক এই বিচারে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। (১) ১৯ দিনব্যাপী বিচারের পর অবশেষে মহাযান সম্প্রদায়েরই জয় ঘোষিত হয়।

সহস্র বৎসরেরও অধিককাল যে ধর্ম্মমত ভারতের আকাশে এইভাবে তাহার বিজয়-পতাকা উত্তোলন করিয়া আসিয়াছে, কুমারিল ভট্টের প্রতিভার নিকট তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইলেও তাহা সাময়িক পরাভব মাত্র ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব পুনর্বার আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে, এমন সময় আচার্য্য গৌড়পাদ দেখা দিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল ৫০০ শক (৫৭৮ খৃঃ অঃ), তিনি মাণ্ডুক্য উপনিষদের এক কারিকা রচনা করেন, তাহাতে এক নূতন মতের আভাস দেন। তাঁহার শিষ্য গোবিন্দপাদ: গুরুপরম্পরাক্রমে গোবিন্দপাদের পরবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য। তাঁহার আবির্ভাবকাল অনুমান ৬০৮ শক (৬৮৬ খৃঃ অঃ)। তিনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের অধিকৃত ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত-দর্শনের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া অবৈদিক মতসকলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তিনি বেদান্ত-দর্শনের এক ভাষ্য রচনা করেন। ইহা শারীরক ভাষ্য নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্য্যের দর্শন এখানে আলোচনার বিষয় নহে।

---

(১) হিয়াং সিয়াং ইহার এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন :—

"There were present kings of 18 countries of the five Indus, three thousand priests thoroughly acquainted with the Great and the Little Vehicle, besides about three thousand Brahmans and Nirgranths and about a thousand priests of the Nalanda University. All these noted persons also celebrated for their literary skill as for their dialectic attended the assembly with a view to consider and listen to the sounds of the Law."

তিনি বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে মীমাংসকদিগের সঙ্গে একমত হইয়া ইহার জ্ঞানকাণ্ডের অন্তর্গত শ্রুতিবাক্য হইতে প্রতিপন্ন করেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক তত্ত্ব এবং তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত। এতদ্‌ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলই মিথ্যা, বিভ্রমদৃষ্টির ফল মাত্র,—রজ্জুতে সর্পভ্রম সদৃশ। রজ্জু যেমন অবিকৃত থাকিয়াই সর্পভ্রম জন্মায়, তেমনি ব্রহ্ম কোনরূপ বিকৃত না হইয়া জগদ্‌ভ্রম জন্মায়। সে সময় মণ্ডন মিশ্র নামক একজন বৌদ্ধাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল, তাঁহার পত্নী উভয়ভারতীও তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয়া বিদূষী রমণী ছিলেন। মণ্ডন মিশ্র বিচারে শঙ্করের নিকট পরাভূত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তদবধি সুরেশ্বর নামে পরিচিত হন। শঙ্করাচার্য্যের নিকট মণ্ডন মিশ্রের পরাজয় হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাসে এক বিশেষ ঘটনা। ইহার পর বৌদ্ধরা ক্রমশঃই হীনপ্রভ হইতে থাকে। শঙ্করাচার্য্য মাত্র ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেন, বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মানবলীলা সম্বরণ হয়। এই ষোল বৎসরকাল মধ্যে তিনি যাহা করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। শারীরক ভাষ্য ভিন্ন প্রধান দশখানা উপনিষদ ও গীতার তিনি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্বত্র ভ্রমণ ও প্রতিপক্ষকে বিচারে পরাজয়করতঃ নিজের মত স্থাপন করিয়াছেন।

দিগ্বিজয়কালে অনেক স্থানে তিনি অনেক মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দ্বারকায় সারদা মঠ, শ্রীক্ষেত্রধামে সমুদ্রতটে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গগিরিতে শৃঙ্গগিরি মঠ এবং বদরিকাশ্রমে যোষী মঠ সমধিক বিখ্যাত। বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের নির্বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রচলন এই সকল মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্য। ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ ও প্রতিপক্ষকে বিচারে পরাজয়পূর্বক নিজের মত স্থাপনান্তর অবশেষে তিনি কাশ্মীরে আগমন করেন, তথায় কিছুকাল অবস্থিতির পর বদরিকা-

শ্রমে গমন করেন। গোকর্ণদেশে নীলকণ্ঠ নামক জনৈক দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজয় করিয়া তিনি গোকর্ণে উপস্থিত হন। এই স্থানে বেদান্ত-দর্শনের টীকা শারীরক ভাষ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। বদরিকাশ্রমে মহর্ষি পতঞ্জলি সম্প্রদায়ের কতিপয় পণ্ডিতের নিকট তিনি নিজ ভাষ্য ব্যাখ্যা করেন। কথিত আছে, এই সময় গৌড়পাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার রচিত ভাষ্য বেদান্ত-দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হইয়াছে, এই বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। বদরিকাশ্রম হইতে তিনি কেদারতীর্থে গমন করেন। তথায় মাত্র দ্বাত্রিংশত বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার বিজয় বৃত্তান্ত প্রণেতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

> "এবম্প্রকারৈঃ কিল কল্মষঘ্নৈঃ
> শিবারতারস্থ শুভৈশ্চরিত্রৈঃ।
> দ্বাত্রিংশদস্যোজ্জ্বল কীর্ত্তিরাশেঃ-
> সমাব্যতীয়ুঃ কিল শঙ্করস্থ ॥

"উজ্জ্বল কীর্ত্তিরাশি সমন্বিত শিবারতার শঙ্করের এইপ্রকার পাপনাশক শুভ চরিত্রদ্বারা ৩২ বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছিল।"

এই কয়বৎসরের মধ্যেই অসংখ্য লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে পদ্মপাদ, আনন্দগিরি, লক্ষ্মণাচার্য্য, দিবাকরাচার্য্য, হস্তামলক, উতঙ্ক, পরমতকালানল ও সুরেশ্বর বিশেষ প্রসিদ্ধ। শঙ্করাচার্য্যের জীবিতকাল মধ্যেই তাঁহার শিষ্যগণদ্বারা ভারতের সর্বত্র তাঁহার মত প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার লোকান্তর গমনের পর এইসকল শিষ্যমণ্ডলীদ্বারা অদ্বৈত মতের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি প্রতিভার পূর্ণ ভাস্কর সদৃশ ছিলেন। তাঁহার স্থাপিত অদ্বৈতবাদ তাঁহার মৃত্যুর পরও

প্রায় তিন শত বৎসরকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা, ব্রহ্ম ব্যতীত আর দ্বিতীয় কোন সত্তা নাই। ইহা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং"। এইসকল শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মই যখন একমাত্র অনন্ত জ্ঞানময় সত্তা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল, তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কোন সত্তার অস্তিত্বের অবকাশ নাই। এই দৃশ্যমান জগৎ হয় ব্রহ্মেরই বিকার, না হয় মিথ্যা। শঙ্কর নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে জ্ঞাতাব্রহ্ম কখনও জ্ঞেয় জড়ত্বে বিকৃত হইতে পারে না। বিষয়ী কখনও বিষয় হইতে পারে না। ব্রহ্মব্যতীত যখন অন্য কোন সত্তাই নাই তখন ব্রহ্ম বিকৃতই বা হইবে কিসের দ্বারা? সুতরাং যদি ব্রহ্মের পক্ষে জগতাকারে বিকৃত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগৎ মিথ্যা, জগৎজ্ঞান মিথ্যা ভ্রমাত্মক জ্ঞান। এইরূপ ভ্রমাত্মক মিথ্যাজ্ঞান যে আমাদের হয়, তাহার দৃষ্টান্ত, শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান। শুক্তি ও রজ্জু যেমন অন্য বস্তুতে বিকৃত না হইয়াও রজত ও সর্পজ্ঞান জন্মায়, তদ্রূপ ব্রহ্মও অন্য কোন অবস্থায় বিকৃত না হইয়া মিথ্যা জগৎজ্ঞান জন্মাইতে পারে। জগতের অস্তিত্ব আমাদের মনের ভিতরে, বাহিরে নহে। তবে যে আমরা বহির্জগতের প্রকাশ দেখি ইহা অবিদ্যার ফল।

জগৎ মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলেও যে জীবাত্মাকে "আমি" বলিয়া জানি ইহাতো মিথ্যা হইতে পারে না। "আমি" না থাকিলে মিথ্যা জ্ঞান হইবে কাহার? আমি কে? শঙ্কর বলেন—আমি বা জীবাত্মা হয় ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন চিন্ময় সত্তা, না হয় ব্রহ্মেরই অংশ, না হয় ব্রহ্ম। এই তিনের একটি হইতেই হইবে। কিন্তু যখন শ্রুতি বলে ব্রহ্ম "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম

হইতে অতিরিক্ত কিছু হইতে পারে না। ব্রহ্ম যখন দেশ কালের অতীত বস্তু, তখন তাঁহার অংশ কল্পনা করা যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ব্রহ্মের এইরূপ অংশের কল্পনা করিলে ঐ অংশের দিকে ব্রহ্মের অসীমত্বের ব্যাঘাত ঘটে। সুতরাং জীবাত্মা যখন ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তা নহে, ব্রহ্মের অংশও নহে তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে ইহা ব্রহ্মই। এই যুক্তির সমর্থনে শ্রুতিবাক্য যথা, "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

যুক্তি ও বিচারের দিক হইতে শঙ্করের এই মত অকাট্য, কিন্তু ধর্ম্মের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহা আত্মার পিপাসা নিবৃত্তির জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। এই মতে ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ নাই, ভক্তিরও স্থান নাই। ইহা জনসাধারণের মধ্যে তৃপ্তি আনয়ন করিতে পারে নাই।

বেদান্ত দর্শন তর্ক ও বিচারপ্রধান ব্রহ্মবিদ্যামূলক শাস্ত্র। প্রো: মোক্ষমূলার উচ্ছ্বসিত ভাষায় ইহার বিচার প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন।(১) শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে এই দর্শন যে অদ্বৈত তত্ত্বমূলক, শারীরক ভাষ্যে তাহা স্থাপন করিয়াছেন।

(১) It is surely astounding that such a system as the Vedanta should have been slowly elaborated by the indefatigable and intrepid thinkers of India, thousands of years ago, a system that even now, makes one feel giddy as in mounting the last step of the swaying spire of an ancient Gothic cathedral. None of our philosophers, not excepting Heracletus, Plato, Kant or Hegel, has ventured to erect such a spire, never freightened by storms or lightning, stone follows on stone, in regular succession, after once the first step has been made, after once it has been clearly seen that in the beginning there can have been but **One** as there will be but **One** in the end whether we call it Atman or Brahman.